# বাজীকরের পুতুল

অজিত পূততুণ্ড

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ২৫ টাকা

উৎসর্গ

আমার সমস্ত কাজের প্রেরণা,

সাথী

আরতির

হাতে তুলে দিলাম

—অ পূ.

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

টেমস থেকে তিস্তা

গাজীবাবাজীর দেশ

Music is in the sea and air
Winged clouds soar here and there,
Dark with the rain new buds are dreaming of;
'T is love, all love.

—Shelley.

কাহিনীর আগেও একটা কাহিনী থাকে যেমন সব শুরুর আগে থাকে আরো একটা শুরু। সেই হিসেবে এই কাহিনীরও শুরুর আগে একটা শুরু আছে। বর্তমান পরিচ্ছেদটা সেই শুরুর আগে শুরু। আরম্ভর আগে আরম্ভ।

এই শুরুর কাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগ। স্থান মধ্য কলকাতার মিত্র-বাড়ি। লোকে যাকে মিত্তির-বাড়ি বলে জানে।

বাড়িটার ঠাট-ঠমক, জাঁক-জমক, জৌলুস-রোশনাই সবই একদিন ছিল। কিন্তু এখন তার আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। বলতে গেলে এখন তার অন্তিম কাল। তবে বাইরে থেকে এখনো তা বোঝা যায় না। মিত্রদের ক্ষয়ে যাওয়া অবস্থাটা ধরা পড়ে না চট করে। কারণ এখনো লোহার গেটের সামনে বন্দুক হাতে দারোয়ান থাকে। বড় বড় থামগুলোতে রঙ হয় প্রত্যেক বছর।

মিত্র-বাড়ির বর্তমান মালিক অমিতাভ মিত্রের একমাত্র সন্তান অরুণাভ মিত্র। সে নিজে মিত্র-বাড়ির জৌলুস-রোশনাই কখনো দেখেনি। বাড়ির গৌরব-ঐতিহ্যের কথা সে শুনেছে তার বাবা-মার কাছে। তারো আগে, যখন খুব ছোট ছিল তখন, শুনেছে ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার কাছে।

আসলে মিত্তির-বাড়ির রোশনাই হত গ্রামের জমিদারির তেলে। কিন্তু সেই তেল ফুরোতে শুরু করেছিল অমিতাভর পিতার জীবদ্দশাতেই। পিতা মাথার ওপর থাকায় তখন অমিতাভ তা উপলব্ধি করতে পারেননি। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অনুভব করলেন, জমিদারির ওপর নির্ভর করে থাকলে মিত্তির-বাড়ির আলো একদিন চিরকালের জন্য নিভে যাবে। তিনি তাই অনেক ভেবে, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি, এই আশা নিয়ে ব্যবসায় হাত দিলেন।

ব্যবসাটা পাথর কেনা-বেচার। ব্যাপারটা খারাপ ছিল না।

কিন্তু ব্যবসায় যতটা অভিজ্ঞতার পুঁজি থাকা দরকার অমিতাভর তা ছিল না। কাজেই তাঁকে অনেক ঠেক খেতে হল।

এদিকে অমিতাভ যখন বাণিজ্যে লক্ষ্মীর সন্ধানে ব্যস্ত, অরুণাভ তখন স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে প্রবেশের মুখে।

অরুণাভ তখন সংসার-সম্পত্তি নিয়ে যত না ভাবত, তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবত বন্ধু সৌম্যেন্দুকে নিয়ে।

সৌম্যেন্দুর সঙ্গে অরুণাভর বন্ধুত্ব স্কুল জীবনের প্রথম দিন থেকে।

অরুণাভ এবং সৌম্যেন্দুর মধ্যে প্রকৃতিগত মিল ছিল নিশ্চয়ই নইলে বন্ধুত্ব হত না। তার প্রকৃতিগত মিলের চেয়ে তাদের আকৃতিগত মিলটা লোকের নজর কাড়ত বেশি।

দুজনেই রীতিমত লম্বা। চোয়ালের গড়নও লম্বা। দুজনের নাকই টিকোলো এবং টানা টানা চোখ। তবে অরুণাভর রঙ লালচে আভাযুক্ত ফর্সা, আর সৌম্যেন্দুর উজ্জ্বল শ্যাম।

আকৃতিগত এতখানি মিল এবং সেই সঙ্গে দুজনের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্পর্কের জন্য অনেকেই ওদের দুই ভাই বলে ভুল করত। কেউ কেউ জিজ্ঞাসাও করে বসতো, 'তোমরা কি দুই ভাই?'

প্রশ্নটায় প্রথম প্রথম ওরা হেসে ফেলত। কিন্তু শেষে না হেসে সোজা জবাব দিত, 'হ্যাঁ, ভাই। তবে আপন না। মাসতুতো।'

কথাটা অবিশ্বাস করার মতোও না। সৌম্যেন্দুদের উপাধি বিশ্বাস হলেও ওরা আসলে ঘোষ। কায়স্থ। অরুণাভরাও তাই।

অন্যেরা তো বটেই ওরা নিজেরাও কথাটা ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। অথচ দুজনের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান অনেকখানি। বলতে গেলে সবটাই অমিল।

অরুণাভরা কলকাতার নামী অভিজাত পরিবার। উজ্জ্বলতা তেমন না থাকলেও আভিজাত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ। তুলনায় সৌম্যেন্দু নেহাতই এক অখ্যাত পরিবারের সন্তান। নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার বলতে যা বোঝায় তা-ই।

সৌম্যেন্দুর পিতা পূর্ণেন্দুবাবু এক সাদামাটা স্কুল শিক্ষক। মা ষষ্ঠীর কৃপায় তিনি আবার আটটি সন্তানের জনক। এই আটটি সন্তানের মধ্যে সৌম্যেন্দুই কনিষ্ঠ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একেবারে শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে এই আটটি সন্তানসহ গোটা সংসারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা ছিল আর এক মহাযুদ্ধ পরিচালনার সমান কঠিন কাজ। এই কাজে পূর্ণেন্দুবাবু খুব একটা দক্ষ ছিলেন না। ফলে দারিদ্র ছিল তাঁর পারিবারিক সঙ্গী।

সৌম্যেন্দু তার পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। সে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার পিতার বয়েস ষাট এবং তার ঠিক ওপরের দাদার বয়েস বারো। বয়েসের এই পার্থক্যের জন্য সৌম্যেন্দুর সঙ্গে তার দাদা-দিদির কোনোরকম ঘনিষ্ঠতাই তৈরী হতে পারেনি।

সৌম্যেন্দু যখন দশের কোঠা পেরোল তখন সে তার পিতাকে হারাল। আর সে যখন চৌদ্দ তখন হারাল তার মাকে। তখন থেকেই সে পুরোপুরি দাদাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে পড়ল।

একরকম আগাছার মতো সে দাদা-বৌদিদের সংসারে বড় হতে থাকে। আগাছার মতো বড় হতে হতে কোনো রকমে ও স্কুলের গণ্ডীটা পেরিয়ে যায়।

একই বছরে অরুণাভ পাশ করল ফার্স্ট ডিভিসনে আর সৌম্যেন্দু কোনো রকমে থার্ড ডিভিসনে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে অরুণাভ কলেজে ভর্তি হল, কিন্তু সৌম্যেন্দু আর ও-মুখো হল না। তার ইচ্ছেও ছিল না, ইচ্ছে থাকলেও দাদাদের মত হত না। কাজেই সৌম্যেন্দু কলেজের পথ না মাড়িয়ে আয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

প্রথম কিছুদিন বাচ্চাদের ট্যুইশনি করল। তারপর সেটা ছেড়ে ধরল একটা রঙের দোকানে সেল্‌স-এর কাজ। সেই কাজটা চলে গেলে আবার ধরল ট্যুইশনি। এমনি করে দুটো বছর কেটে গেল। কিন্তু আয়ের কোনো নির্দিষ্ট পথ তৈরী হল না। এদিকে বাড়িতে

দাদা-বৌদিদের গঞ্জনা বাড়তে লাগল। ক্রমশঃ সৌম্যেন্দুর কাছে তা অসহনীয় হয়ে উঠল।

অরুণাভ তখন বি. এ. পড়ছে।

এক বর্ষণ শ্রান্ত অপরাহ্ণে অরুণাভ যখন তার পড়ার ঘরে অলস-ভাবে একটা গল্পের বই পড়ছিল, তখন হঠাৎ ঘরে ঢুকল সৌম্যেন্দু। বৃষ্টির জলে তার কাপড়-জামা সামান্য ভিজে গেছে। সে সেই ভিজে জামা-কাপড়েই একটা ডিভানের ওপর চুপচাপ বসে পড়ল।

অরুণাভ অলস চোখ তুলে সৌম্যেন্দুর দিকে একবার তাকাল। কিন্তু কিছু বলল না। যেমন বই পড়ছিল আবার তেমনি পড়তে লাগল।

সৌম্যেন্দু সামান্য সময় চুপচাপ বসে থেকে নিজেই বলল, 'আমাকে এবার কলকাতা ছাড়তে হবে।'

অরুণাভ বই-এর পাতায় চোখ রেখেই প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবি ঠিক করেছিস কিছু?'

'নাঃ!' অরুণাভর মুখের ওপর চোখ রেখেই ছোট্ট উত্তর দিল সৌম্যেন্দু। তারপর ডিভান থেকে উঠে এসে অরুণাভর পাশাপাশি একটা চেয়ারে বসল।

অরুণাভ চোখের কোণ দিয়ে সৌম্যেন্দুকে একবার দেখল। তারপর বই-এর পাতায় দৃষ্টি রেখেই বলল, 'কি করবি তা-ও নিশ্চয় ঠিক করিসনি?'

—নাঃ।

'তাহলে তুই কোথাও যাচ্ছিস না। যেমন আছিস তেমনিই থাকছিস।'

অরুণাভ হাতের বইটা টেবিলের ওপর রাখল। তারপর সৌম্যেন্দুর দিকে এমনভাবে তাকাল যে, এরপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

সৌম্যেন্দু অরুণাভর দিকে তাকাল না। সে তাকিয়ে রইল সামনের দেওয়ালে টাঙানো বিশাল আয়নাটার দিকে।

আয়নায় দুই বন্ধুর প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সৌম্যেন্দু আয়নায় একবার নিজেকে দেখল, আর একবার অরুণাভকে। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি যদি তোর ভাই হতাম, সত্যিকারের ভাই।'

সৌম্যেন্দুর এই কথায় অরুণাভকে সামান্য বিচলিত দেখাল। সে কি বলবে ভেবে না পেয়ে ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট নিজে ধরাল এবং আর একটা বাড়িয়ে দিল সৌম্যেন্দুর দিকে।

সৌম্যেন্দু সিগারেটটা না নিয়ে সিগারেটসহ অরুণাভর হাতটা চেপে ধরে আবেগ জড়ানো গলায় বলল, 'সত্যি অরু আমি যদি তোর ভাই হতাম তাহলে জীবনটা অন্যরকম হত। আমি মানুষের মতো মানুষ হতে পারতাম।'

সৌম্যেন্দুর আবেগ সঞ্চারিত হল অরুণাভর মধ্যে। হয়তো এটা বয়েসের ধর্ম। অরুণাভও আবেগ-রুদ্ধ গলায় বলল, 'সৌম্যেন, তুই কেবল বন্ধুই না। তার চেয়েও বড়। তুই আমার ভাই। সত্যিকারের ভাই। আমি তো তোর চেয়ে দু' মাসের বড়। আজ থেকে তুই আমার ছোট ভাই।

'পরে আবার ভুলে যাবি না তো!' সৌম্যেন্দুর গলায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলা লাগল।

'কেন ভুলে যাব?' অরুণাভর গলায় তখনো আবেগ টলটল করছে।

সৌম্যেন্দু হাতের একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'ভয় হয়। তোরা বড়লোক। হয়তো সময়ের স্রোতে বন্ধুত্বের দাবী ধুয়ে মুছে যাবে।'

অরুণাভ নিঃশব্দে সৌম্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে থেকে ওকে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের আগুনের দিকে দৃষ্টি রেখে বলল, 'আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, বন্ধুত্বের দাবীকে কোনো দিন অস্বীকার করব না। কোনো অবস্থাতেই না।'

পর মুহূর্তেসৌম্যেন্দুও জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়ে বলল, 'আমিও

প্রতিজ্ঞা করছি, চিরকাল বন্ধুর মতো তোর পাশাপাশি থাকব।'

দুই বন্ধু প্রতিজ্ঞা করে পরস্পরের হাত ধরল।

ঠিক তখনই খোলা জানালা দিয়ে একটা দমকা জোলো হাওয়া ঘরে এসে টেবিলের কাগজপত্র এলোমেলো করে দিয়ে গেল।

সেই দমকা জোলো হাওয়ার স্পর্শে সৌম্যেন্দু কেমন চমকে উঠল। করুণ মুখ করে বলল, 'ভগবান আমাদের বিদ্রূপ করলেন কি ? নইলে আমাদের প্রতিজ্ঞার সঙ্গে-সঙ্গে এমন দমকা হাওয়া ঘরে এলো কেন ?'

সৌম্যেন্দুর কথায় মজা পেল অরুণাভ। সে হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, 'তোর যত সব কু-সংস্কার।'

—কু-সংস্কার বলে হাসছিস ?

—হাসার কথাই যে! হাঁচি দিলে হাঁটবি না। টিকটিকি কটকট করলে খটকা লাগবে। তোর কু-সংস্কারের কি শেষ আছে ?

অরুণাভর কথায় সৌম্যেন্দু সামান্য সময় চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমার ধারণা আতঙ্ক থেকেই কু-সংস্কারের জন্ম। আর আমাদের মতো গরীবদের মনে সব সময়ই আতঙ্ক বাসা বেঁধে থাকে। তোদের মতো বড়লোকদের—।'

সৌম্যেন্দুকে বাধা দিয়ে অরুণাভ বলল, 'এত বড়লোক বড়লোক করিস না তো। ভেতরে ভেতরে আমরা ফোঁপরা হয়ে আছি সে খোঁজ তো রাখিস না।' বাবার মাথার ওপর কত টাকার ঋণ আছে তা জানিস ? এই পাথরের কারবার না দাঁড়ালে আমাদের সব যাবে। হয়তো এই বাড়িটা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। বাবা তো মাঝে-মাঝেই ভেঙে পড়েন।'

অরুণাভর কথায় কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সৌম্যেন্দু। কিছুক্ষণ তার মুখে কোনো কথা সরল না। চুপ করে থেকে কি একটু ভাবল। তারপর কেমন ভাবাবেশের মধ্যে বলল, 'তার মানে, সংসারের ওপরের চেহারাটা বড্ড প্রতারণা করে। আসলে আমরা যা দেখি, সব সময় তা সত্যি দেখি না।'

—মানে ?—অরুণাভ চোখ সূক্ষ্ম করল।

সৌম্যেন্দু ম্লান হেসে বলল, 'সংসারের সব কিছুই খুব ঠুনকো অরু।'

—এটা তো পুরোনো কথা।

—হ্যাঁ পুরোনো, কিন্তু খাঁটি।

কথাটা বলে সৌম্যেন্দু গোটা ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

অরুণাভর পড়ার ঘরটা বিশাল। একটা হলঘরের মতন। অনেক উঁচু সিলিং। উঁচু ঘরের দেওয়ালে দু'খানা বিরাট আকারের অয়েল পেইন্টিং। সৌম্যেন্দু শুনেছে, ছবি দুটো অরুণাভর ঠাকুর্দা এবং তার বাবার। ধুলো পড়ে ছবির রঙ এখন অনেক ঝাপসা। ঘরের ঠিক মাঝখানে কালো রঙের একটা বিশাল ডিম্বাকৃতি টেবিল। টেবিলটাকে ঘিরে রয়েছে গুটিকয়েক পিঠ-উঁচু চেয়ার। টেবিলের মুখোমুখি দেওয়ালে টাঙানো আয়না। প্রমাণ সাইজ মানুষের সমান। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড় করানো গুটিকয়েক বিরাট আকারের কাচের আলমারি। আলমারিগুলোর ভেতরে অনেক সব পুরোনো বই-কাগজ। আলমারিগুলো যে বড় একটা ব্যবহার হয় না তা দেখলেই বোঝা যায়।

ঘরের একপাশে সুন্দর চাদরে ঢাকা একটা ডিভান।

সৌম্যেন্দু ঘরের চারদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে ভাবল তারা যে-তিনখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে সেই তিনখানা ঘরের চেয়েও অরুণাভদের এই একখানা ঘর বড়। একতলার ওই বদ্ধ ঘরগুলোতে সৌম্যেন্দু এক-এক সময় হাঁফিয়ে ওঠে। তাই সময়ে অসময়ে পালিয়ে আসে অরুণাভদের বাড়িতে। এখানে এসে সে যেন মুক্তির স্বাদ পায়। কিন্তু এই মুহূর্তে, অরুণাভর কথা শোনার পর তার মনে হল, এখানকার আবহাওয়াতেও মুক্তির স্বাদ নেই। তাই কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকল তার।

সৌম্যেন্দু চোখ দিয়ে ঘর পরিক্রমা শেষ করে অরুণাভর দিকে তাকাল। অরুণাভ তাকিয়েই ছিল ওর দিকে। সৌম্যেন্দু অরুণাভর চোখে চোখ রেখে ম্লান হেসে বলল, 'না! অরু আমার এখানে

থাকতে মন চাইছে না। অন্তত কিছু দিনের জন্যে বাইরে থেকে ঘুরে আসি। দেখি, কোথাও কিছু হিল্লে হয় কিনা।

—তার মানে তুই আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছিস না!

—ঠিক তা নয়। আসলে মনটাই কেমন উড়ুউড়ু হয়ে গেছে।

সৌম্যেন্দু কথাটা বলে সামান্য সময় চুপ করল। তারপর বলল, 'মাসখানেক আগে বেনারসের এক আশ্রমের সঙ্গে চিঠিতে যোগাযোগ করেছিলাম। ওরা উৎসাহের সঙ্গে বলেছে, ওই চিঠিটা নিয়ে আমি যেদিন খুশি ওদের ওখানে যেতে পারি। ইচ্ছে হলে ওখানে থাকতেও পারি। অবশ্যই আশ্রমের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।'

অরুণাভ কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'আমাকে আগে এ-সব বলিসনি তো! তুই সাধু হবার কথা ভাবছিস নাকি!'

সৌম্যেন্দু তাড়াতাড়ি বলল, 'সাধু-টাধু না। আশ্রমের পরিবেশটা কেমন লাগে সেটাই একটু চেখে দেখা আর কি! তবে তোকে সবই বলতাম। তোকে না বলে কিছু করি?'

— কবে যাওয়ার কথা ভাবছিস?

—দু' এক দিনের মধ্যেই।

—টাকা-পয়সা?

— আমার কাছে যা আছে তাতেই চলে যাবে। ওখানে গিয়ে তেমন প্রয়োজন হলে তোকে চিঠি লিখব।

আরো দুটো একটা কথা বলে উঠে পড়ল সৌম্যেন্দু। এবং পরদিনই বেনারসের টিকিট কেটে রওনা হল।

অরুণাভর ডায়েরী লেখার অভ্যেস। রোজ না হলেও মাঝেমধ্যে সে ডায়েরী লেখে। অন্তত বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটলে। সৌম্যেন্দুর চলে যাওয়ার ব্যাপারটাকে একটা বিশেষ ঘটনা বলেই সে মনে করল। অরুণাভ ডায়েরীতে লিখল,—'সৌম্যেন্দুর মধ্যে সংসার সম্বন্ধে একটা অনাসক্তি দেখা দিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, হয়তো সে সাধু-টাধু হয়ে যাবে। আমি আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ওকে চিরকাল ভাই-এর মতো দেখবো। তবে সে আমার ওপর পুরোপুরি

আস্থা রাখতে পারছে না। তাই বেনারসে আশ্রমে চলে গেল। আমি কিন্তু চিরকাল আমার প্রতিজ্ঞা মনে রাখব। ওর এইভাবে চলে যাওয়াটা আমার খুব খারাপ লেগেছে।'

অরুণাভর ধারণা ছিল, কয়েক দিন বাদেই সৌম্যেন্দু ফিরে আসবে। কিন্তু সে এলো না। এক মাস পরে তার ফিরে আসার বদলে একটা চিঠি এলো। সে চিঠিতে লিখেছে, 'অরু, এখানে আমি ভালোই আছি। কলকাতায় কবে ফিরতে পারব বলতে পারছি না। অল্পদিনের মধ্যে ফিরছি না, এটা ঠিক। তবে তুই ইচ্ছে করলে আসতে পারিস। বাড়িতে আলাদা চিঠি দিলাম না। তুই বুঝিয়ে বলে দিস্।'

চিঠিটা পেয়ে অরুণাভর মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি লিখল আশ্রমের ঠিকানায়। তার উত্তর এলো আবার একমাস পর। সৌম্যেন্দু তাতে লিখেছে, 'সন্ন্যাসী হব এটা ভাবছিস কেন? সন্ন্যাসী হওয়া অত সোজা না। আশ্রমের নানা রকম কাজ আছে। আমি কিছু কিছু কাজ করছি। এঁরা আমাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন। এই সুন্দর পরিবেশে মনটা বেশ আনন্দে আছে।'

এইভাবে দুই বন্ধুর মধ্যে কিছুদিন চিঠির আদান-প্রদান চলল। তারপর একদিন এই যোগসূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেল। অরুণাভ পর-পর চিঠি দিল কিন্তু আশ্রম থেকে কোনো উত্তর এলো না। অরুণাভ অনুভব করল, সৌম্যেন্দু সংসারের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ রাখতে চায় না। তাই কতকটা অভিমানে সেও চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিল।

দেখতে দেখতে দুটো বছর পেরিয়ে গেল। অরুণাভ বি. এ. পাশ করে বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিল। আর তখনই ঘটে গেল অঘটন। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হয়ে অরুণাভর বাবা অমিতাভবাবু একদিন আত্মহত্যা করলেন। অরুণাভ সঙ্গে-সঙ্গে অগাধ জলে পড়ল। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে পাওনাদারদের পাওনা

মিটিয়ে দেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না।

এদিকে স্বামীর অপঘাতে মৃত্যুর শোক সামলাতে না পেরে অল্প দিনের মধ্যেই অরুণাভর মাও মারা গেলেন। কিছুদিনের জন্য অরুণাভর সমস্ত জগত যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

অরুণাভর হাতে তখন ক্যাশ টাকা নেই। ক্যাশ টাকার অভাবে ব্যবসা চালানো অসম্ভব। ইতিমধ্যে পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য সবই বিক্রী হয়ে গেছে কেবল সম্বল আছে বসতবাড়িটা। অরুণাভ অনেক ভেবে দেখল, এই বাড়িটা বিক্রি করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। সাত পাঁচ ভেবে সে বাড়িটা বিক্রী করে দিল। পরিবর্তে পেল মোটা ক্যাশ।

অবশ্যি মূল বসতবাড়িটা বিক্রী হলেও অরুণাভর এণ্টালী অঞ্চলে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি রয়ে গেল। বাড়িটা খুবই ছোট। ওপর নীচে মিলিয়ে মাত্র পাঁচখানা ঘর। তা-ও নিচের তিনখানা ঘর ভাড়া দেওয়া। এই ছোট্ট বাড়িটাতে আগের বাড়ির বিশাল বিশাল আসবাবপত্র আনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাই সে পুরোনো আসবাবপত্রও বিক্রী করে দিল। নতুন করে বাঁচার সঙ্কল্প নিয়ে দু'খানা ঘরের দোতলায় চলে এলো সে। ঠিক করল, বড় ব্যবসাদার হয়ে বাবার অপমানের শোধ তুলবে।

কিন্তু নতুন করে ব্যবসা শুরু করার আগে সে ভাবল সৌম্যেন্দুর আর একবার খোঁজ করা দরকার। তবে এবার আর চিঠি লিখে খোঁজ নেবে না, সোজা চলে যাবে বেনারসের আশ্রমের ঠিকানায়।

বেনারসে যাওয়ার আগের দিন রাত্রে সে ডায়েরীতে লিখল, 'পিতৃদেবের আত্মহত্যার ব্যাপারটা আমি কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারি না। আত্মহত্যা মানেই জীবন থেকে পলায়ন। পলায়নকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। পলায়ন মানেই কাপুরুষতা। তবু কোথায় যেন খটকা থেকে যায়। পিতৃদেব যে-অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন তাতে আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল কি? মানুষের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন জীবন সম্বন্ধে তার

আর কোনো স্পৃহা থাকে না। বাঁচার ইচ্ছেটাই চলে যায়। পিতৃদেবের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় তাই হয়েছিল।

'পিতৃদেব ব্যবসায় অনভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় দাঁড়ানো ছাড়া তাঁর সামনে অন্য কোনো পথ ছিল না। এদিকে ব্যবসায় নামার অনেক আগেই তিনি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। বলতে গেলে একেবারে কোমর পর্যন্ত ডুবে ছিলেন। আমি জানতাম না যে, অনেক দিন থেকেই ঋণটাই ছিল মিত্তির বাড়ির আয়ের পথ। বংশের একমাত্র সন্তানের কথা ভেবে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। এদিকে ব্যবসায় নামার পর থেকে পাওনাদারদের অপমান-গঞ্জনা তাকে দিনের পর দিন সহ্য করতে হচ্ছিল। একটা মানুষ আর কত সহ্য করতে পারে? তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি আত্মহননের পথটা বেছে নিয়েছিলেন। এর জন্য কি তাঁকে দোষ দেওয়া যায়? সত্যি, মনে মনে তিনি কত না কষ্ট পেয়েছেন। ভাবলে গা শিউরে ওঠে। বাবার সঙ্গে মা-ও একই কষ্ট পেয়েছেন।

'আমার শান্তি নেই। চিরকাল মা-বাবার কষ্ট আমার বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকবে। ব্যবসায় যদি কোনোদিন তেমন ধনী হতে পারি তাহলেই এই কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে। আমি সেই চেষ্টাই করব। আঁট-ঘাট বেঁধে আমাকে ব্যবসায় নামতে হবে। তবে একটা কথা। এই সময় সৌম্যেন্দু আমার পাশে থাকলে খুব ভালো হত। সে কেবল বিশ্বাসী বন্ধু নয়। সেদিনের সেই প্রতিজ্ঞামত সে আমার ভাই-ও। অতএব ব্যবসায় নামার আগে তার খোঁজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। যেমন করে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

পরদিন বেনারসের পথে রওনা হল অরুণাভ।

এদিকে বেনারসে সৌম্যেন্দুর জীবনে তখন অন্য ঘটনা ঘটছে।

আশ্রমের একটা প্রভাব পড়েছে তার জীবনে। সংসার তখন আর তাকে টানে না। ভোগের পরিবর্তে বৈরাগ্য তখন তাকে হাতছানি দেয়। সংসারী মানুষের খবর শুনতে তার ভাল লাগে

না। এমনকি কলকাতার কথা সে মনে করতেও চায় না। আশ্রমের যে-সব সমাজকল্যাণমূলক কাজে সে এতদিন যুক্ত ছিল এখন সে-সবে আর তার মন ভরে না। সাধন ভজনের মাধ্যমে এখন সে শান্তি পেতে চায়। একদিন আশ্রমের মহারাজ অসীমানন্দকে সে তার মনের কথা খুলে বলল। সব শুনে মহারাজ বললেন, 'গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরীব-দুঃখীর সেবা করা তো কিছু কম কাজ নয়, সৌম্যেন্দু। আরো কিছুদিন এই সবই করো না।'

সৌম্যেন্দু নাছোড়বান্দা। তার দীক্ষা চাই। সে এবার পুরোপুরি সাধনমার্গে যাবে।

অসীমানন্দ মহারাজ স্মিত হেসে বললেন, 'তোমাকে এখনো অনেক পথ পেরোতে হবে সৌম্যেন্দু। সেই পথে কাঁটা আছে, কাঁকর আছে। চরণ যুগল রক্তাক্ত হবে।'

'আদেশ করুন আমাকে কি করতে হবে। যা বলবেন তা-ই করবো। তবে দীক্ষা আমার চাই।' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল সৌম্যেন্দু।

মহারাজ সৌম্য হেসে বললেন, 'বেশ। তাহলে পায়ে হেঁটে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করো। যতটা পায়ে হাঁটা সম্ভব ততটা। উত্তর ভারত শেষ করে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তারপর তোমার কি করণীয় আমি বলবো।'

স্বামী অসীমানন্দ আদেশ দিয়েই স্থান ত্যাগ করলেন। সৌম্যেন্দুর জবাবের জন্য অপেক্ষা করলেন না।

সৌম্যেন্দু কয়েকদিন স্থিরভাবে ভাবল। এতটা পথ হাঁটার কথা ভেবে অস্বস্তিতে পড়ল খুব। মনের মধ্যে তেমন জোর পেল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জেদ করেই বেরিয়ে পড়ল।

এক বছরের ওপর সৌম্যেন্দু ঘুরল পথে পথে। হরিদ্বার, ঋষিকেশ, কেদার-বদ্রী, অমরনাথ ঘুরে ফেরার পথে এলাহাবাদ এলো। যখন সে এলাহাবাদে ফিরল, তখন তাকে আর চেনাই যায় না। দাড়িতে মুখ ঢাকা। মাথায় বড় বড় উস্কোখুস্কো চুল। পরনের কাপড়-পাঞ্জাবী ধুলিমলিন। চেহারা আধা সন্ন্যাসী। শরীরের

দিক দিয়ে পুরোপুরি বিধ্বস্ত, অবসন্ন। মন তার তখনো অতৃপ্ত। মনকে সে বার-বারই প্রশ্ন করছে, এতটা পথ পরিক্রমা করে সে কি পেল? নতুন করে কিছুই তো পেল না। বরং অবসাদ আরো বাড়ল। হতাশা আচ্ছন্ন করল তাকে।

অবসন্ন দেহ-মনকে বিশ্রাম দিতে সৌম্যেন্দু ক'দিনের জন্য প্রয়াগে আশ্রয় নিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তখন সে এতই বিধ্বস্ত যে প্রয়াগে আসার ক'দিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রচণ্ড জ্বরে তার উত্থান-শক্তি রইল না। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় সঙ্গমের কাছে এক ঝোপড়ির ধারে পড়ে রইল সে।

তখন সকাল। প্রয়াগে অন্য দিনের মতই স্নানার্থীদের ভিড়। সুপ্রিয় বোস তার বিধবা বোন এবং ভাগ্নীকে নিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করতে যাচ্ছিলেন।

সুপ্রিয় বোস এলাহাবাদের প্রবাসী বাঙালী। বিল্ডিং মেটিরিয়ালস-এর ব্যবসা করেন। মায়া তার দূর সম্পর্কের বিধবা বোন। বোনের একমাত্র সন্তান সুমিত্রা। অষ্টদশী। মায়া তার মেয়ে নিয়ে থাকে কলকাতায়।

অষ্টদশী সুমিত্রা ভালো নাচে। নাচের একটা কনট্রাকট্ নিয়েই এলাহাবাদ এসেছে সে।

মেয়ের নাচের প্রোগ্রাম শেষ। এবার কলকাতায় ফেরার পালা। কলকাতায় ফেরার আগে মায়ার ইচ্ছে প্রয়াগে স্নান করবে। বোনের ইচ্ছেতেই সুপ্রিয় তার বোন এবং ভাগ্নীকে নিয়ে প্রয়াগে এসেছে।

পুণ্যার্জন নিয়ে মাথাব্যথা নেই সুমিত্রার। সে চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাচ্ছিল। ঢাল পথে নামতে-নামতে ভূমিতে শায়িত সৌম্যেন্দুর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। রুক্ষ চুল, উড়ো দাড়ি এবং মলিন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা যুবকের কাতর কণ্ঠ তাকে আকর্ষণ করল। যুবকটি তখন চোখ বুজেই বলছে, 'বড় কষ্ট।। একটু জল।'

সুমিত্রা অসুস্থ যুবকের দিকে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, 'মামা, কোনো বাঙালী তীর্থযাত্রী। মনে হচ্ছে, খুব অসুস্থ।'

সুমিত্রার কথা শুনে চোখ মেলে তাকাল সৌম্যেন্দু। জ্বরের প্রাবল্যে তার চোখ তখন জ্বালা করছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সে তাকাল। সৌম্যেন্দুর মনে হল, অজন্তা-ইলোরার কোনো নারীমূর্তি হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই নারীর হাতের মুদ্রা, কোমরের বঙ্কিম ভঙ্গি, চোখের বড় বড় ফাঁদ, ভুরুর টান, অসুস্থ সৌম্যেন্দুকে যেন বলতে লাগল, 'কিসের দীক্ষা ? কি হবে রুক্ষ সন্ন্যাস-জীবন দিয়ে ?'

ছন্দোময় নারীদেহ যেন তাকে বলতে লাগল, পৃথিবীতে জন্মে যে-মানুষ আমার আস্বাদ পায়নি তার জীবন অর্থহীন। আচ্ছন্ন অবস্থায় সৌম্যেন্দুর হঠাৎ অরুণাভকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল অরুণাভর আভিজাত্য-ঐশ্বর্যের কথা। ভাবল, পড়ন্ত হলেও অরুণাভরা জমিদার বংশ। হাতি মরা হলেও লাখ টাকায় বিকোয়। অরুণাভরাই বুঝি কেবল ভোগের অধিকারী। অরুণাভরা ভোগ করবে আর সৌম্যেন্দুরা দূর থেকে কেবল দেখবে। এটাই যেন সামাজিক বিধান।

অসুস্থ অবস্থায় আবেগ সহজেই প্রশ্রয় পায়। সৌম্যেন্দুর আবেগও বাধা মানল না। অশ্রুর আকারে প্রকাশ পেল। চোখের জলের মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলল, 'অরু, অরুণাভ, আমি যদি তুই হতাম তাহলে আজকের এই ভূমিশয্যা গ্রহণ করতে হত না। তাহলে জীবনটাকে অন্যভাবে বইয়ে নিতাম।' তবে এত কথা তার মুখ দিয়ে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হল না। তার মুখ দিয়ে কেবল বেরিয়ে এলো, অরু, অরুণাভ। বাকি কথার পরিবর্তে ঠোঁট জোড়া নড়ল কেবল। আপনা হতেই তার চোখ জোড়া বন্ধ হয়ে গেল। চোখের কোণ বেয়ে জল নেমে এলো।

সুপ্রিয় বোস এবং তার বোন ততক্ষণে সুমিত্রার পাশে এসে

দাঁড়িয়েছে। তারা কিছু বলবার আগেই সুমিত্রা বলল, 'নাম বলছে অরুণাভ।'

—হ্যাঁ, তাইতো শুনলাম। মনে হয় পায়ে হেঁটে তীর্থে তীর্থে ঘুরছে। এ-রকম তো অনেকেই করে। এরপর হয়তো সন্ন্যাস নেবে।

সুমিত্রার মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ওমা তাই নাকি? তাহলে তো একে এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া পাপ হবে। দাদা তুমি তাহলে একে হাসপাতালে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।'

—হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি।—বললেন সুপ্রিয়বাবু।—এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

হাসপাতালে দেওয়ার দু'দিন পরেই সৌম্যেন্দুর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। জ্বরও অনেক নামল। কিন্তু শারীরিক অবসন্নতা রয়েই গেল। কথা বলতে খুবই কষ্ট।

সুপ্রিয়বাবু নিজে দু'বেলা রুগীর খোঁজ নিতে এলেন। সুপ্রিয়বাবু এলেই সৌম্যেন্দুর চোখ কাউকে যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল। সুপ্রিয়-বাবু অনুভবে বুঝতেন, তরুণ পরিব্রাজকের চোখ কোনো পরিচিতের মুখ খুঁজছে। কিন্তু প্রশ্ন করে তাকে বিব্রত করতেন না।

সৌম্যেন্দু সঙ্গমের সেই তরুণীকে দেখতে না পেয়ে হতাশভাবে চোখ বন্ধ করে ফেলত। কিন্তু কথা বলতে কষ্ট হবে বলে মুখে কোনো প্রশ্নও করত না।

পাঁচদিনের দিন সৌম্যেন্দু অনেকখানি সুস্থ হল। অনেকটা স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তাও বলতে পারল সে। সুপ্রিয়বাবু সেদিন তাকে দেখে বেশ আনন্দের সঙ্গে বললেন, 'তাহলে তুমি আজ অনেক সুস্থ।' 'তুমি' বলে ফেলে সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধন করে বললেন, 'তুমি বললাম বলে কিছু মনে করো না। আমার ছেলে সঞ্জয় তোমার সমবয়েসীই হবে। সে এখন বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে।'

সৌম্যেন্দুর তখনো শারীরিক দুর্বলতা খুবই। ধীরে ধীরে সে বলল, 'আপনি তো আমাকে তুমিই বলবেন। বয়েসের জন্যে তো

বটেই, তাছাড়া আপনাদের জন্যেই তো জীবন ফিরে পেয়েছি।'

—কে কাকে জীবন দেয়, অরুণাভ ?

সৌম্যেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'অরুণাভ। আমার নাম তো অরুণাভ নয়। আমার নাম সৌম্যেন্দু। সৌম্যেন্দু বিশ্বাস।'

সুপ্রিয়বাবুও বেশ অবাক হয়ে বললেন, 'তাই নাকি ? কিন্তু সেদিন প্রয়াগে আচ্ছন্ন অবস্থায় অরুণাভ নামটা বলেছিলে যে।'

সৌম্যেন্দু এবার ম্লান হেসে বলল, 'অরুণাভ মিত্র আমার বাল্য বন্ধু। কলকাতায় থাকে। জ্বরের ঘোরে কেন যে ওর নামটা উচ্চারণ করেছিলাম, জানি না।'

—তার মানে তুমি তোমার এই বন্ধুটিকে খুবই ভালোবাসো।

—তা বাসি। আসলে আমরা দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসি। তবে ওরা ধনী। আমরা গরীব। তাছাড়া সংসারটাকে আমি খুব ভালো চোখেও দেখতাম না। তাই সংসার ছেড়ে চলে এসেছিলাম বেনারসের আশ্রমে। সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব না ভেবে অরুণাভর শেষের দিককার চিঠির জবাবও দিইনি।

সুপ্রিয়বাবু সস্নেহে বললেন, 'বুঝতে পারছি, তোমার বুকের মধ্যে অনেক অভিমান জমা হয়ে আছে।'

সুপ্রিয়বাবুর এই কথায় সৌম্যেন্দুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে ধীরে ধীরে সুপ্রিয়বাবুকে তার জীবনের সব কথা বলেছিল সেদিন।

সব শুনে সুপ্রিয়বাবু সৌম্যেন্দুকে বলেছিলেন, কিছু মনে করো না সৌম্যেন্দু। আমার মনে হয়, তোমার সংসারের আকর্ষণ এখনো যায়নি। চাকরি-বাকরি করে তোমার আরো কিছুদিন সংসারে থাকা উচিত। তার পরেও যদি সংসার ভালো না লাগে তখন অন্য কথা।

সৌম্যেন্দু সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আমাকে চাকরি দেবে কে ?'

সুপ্রিয়বাবু সহাস্যে বললেন, 'এটা কোনো সমস্যাই না। যে ছেলে এতটা পথ পায়ে হেঁটে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে পারে, ধৈর্য-

সহনশীলতা যার এতখানি, সে ইচ্ছে করলে সব কিছুই করতে পারে। চাকরি করলে তুমিও অনেক উন্নতি করতে পারবে। যদি চাও আমিই তোমার চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি।'

সুপ্রিয়বাবুর কথায় সৌম্যেন্দুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'সত্যি আপনি আমাকে চাকরি দেবেন?'

—তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো। তারপর যেদিন বলবে সেদিনই ব্যবস্থা করে দেব।

সৌম্যেন্দুর যেন আর তর সইছিল না। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তো এখন অনেক সুস্থ। চাকরিটা কোথায়? কি চাকরি?'

—এলাহাবাদ থেকে সামান্য দূরে। প্রতাপগড় নামে একটা জায়গায়। ওখানে আমার এক পরিচিত লোকের পাথরের খুব বড় ব্যবসা আছে। ওদের একজন সুপারভাইজার চাই। কেবল প্রতাপগড় না, চুণারেও ওদের পাথরের ব্যবসা।

—তাহলে ওদের আপনি লিখে দিন। ডাক্তারবাবু বলেছেন, আমি কয়েক দিনেই সুস্থ হয়ে উঠব।

সুপ্রিয়বাবু সামান্য হেসে বললেন, 'সুস্থ হয়েই চাকরিতে চলে যাবে? আশ্রমে যাবে না?'

সৌম্যেন্দু সামান্য থতিয়ে গিয়ে বলল, 'না-না সে কি কথা? আশ্রমে যাব। নিশ্চয় যাব।'

পরক্ষণেই সে অন্য কথায় চলে গেল। বলল, 'আচ্ছা, এই ক'দিনের মধ্যে ওই দুই ভদ্রমহিলাকে তো দেখলাম না।' তারপর সামান্য সলজ্জ ভঙ্গিতে যোগ করল, 'সেদিন ভদ্রমহিলারা আমাকে লক্ষ্য না করলে কি-যে হতো। আপনি হয়তো খেয়ালই করতেন না। জ্বরের ঘোরেও আমি সেদিন সবই বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু শরীরে কোনো শক্তি ছিল না। ভগবানই যেন ওদের পাঠিয়েছিলেন।'

—ওরা আমার বোন আর ভাগ্নী। আপন বোন নয় অবিশ্যি। তবে আপনার চেয়ে কিছু কম নয়। ওরা কলকাতায় থাকে। এখানে বেড়াতে এসেছিল। তোমাকে যেদিন হাসপাতালে আনি, তারপর

দিনই ওরা চলে গেছে। টিকিট তো কাটাই ছিল।

মেয়েটি চলে গেছে শুনে সৌম্যেন্দুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করল না। কেবল ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কলকাতায় চলে গেছেন। খুব খারাপ লাগছে। ধন্যবাদও দেওয়া হল না।'

—ধন্যবাদ দিতে চাও, পরে দিও। ওরা তো মাঝে-মাঝেই আসে। সুমিত্রা মানে, আমার ভাগ্নীর প্রায়ই নাচের প্রোগ্রাম থাকে। এবার যখন আসবে তখন ধন্যবাদ দিও।

সুপ্রিয়বাবুর কথার মধ্যে কিছুই ছিল না। তবু এই কথার সূত্র ধরেই সৌম্যেন্দুর চোখের সামনে প্রয়াগের সেই ছবিটা ভেসে উঠল। মনে পড়ে গেল সেই মেয়ের চোখের ফাঁদ, ভুরুর টান, কোমরের ভঙ্গি আর হাতের মুদ্রা। সে মনে মনে বলল, তাহলে তার চোখ ভুল করেনি। সত্যিই ওই মেয়ে অজন্তা-ইলোরার জীবন্ত নারীমূর্তি।

দিন পনেরোর মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল সৌম্যেন্দু। সুস্থ হয়েই সে ছুটল বেনারসের আশ্রমে স্বামী অসীমানন্দের কাছে। স্বামীজীকে কিছুই বলতে হল না। তিনি নিজেই বললেন, 'আমি জানতাম। সন্ন্যাস-জীবন তোমার জন্যে নয়। তাই দেরী করছিলাম। মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো কারো যাবার উপায় নেই। আমি প্রার্থনা করি, তোমার চৈতন্য হোক।'

এসব কথা সৌম্যেন্দুর মনে কোনো রেখাপাত করল না। অন্য কিছুই তখন তার মনের ওপর রেখাপাত করতে পারত না। তার মনের অবস্থাই তা ছিল না। তার মনের মধ্যে তখন একটি নামই অনুরণিত হচ্ছে। সে নাম সুমিত্রার। যাকে সে ক্ষণিকের জন্য একবার মাত্র দেখেছে, এখন সে-ই তার স্বপ্ন। সে এখন দিনেই স্বপ্ন দেখছে, সুমিত্রাকে নিয়ে সংসার বাঁধবে। আর সংসার বাঁধার রসদ হিসেবে প্রতাপগড়ের চাকরিটা এখন তার কাছে পরম অবলম্বন।

প্রতাপগড়ের চাকরিটা সৌম্যেন্দুর ভালোই লাগল। ছোটবড় টিলা ভেঙে, মাটি খুঁড়ে নানা রকমের নানা আকারের পাথর বের

করা হয়। তারপর সেইসব পাথরকে সুন্দর করে ভেঙে, কেটে, চেরাই করে লরী বোঝাই করা এবং সেই লরী ভর্তি পাথর রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া। স্টেশন থেকে ওয়াগন ভর্তি হয়ে এই পাথর চলে যায় বিভিন্ন গন্তব্য জায়গায়। কেবল ট্রেনে নয়, লরীতেও বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এইসব পাথর। মোটামুটি এই হল প্রতাপগড়ের কোম্পানীর কাজ। কুলীদের কাজকর্ম দেখার জন্য অনেক সুপার-ভাইজারের প্রয়োজন। সৌম্যেন্দু এইরকম একজন সুপারভাইজারের চাকরি পেল। এই চাকরিতে মাইনে যেমন আছে তেমনি আছে উপুরি। পাথরের হিসেবে যদি গডমিল কেউ না-ও করে, তবু কুলীদের পয়সার ভাগ আছে। সৌম্যেন্দু ক'মাসেই কাজের মধ্যে বেশ রস পেয়ে গেল।

কোম্পানীর মালিক এক ইউরোপিয়ান সাহেব। নাম জনসন। সৌম্যেন্দু যখন চাকরি নিয়ে এলো তখন তাঁর বয়েস হয়েছে। তাঁর একমাত্র ছেলে থাকে আমেরিকায়। জনসনের ছেলে তার বাবাকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতে সে আর কখনো ফিরবে না। তাকে আর ফেরার কথা যেন না বলা হয়। বরং বাবা-মা-ই যেন চলে আসে আমেরিকায় তার কাছে।

জনসন তবু চালিয়ে যাচ্ছিলেন পাথর কাটার কাজ। উৎসাহে ভাটা পড়লেও ব্যবসার আনন্দটা নষ্ট হয়নি তখনো। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল।

তখন মাত্র বছরখানেক চাকরি হয়েছে সৌম্যেন্দুর। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে সাহেবের নজর কেড়েছে। তার কর্মে নিষ্ঠা দেখে খুশি হয়েছেন সাহেব। সাহেব সুপ্রিয় বোসকে জানিয়েও দিয়েছিলেন সে-কথা। ছোট্ট চিঠিতে লিখেছিলেন, ভবিষ্যতে ছেলেটি অনেক উন্নতি করবে। আমি ওর প্রমোশনের ব্যবস্থা করব।

এদিকে এর মধ্যে আরো একবার এলাহাবাদে এলো সুমিত্রা এবং তার মা। সেবারেও এলো এক নাচের প্রোগ্রাম নিয়ে। সুপ্রিয়বাবু কথায় কথায় বোনকে বললেন, 'মায়া এবার তুই মেয়ের বিয়ে দে।

কতদিন আর নেচে নেচে বেড়াবে ?'

কথাটা সুমিত্রার কানে যেতেই সে ফোঁস করে বলল, 'কতদিন মানে ? আমি তো নাচটাকে প্রোফেসন হিসেবেই নিয়েছি।'

সুপ্রিয়বাবু সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'প্রোফেসন আবার কি ? এতদিন করেছো, ঠিক আছে। কিন্তু এবার বিয়ে-টিয়ে দিতে হবে।'

সুপ্রিয়বাবুর কথার পিঠে-পিঠে সুমিত্রার মা বললেন, 'হ্যাঁ, দাদা তুমি ভালো ছেলে ছাখো। আমার প্রেসার আজকাল খুবই ওঠানামা করে। ডাক্তার বলেছে, এটা ভালো না। তাছাড়া বুক ধড়ফড়ানি, মাথা ঘোরা এ-সব তো আছেই। কবে কি হয় বলা যায় না। উনি ক'টা টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাই তার সুদে চলছে। কিভাবে যে চালাই তা তুমি জানো। এর মধ্যে আবার বাড়ি ভাড়া আছে। না, দাদা, তুমি ভালো ছেলে ছাখো। আমি ওর বিয়ে দেব।'

সুপ্রিয়বাবু এবার হালকা সুরে বলেছিলেন, 'একটি ভালো ছেলে আছে। তার অবিশ্যি পয়সাকড়ি নেই। লেখাপড়াতেও কেবল ম্যাট্রিক। মোটামুটি একটা চাকরি করে। তবে ছেলেটি খুবই সৎ। তোমরা তাকে চেনো। উপাধি বিশ্বাস হলেও তারা ঘোষ।'

সুমিত্রা এবং সুমিত্রার মা দুজনেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুপ্রিয়বাবু নিজেই আবার বললেন, 'ছেলেটির কথাবার্তা শুনে যা মনে হয়েছে, সুমিত্রাকে একবার দেখেই তার ভালো লেগে গেছে। বলতে পারো, লাভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট। আমার মনে হয়, সুমিত্রার জন্যেই সে সন্ন্যাস-জীবন ছেড়ে সংসার-জীবনে ফিরে এসেছে। ছেলেটির নাম সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। তোমরা অবিশ্যি অরুণাভ বলে জানো।'

সুপ্রিয়বাবুর বোন মায়া চোখ বড় বড় করে বলল, 'অরুণাভ ! মানে প্রয়াগের সেই অসুস্থ ছেলেটি ?'

সুমিত্রা চোখ সূক্ষ্ম করে বলল, 'যা-ই বলো মামা, তোমার কথা শুনে ভারি মজা লাগছে। সন্ন্যাসী হতে গিয়ে সংসারী। তা-ও

আবার একটি মেয়েকে সামান্য দেখেই।'

মায়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'না দাদা, এ ছেলেকে আমার ভালো ঠেকছে না। এদের মতির ঠিক থাকে না। এরা এক করতে গিয়ে আর এক করে বসে। শিব গড়তে বাঁদর গড়ে। তাছাড়া ধনী না হোক, মোটামুটি একটা অবস্থা তো থাকবে। এর তো চালচুলো কিছুই নেই। তুমি কি-যে বলো।'

সুমিত্রা কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ নিজের নাম অরুণাভ বলেছিলেন কেন?'

—ও নিজের নাম অরুণাভ বলেনি। আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল। অরুণাভ আসলে ওর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নাম। সে কলকাতার এক ধনী পরিবারের ছেলে। সৌম্যেন্দু বলেছে, হঠাৎ জ্বরের ঘোরে সেদিন কেন যে অরুণাভর নামটা উচ্চারণ করেছিল, তা সে জানে না। এটা তার কাছেও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আসলে অরুণাভকে সে খুবই ভালোবাসে। ওই অবস্থায় তাই বন্ধুর নামটাই মনে এসেছিল।'

সেদিন ওদের আলোচনা আর এগোয়নি। ওখানেই থেমে গিয়েছিল। তবে সৌম্যেন্দুর সঙ্গে যে সুমিত্রার বিয়ে হবার নয় সুপ্রিয়বাবুও তা মেনে নিয়েছিলেন।

এদিকে প্রতাপগড়ে ঘটে গেল এক অঘটন। জনসন সাহেবের স্ত্রী মিসেস জনসন টিলা থেকে পা ফস্‌কে নিচে পাথরের ওপর পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। এই দুর্ঘটনায় জনসন সাহেব এত মুষড়ে পড়লেন যে, তার আর ব্যবসা-ট্যবসার দিকে মনই রইল না। এমন কি ভারতে থাকার ইচ্ছেটাই তাঁর চলে গেল।

জনসন সাহেব সৌম্যেন্দুকে ডেকে একদিন বললেন, 'বিশ্বাস, আমার ইচ্ছে ছিল তোমার মতো কর্মঠ ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত করে দি। কিন্তু সে সুযোগ হল না। এবার আমি সব কিছু বিক্রী করে দিয়ে চলে যাব আমেরিকা। ছেলের কাছে। তবে তোমার পরিচিত কোনো ক্রেতা যদি থাকে তাকে বিক্রী করে দিতে পারি। যা মার্কেট প্রাইস

তার চাইতে কমে ছেড়ে দিতেও আমার আপত্তি নেই। কণ্ডিসন থাকবে তোমাকে সে ভালো পোস্টে রাখবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সৌম্যেন্দুর অরুণাভর কথা মনে হয়েছিল। জনসন সাহেবকে কথাটা বলেও ফেলল। বলল, 'স্যার আমাকে ক'টা দিন সময় দিন। কলকাতায় আমার এক ধনী বন্ধু আছে। তাকে একবার লিখে দেখি। তাদেরও স্টোনের ব্যবসা। হয়তো ইণ্টারেস্টেড হতে পারে।'

এতে সাহেবের আপত্তি করার কিছুই ছিল না। অপেক্ষা করতে রাজী হয়ে গেলেন। সৌম্যেন্দু সব কিছু বলে একটা চিঠি লিখে দিল অরুণাভকে।

অরুণাভ কিন্তু সৌম্যেন্দুর চিঠি পাওয়ার আগেই বেনারসে রওনা হয়েছিল।

সে সোজা আশ্রমের ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হল। আশ্রম থেকে অরুণাভকে সৌম্যেন্দুর যে ঠিকানা দেওয়া হল সেটা প্রতাপগড়ের ঠিকানা নয়। সেটা সুপ্রিয় বোসের এলাহাবাদের ঠিকানা। কারণ সৌম্যেন্দু আশ্রমে ওই ঠিকানাই দিয়ে এসেছিল। ওই ঠিকানা দেওয়ার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তার একটাই কারণ ছিল, তা হ'ল, সুপ্রিয় বোসের সঙ্গে আশ্রমের যোগাযোগ তৈরী করে দেওয়া। সুপ্রিয়বাবু স্বামী অসীমানন্দের গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু নিয়তির এমনিই পরিহাস যে, ওই ঠিকানাটা অন্য একটা ব্যাপারে যোগসূত্র তৈরী করে দিল।

অরুণাভ বেনারস থেকে সুপ্রিয়বাবুর ঠিকানা পেয়ে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল।

বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তেই সুপ্রিয়বাবুর বাড়ির দরজা যে খুলে দিল সে আর কেউ নয়, সুমিত্রা। সুঠাম সুদর্শন যুবকটিকে দেখে সুমিত্রা সামান্য অপ্রতিভও হয়ে হিন্দিতেই বলল, 'আপ?'

সুমিত্রাকে দেখে অরুণাভ কেমন অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ঠিক অপ্রস্তুত নয়। সে যেন অভিভূত হয়ে গেল। তার মনে হল, যেন

কল্পলোকের কোনো দরজা তার চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেল। আর সেই খোলা দরজার সামনে আবির্ভূত হল এক দেবদূতী। অজানা অচেনা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেণ্ড সে কোনো কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে তাকিয়েই রইল কেবল।

সুমিত্রা গায়ের আঁচল ঠিক করতে করতে আবার প্রশ্ন করল, 'আপকো কেয়া চাহিয়ে?'

অরুণাভ এবার সহজ হয়ে স্মিত হেসে বাংলাতেই উত্তর দিল, 'আমি কলকাতা থেকে আসছি। এটা কি সুপ্রিয় বোসের বাড়ি?'

কলকাতার নামটা শুনে সুমিত্রার ভুরুতে সামান্য টান লাগল। ভালো করে আর একবার দেখল ভদ্রলোককে। ভদ্রলোকের চেহারার মধ্যে পরিচিতের কোনো আভাস পায় কিনা তা খুঁটিয়ে দেখল। কিন্তু না, পরিচিত কোনো মুখকে খুঁজে পেল না। এদিকে সুপ্রিয় মামাও তখন বাড়ি নেই। তাই সে বলল, 'হ্যাঁ, সুপ্রিয় বোসের বাড়ি। কিন্তু তিনি তো এখন বাড়ি নেই।'

মেয়েটির বাংলা কথা শুনে অরুণাভ তখন সাহস সঞ্চয় করেছে। সহজও হয়েছে বেশ। সে বলল, 'আসলে সুপ্রিয়বাবুকে আমার ঠিক প্রয়োজন নেই। আমি যাকে চাইছি তার নাম সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। বেনারসের আশ্রম থেকে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি সৌম্যেন্দুকেই চাই।'

সুমিত্রার ঠোঁটে বিদ্যুৎচমকের মতো একটা হাসি খেলে গেল। তার মনে হল, সুদর্শন ভদ্রলোকই নিশ্চয় সৌম্যেন্দুবাবুর বন্ধু অরুণাভ। সে একবার ভাবল প্রশ্নটা করে। প্রশ্নটা তার জিবের ডগায় এসেও গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা করলে অভদ্রতা হতে পারে ভেবে কিছু বলল না।

অরুণাভ নিজেই আবার বলল, 'আমি সৌম্যেন্দুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ছেলেবেলার।'

সুমিত্রা আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'আপনার নাম কি অরুণাভ?'

একজন অপরিচিতা মেয়ের মুখ থেকে নিজের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি অরুণাভকে ঘিরে ধরল। মুহূর্তে তার চোখমুখ রক্তিমাভ হয়ে উঠল। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমার নাম অরুণাভ। অরুণাভ মিত্র। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'

সুমিত্রা এবার লজ্জা পেল। কিভাবে কথাটা বোঝানো যায় সে তা ভেবে পেল না। তাই কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে কাটাল সে। তারপর বলল, মামার কাছে আমি আপনার নাম শুনেছি। সৌম্যেন্দু-বাবু মামাকে আপনার কথা বলেছেন।' একটু থেমেই সে যোগ করল, 'আপনি বরং ভেতরে বসুন। মার সঙ্গে কথা বলবেন।'

সুমিত্রা পাখির মত হালকা পায়ে ভেতরে চলে গেল। তার মন তখন অকারণ আনন্দে ফুর ফুর করে উড়ছে।

সুপ্রিয়বাবুর বাড়িতে তখন অন্য কেউ নেই। সুপ্রিয়বাবুর স্ত্রী অনেক আগেই মারা গেছেন। সুপ্রিয়বাবুর একমাত্র ছেলে সঞ্জয় বছরখানেক হল ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেতে গেছে। এখনো তার পড়া শেষ হয়নি। পড়া শেষ করেও সে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে আসবে না। কিছুদিন বিদেশে চাকরি করবে। এই অবস্থায় সুপ্রিয়বাবুর সংসারের ওপর খুব একটা টান থাকার কথা নয়। তেমন টান নেইও। কোনোরকমে নিজের ব্যবসাটাকে চালিয়ে যান। নিজের ব্যবসা বাড়াবার তাঁর তেমন কোনো ইচ্ছে নেই। অবসর সময়ে বাড়িতেও বড় একটা থাকেন না। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। অনেক দিনের একজন কাজের লোক আছে সেই সব-কিছু দেখাশুনো করে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে-ও বাড়িতে ছিল না। কি একটা কাজে বাইরে বেরিয়েছিল। বাড়িতে তখন সুমিত্রা এবং তার মা ভিন্ন আর কেউ ছিল না। কাজেই অরুণাভকে বাইরের ঘরে বসবার ব্যবস্থা করতে হল সুমিত্রাকেই। কেবল বসানো না, চা-জল-খাবারের ব্যবস্থাও করল সে।

অরুণাভ এতটা আশা করেনি। সামান্য অপ্রস্তুত হল তাই।

সুমিত্রার মা মায়া এসে অরুণাভর সঙ্গে পরিচয় করলেন।

সৌম্যেন্দুর সঙ্গে তাদের কিভাবে পরিচয় হয় তা-ও খুলে বললেন। এবং সুপ্রিয়বাবুই যে সৌম্যেন্দুর প্রতাপগড়ের চাকরির ব্যবস্থা করেছেন সেটা বলতেও ভুললেন না। সব শুনে অরুণাভ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলল, 'সৌম্যেন্দুর ভাগ্য বলতে হবে। এইরকম অবস্থায় আপনাদের দেখা পেয়েছিল।' একটু থেমে কতকটা স্বগতোক্তির মতো বলেছিল, 'এইরকম মহৎ মানুষজন সংসারে আজো আছে বলেই হয়তো সংসারের সবকিছু এখনো ঠিকঠাক চলছে।'

সুমিত্রার মা এই কথার কোনো প্রতিবাদ না করে সামান্য হেসে পরক্ষণেই বললেন, 'আমরা কিন্তু ওর নাম অরুণাভ জানতাম।'

অরুণাভ এই কথায় অবাক হয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

সুমিত্রাই ব্যাপারটা খুলে বলল।

সব শুনে অরুণাভর মুখটা বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'সৌম্যেন্দু আমাকে খুবই ভালোবাসে। ওইরকম অসুস্থ অবস্থাতেও তাই আমার নামটাই মনে পড়েছে। অন্য কিছু বলতে পারেনি। কেবল আমার নামটাই উচ্চারণ করেছে। সত্যি এরকম একজন প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে এতদিন দেখা নেই।

'আর দুঃখের কি? এবার তো পাবেন।' ফস করে সুমিত্রার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা।

সুমিত্রার কথা শুনে তাকে আবার পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল অরুণাভ। দেখে তার মুখটা আবার অকারণেই রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। সে কেমন অপ্রস্তুত হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। এবং তার সেই অপ্রস্তুত ভাব, মুখের রক্তিমাভা কোনো কিছুই দৃষ্টির আড়াল হয়নি সুমিত্রা বা সুমিত্রার মার।

সুমিত্রার মা এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অরুণাভকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করল। তার পরিবারের সব কিছু। সব শুনে অরুণাভকে আপন করে পাবার ইচ্ছেটা বেশ জোরদার হয়ে উঠল তার। মনে মনে ঈশ্বরকে বললেন, 'ঠাকুর এই রকম একটা ছেলেকে যখন একেবারে বাড়ির দরজায় এনে দিয়েছো, তখন তাকে যেন আর

হাতছাড়া কোরো না। বাড়ির দরজা থেকে ফিরিয়ে দিও না।'

মুখে বললেন, 'আমরাও তো কলকাতায় থাকি। এবার থেকে নিশ্চয় প্রায়ই দেখা হবে।'

অরুণাভ উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই হবে। যখন বলবেন, তখনই যাব। আমার বাড়িতেও আপনারা যখন খুশি চলে আসবেন। তবে আপনাদের তো আগেই বললাম, আমাদের সেই পুরোনো বিশাল বাড়িটা আর নেই। মিত্তিরবাড়ি বলে সবাই যে প্রাসাদকে জানতো সেটা এখন মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের হাতে। অবিশ্যি তার যথাযোগ্য মূল্য তারা দিয়েছে। কাজেই আপনাদের যেতে হবে মৌলালীর সেই ছোট্ট বাড়িটাতে।'

সুমিত্রার মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সেই ভালো বাবা। আমাদের পক্ষে ছোট্ট বাড়িই ভালো। প্রাসাদ হলে কি যেতে সাহস পেতাম।'

ওদের কথার মধ্যে এসে পড়েছিলেন সুপ্রিয়বাবু। বাইরের ঘরে নতুন মানুষটিকে বসে থাকতে দেখেই তার কেমন মনে হয়েছিল, এই মানুষটি অরুণাভ মিত্র না হয়েই যায় না। তার মন যে সত্যি কথাই বলেছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

সুপ্রিয়বাবু প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি সৌম্যেন্দুর চিঠি পেয়েই আসছেন?'

—চিঠি? না-তো। সৌম্যেন্দু আমাকে চিঠি লিখেছে নাকি? ওতো দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই রাখে না। এমনকি আশ্রমের ঠিকানায় কয়েকবার চিঠি দিয়েছি তারও উত্তর দেয়নি। কবে চিঠি দিয়েছে?

—আমি কিছুক্ষণ আগে সৌম্যেন্দুর চিঠি পেয়েছি। দোকানের ঠিকানায়। তাতেই দেখলাম, আপনাকে চিঠি লিখেছে। চিঠি লেখার অবিশ্যি একটা বিশেষ কারণ আছে।

অরুণাভ, সুমিত্রা এবং সুমিত্রার মা চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল। কিন্তু ওরা কেউ মুখে কিছু বলল না।

সুপ্রিয়বাবু নিজেই বললেন, 'সৌম্যেন্দু যে-কোম্পানীতে কাজ করে তার মালিকের স্ত্রী মিসেস জনসন কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মিঃ জনসন কোম্পানী বিক্রী করে আমেরিকায় ছেলের কাছে চলে যেতে চাইছেন। সেই জন্যেই আপনাকে—।'

—এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?—অরুণাভ কথাটা না বলে পারল না।

—হ্যাঁ আছে। আপনারা কোম্পানীটা কিনে নিতে পারেন। সৌম্যেন্দুর ধারণা, সাহেব খুব বেশী দাম নেবে না।

একটু থেমে সুপ্রিয়বাবু বললেন, 'জনসন সাহেব সৌম্যেন্দুকে খুবই স্নেহ করেন। উনি চাইছেন, সৌম্যেন্দুর কোনো পরিচিত লোক কোম্পানীটা কিনুক যাতে সৌম্যেন্দুর চাকরির ক্ষেত্রে ভালো হয়।'

অরুণাভ সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। তবে মনে মনে বলল, এ-ও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। সে যখন ব্যবসার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে, তখনই এলো এমন একটি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। সে কেবল বলল, 'সৌম্যেন্দুর সঙ্গে এই ব্যাপারে আগে কথা বলা দরকার। আমার ক্যাপাসিটিতে কুলোবে কিনা সেটা তো আগে বুঝতে হবে।'

সুপ্রিয়বাবু শান্তভাবে বললেন, 'কেবল নিজের ক্যাপাসিটির কথা ভাবলে চলবে না। ব্যবসার অবস্থা কেমন আছে সেটাও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। সবদিক না দেখে কোনো বড় কাজে কি হাত দেওয়া চলে? চলে না।'

সুপ্রিয়বাবুর কথাটা খুব ভালো লাগল অরুণাভর। ভদ্রলোককে খুবই অন্তরঙ্গ মনে হল তার।

অরুণাভকে সেইদিনই প্রতাপগড়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন সুপ্রিয়বাবু।

দীর্ঘদিন পর দুই বন্ধুর মিলন হল। উচ্ছ্বসিত আবেগে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল প্রথম দর্শনে। আবেগ প্রশমিত হবার পর অরুণাভ প্রথম তার নিজের অবস্থার কথা বলল। মা-বাবার মৃত্যু,

বাড়ি বিক্রী কোনো কথাই বাদ দিল না।

অরুণাভর অনেক কথার উত্তরে সৌম্যেন্দু সহাস্যে বলল, 'আমি এখন ভালোই আছি। আপাতত সন্ন্যাস নেবার ভাবনা মাথা থেকে চলে গেছে। তুই যদি এই কোম্পানীটা কিনে নিস তাহলে মনে হয়, এই ভাবনা আর কোনোদিন আসবে না। তবে কলকাতায় যাবার কথা কোনোদিন বলিস না। কলকাতায় যাবার কথা মনে হলেই সংসার সম্বন্ধে আমার মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। কলকাতা আমার কাছে বিভীষিকার মতো।'

সৌম্যেন্দুর কথায় অরুণাভ হেসে বলল, 'ঠিক আছে তোকে কলকাতায় যেতে হবে না। আমার যদি ক্ষমতায় কুলোয় তাহলে আমিই বরং এই কোম্পানীটাকে কিনে কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে এখানে চলে আসব। চল্ তাহলে তোর সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখি।'

জনসন সাহেব অরুণাভর সঙ্গে কথা বলে খুশি হলেন। সাহেব কিছু বলার আগে অরুণাভই প্রথমে বলল, 'স্যার সৌম্যেন্দু কেবল আমার বন্ধুই না, সে আমার ভাই-এর মতন। কাজেই আমি যদি কোম্পানীটা নিতে পারি তাহলে সৌম্যেন্দুকে দেব টুয়েন্টিফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার। তাছাড়া উইথ স্যালারি একটা বড় পোষ্ট তো থাকবেই।'

সাহেব অরুণাভর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আমি তোমার কথায় খুব খুশি হয়েছি মিত্র। এবার বলো তুমি কত দিতে পারবে? তুমি তো বিজনেস-এর পজিসন সবই দেখেছো।'

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সবই দেখেছি। খুবই সাউণ্ড পজিসন। আপনি কত অফার দিচ্ছেন বলুন।

—এর বাজার দর এখন আড়াই লাখ টাকা। তবে তোমার জন্যে দেড় লাখ। আমার বাংলোসহ। এবার ভেবে ছাখো।

অরুণাভ এত কম দাম আশাই করেনি। তার ধারণা ছিল, লাখ তিনেক দাম চাইবে সাহেব। অথচ হাতে তার অত টাকা

নেই। বড় জোর দু-এর কাছাকাছি হতে পারে। তাই সে চিন্তিত ছিল। কিন্তু সাহেবের কথায় সে হাতে চাঁদ পেল। এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

টাকাপয়সা লেনদেনের ব্যবস্থা এবং কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রেজিষ্ট্রী করতে করতে প্রায় মাসখানেক সময় লেগে গেল। মাস-খানেক পর এ্যাপোলো ট্রেডিং কোম্পানীর নতুন মালিক হল অরুণাভ মিত্র। আর পঁচিশ শতাংশের অধিকারী সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। কেবল তাই না। এ্যাপোলো কোম্পানীর ম্যানেজারও হল সৌম্যেন্দু।

অরুণাভ কলকাতার মৌলালীর বাড়িটা বিক্রী করল না। সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে তালা দিয়ে চলে এলো প্রতাপগড়। কোম্পানীর রথের চাকা আবার নতুন উদ্যমে ঘুরতে লাগল। অরুণাভ এবং সৌম্যেন্দু মনের আনন্দে সেই রথের সারথী হল।

এদিকে অরুণাভর বাড়বাড়ন্ত অবস্থার কথা শুনে সুপ্রিয়বাবুর বোন মায়াদেবী মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি সুপ্রিয়বাবুকে বার বার চিঠিতে বলতে লাগলেন, 'এখনো সময় আছে দাদা। অরুণাভর যখন আরো পয়সা হবে তখন সুমিত্রার সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করতেই পারবে না। আমি যতদূর জানি সুমিত্রার অরুণাভকে ভালো লেগেছে। অরুণাভর চোখ দেখেও মনে হয়েছে সুমিত্রাকে ওর মনে ধরেছে। কাজেই ব্যাপারটা আর ফেলে রাখা ঠিক নয়। তুমি ওকে প্রস্তাব দাও।'

সুপ্রিয়বাবুকে কিন্তু উদ্যোগী হয়ে প্রস্তাব দিতে হল না। প্রস্তাবটা এল অরুণাভর কাছ থেকেই। সরাসরি সুমিত্রার কাছে।

কিন্তু অরুণাভর সেই সরাসরি প্রস্তাবের কথা বলার আগে সৌম্যেন্দুর প্রসঙ্গে আর একটু বলা প্রয়োজন।

প্রতাপগড়ের এক সন্ধ্যে। অরুণাভ এবং সৌম্যেন্দু মুখোমুখি বসে গল্প করছিল। ঠিক গল্প নয়। পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ এবং সেই সঙ্গে আগামী দিনের পরিকল্পনা।

কথায় কথায় অরুণাভকে সৌম্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তুই বিয়ে করার কথা কিছু ভেবেছিস?'

কিছু ভেবেছিস মানে?

মানে, কতদিনের মধ্যে বিয়ে করবি বলে ঠিক করেছিস?

অরুণাভ হেসে বলল, 'ত্থাখ, এটা আমার কোনো প্রবলেম না। আমি আজ বললে কালই বিয়ে করতে পারি। বিয়ের ব্যাপারটাকে আমি কোনোদিনই একটা বড় রকমের সমস্যা বলে মনে করিনি। এটা তোর কাছেই চিরকালের সমস্যা। বিয়ের নামে বরাবরই তুই নাক সিঁটকেছিস। তোর ধারণা বৌ মানেই তোর বৌদিদের মতো। কুটিল। ঝগড়াটে। ইত্যাদি।'

একটু থেমে হাসতে হাসতে যোগ করল, 'আমার তো মনে হয়, বিয়ের ভয়েই তুই সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলি। তা সে ব্যাপারটা তো মিটে গেছে। তুই এখন তোর নিজের বিয়ের ব্যাপারে কি ভাবছিস?'

সৌম্যেন্দু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'বন্ধু ক্রমশ প্রকাশ্য। তবে একটুখানি শুনে রাখো, আমি অজন্তা-ইলোরার এক জীবন্ত মূর্তিকে বিয়ে করছি।'

অরুণাভ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কে সে?'

সৌম্যেন্দু একই ভঙ্গিতে রহস্যময় হাসি হেসে বলল, 'ওই যে বললাম, ক্রমশ প্রকাশ্য।'

—তা অজন্তা-ইলোরার জীবন্ত মূর্তিটি কি বলে?

—কিছুই বলে না। তার মনের খবর জানি না বলে তাকে এখনো কিছুই বলা হয়নি।

অরুণাভ এবার শব্দ করে হেসে বলল, 'তার মানে তুই মনে মনে স্বপ্নের জাল বুনছিস। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এসব স্বপ্ন দেখা ছাড়তো। বি প্র্যাকটিক্যাল। বিয়ের ইচ্ছে যখন হয়েছে তখন আর দেরী করিস না। দুজনে মিলে একটা ভালো মেয়ে-টেয়ে দেখি। তারপর একটা দিনক্ষণ দেখে ঝুলে পড়।'

কথাটা মনে ধরল না সৌম্যেন্দুর। সে বলল, 'আমার কথা পরে হবে। আগে তোর তো বিয়ে হোক। তুই তো আমার চেয়ে দু'মাসের বড়। তোর বিয়ে না হলে আমার বিয়ে হয় কি করে?'

এই কথায় হো-হো করে হেসে উঠল অরুণাভ। সেই হাসিতে যোগ দিল সৌম্যেন্দুও।

এর সপ্তাহখানেক পর অরুণাভ রওনা হল কলকাতায়। মৌলালীর বাড়িটার তদারকি করার জন্যে। অবিশ্যি মনে মনে সুমিত্রার সঙ্গে একবার দেখা করার ইচ্ছেও যে ছিল না তা নয়। তবে সেই ইচ্ছেটা তেমন প্রবল ছিল না। ক্ষীণই বলা যেতে পারে।

কিন্তু কলকাতায় দু'দিন থাকার পরই সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেটা তার প্রবল হয়ে উঠল। সুমিত্রাদের ঠিকানা তার অজানা নয়। মৌলালী থেকে যাদবপুরের পথও তেমন কিছু দূরের নয়। অরুণাভ একদিন যাদবপুরের দিকে রওনা হল।

অরুণাভকে হঠাৎ আসতে দেখে মায়াদেবী এবং সুমিত্রা দুজনেই খুব অবাক হল। তবে যতটা অবাক হল তার চেয়ে খুশি হল অনেক বেশী। খুশির আলোটা তাদের চোখেমুখে প্রকাশও হয়ে পড়ল।

অরুণাভ সেদিন সুমিত্রাদের বাড়িতে বেশীক্ষণ বসল না। চা খেয়ে মামুলি দু'চারটে কথা বলেই উঠে পড়ল। কিন্তু দুদিন পর আবার গেল সুমিত্রাদের বাড়ি। তারপর দিন আবার। এমনি করে সে প্রত্যেকদিনই আসতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় সুমিত্রাকে সে বলল, 'আমি কেন তোমাদের এখানে আসি তা কি বুঝতে পারো?' 'আপনি' নয় সোজাসুজি তুমি করেই সম্বোধন করল সে। উত্তরে সুমিত্রা অস্ফুট স্বরে বলল, 'পারি।' একটু থেমে চোখ নত করে বলল, 'আমার ইচ্ছেটাও কি তুমি সেদিন লক্ষ্য করোনি? যেদিন তুমি প্রথম এলাহাবাদের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলে?'

এর পর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। কোনো কথা ছিলও না আর। দুজন দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে ছিল অনেকক্ষণ।

বাড়ি ফিরে এসে অরুণাভ ডায়েরীতে লিখল, 'ভাবতে সত্যিই ভালো লাগছে। এতদিন একাই কেবল সুমিত্রার কথা ভাবিনি। সুমিত্রাও একান্তে আমার কথাই ভেবেছে। সুমিত্রার অভিমত জানার পর আজ জীবনটাকে অন্যরকম মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি পৃথিবীতে সবকিছু করতে পারি। সব কিছু করার শক্তি আমার আছে। ভালোবাসার শক্তি যে কত প্রবল আগে তা কখনো অনুভব করিনি। আজ তা করছি। আমার রক্তের প্রতি কণিকায় সে অনুভূতি।

নিজের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে অরুণাভ প্রতাপগড়ে ফিরে গেল। ফিরে গিয়েই সৌম্যেন্দুকে বলল, 'সৌম্যেন্দু, তুই যখন বিয়ে করবি বলেই ঠিক করেছিস, তখন আমি তোর বিয়েতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারি না। তাই কলকাতায় আমার বিয়ে স্থির করে এলাম।'

অরুণাভর কথায় সৌম্যেন্দু অবাক হল খুব। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অরুণাভর দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'একেবারে ঠিক করে এলি ? আমাকে কিছুই জানালি না ?'

একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'মেয়েটি দেখতে কেমন ? বাড়িতে কে কে আছেন ?'

অরুণাভ সৌম্যেন্দুর সেদিনের ভঙ্গিটা অনুকরণ করে রহস্যময়-ভাবে হেসে বলল, 'বন্ধু, ক্রমশ প্রকাশ্য।'

ক'দিন পরেই সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ল সৌম্যেন্দুর কাছে।

অরুণাভর কাছে সুপ্রিয়বাবুর একটা চিঠি এলো। তাতে বিয়ের তারিখ এবং দিনক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, বিয়েটা কলকাতায় হবে না, হবে এলাহাবাদেই।

চিঠিটা অরুণাভ একাই পড়ল না। সৌম্যেন্দুও পড়ল। পড়ার পর সৌম্যেন্দু চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না। ব্যাপারটা তার কাছে এমনই আকস্মিক ছিল

যে, সামান্য সময়ের জন্য সে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

সৌম্যেন্দুর বিভ্রান্ত ভাবটা অরুণাভর দৃষ্টি এড়াল না। সে বন্ধুর মুখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই বিয়েতে কি তোর আপত্তি আছে?'

সৌম্যেন্দু একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বলল, 'কেন, আমার আপত্তি থাকবে কেন?'

'সুপ্রিয়বাবুর চিঠিটা পড়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লি?' বলল অরুণাভ।

সৌম্যেন্দু কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে বলল, 'এ-কথার কোনো মানেই হয় না। তোর এই বিয়েতে আমার আপত্তি করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুপ্রিয়বাবু তো খোলাখুলিভাবেই সব কিছু লিখেছেন। তাঁর চিঠিতে মোদ্দা ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, তার অর্থ হল, এক ভদ্রমহিলা তোকে বিয়ে করতে চায় এবং তুইও সেই ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। এদিকে ভদ্রমহিলার গার্জিয়ানরাও তোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার জন্য খুবই ব্যস্ত। এই রকম একটা অবস্থায় আমার মত বা অমতের কোনো প্রশ্ন ওঠে কি?'

সৌম্যেন্দু উচ্ছ্বসিত হবার চেষ্টা করল।

অরুণাভ চোখ সূক্ষ্ম করে সৌম্যেন্দুকে দেখল। তারপর মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, 'কথাটা ঠিক। তবু তোর মনের কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। নইলে তোর কথাবার্তা এমন বেসুরো হত না।'

সৌম্যেন্দু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, 'আচ্ছা এই বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামত নিয়ে এখন এত ক্ষেপে উঠেছিস কেন বল তো? বিয়ের প্রস্তাব দেবার সময় আমার মতামত তো চাসনি?'

উত্তরে অরুণাভ কি বলতে যাচ্ছিল। সৌম্যেন্দু তাতে বাধা দিয়ে বলল, 'কিছু মনে করিস না। একটা কথা বলছি। বিয়ের প্রস্তাব দেবার পর সেকেণ্ড থটে তোর মনে কোনোরকম দ্বিধা আসেনি তো?'

'দ্বিধা? দ্বিধা কেন?' প্রশ্ন করল অরুণাভ।

সৌম্যেন্দু রহস্যজনকভাবে হেসে বলল, 'একজন নাচিয়ে মেয়েকে বিয়ে করার ব্যাপারে দ্বিধা আসতেই পারে, বিয়ের আগে অনেক কিছু ভাববার প্রয়োজন থাকে।'

অরুণাভ এবার সত্যি সত্যি বিরক্ত হল। বিরক্তিটা তার চোখে-মুখে প্রকাশ করেই সে বলল, 'তোর এই সব কথার একটাই মানে হয়। তা হল, বিয়ের ব্যাপারে তুই একজন মানসিক রুগী। ম্যারেজ-ফোবিয়া তোর মনের মধ্যে সব সময় কাজ করে।'

একটু থেমে অরুণাভ আবার বলল, 'বিয়েটা নিয়ে তুই যে কেন এত চিন্তিত তা বুঝতে পারি না। আসলে বিয়েটা জীবনের আর পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিষের মতোই একটা সাধারণ ব্যাপার। বাড়াবাড়ি করে দেখতে গেলেই মুশকিল বাধে। তুইও এই ব্যাপারটাকে নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছিস।'

অরুণাভর কথায় সৌম্যেন্দু হাসল কেবল। কোনো উত্তর দিল না।

## ॥ দুই ॥

অরুণাভর বিয়ের দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল সৌম্যেন্দু কিন্তু ততই সহজ হয়ে উঠল। অরুণাভ-সুমিত্রার বিয়েকে কেন্দ্র করে সৌম্যেন্দুর মনের আকাশে যে-কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তা যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। ক্রমশঃ সপ্রতিভ হয়ে উঠল সে। বিয়ের ব্যাপারে কাজকর্ম, কেনাকাটার সমস্ত দায়-দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। একজন একনিষ্ঠ বন্ধু বলতে কি বোঝায় সৌম্যেন্দুকে দেখে সবাই যেন তা অনুভব করল।

অরুণাভ-সুমিত্রার বিয়েতে যতটা ধুমধাম হবার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশিই করল সৌম্যেন্দু। জেদ ধরে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করল সে।

বিয়ের উৎসবে সুপ্রিয়বাবুর যতটা আনন্দ হবার কথা ছিল ততটা

হল না। কারণ, অনেক চিঠি লেখালেখির পরেও সুপ্রিয়বাবুর ছেলে সঞ্জয় লণ্ডন থেকে এল না। এমন কি সুমিত্রার নিজের লেখা চিঠি পেয়েও না।

চিঠিতে সুমিত্রা লিখেছিল, 'সনজুদা, বিয়ে মানুষের জীবনে বার বার আসে না। বার বার আসা কাম্যও না। তাই আমার অনুরোধ, তুমি অতি অবশ্যই আমার বিয়েতে আসবে। বলা তো যায় না, এই বিয়েতে না এলে পরে হয়তো তোমাকে অনুতাপ করতে হতে পারে।'

সুমিত্রা কেন যে এমন একটা কথা লিখেছিল তা' সে নিজেও জানত না। তাকে দিয়ে কেউ যেন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিল।

কিন্তু সুমিত্রার চিঠি পেয়েও সঞ্জয় এলো না। ফলে সুমিত্রার মনের মধ্যে রাগ-দুঃখ-অভিমান-ক্ষোভ সব একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল। সে মনে মনে স্থির করল, সঞ্জয়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্কই রাখবে না।

সঞ্জয়ের তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় নেই। সে তখন লণ্ডনে বসে নিজের কেরিয়ার তৈরি করতে ব্যস্ত। বিদেশে এক নামী ইঞ্জিনীয়ার হওয়াই তখন তার একমাত্র স্বপ্ন। বাবা পিসী পিসতুতো বোন এসব নিয়ে ভাববার মতো তার তখন অবসর নেই।

অরুণাভ-সুমিত্রার বিয়েটাকে বাহ্যত খুবই সহজভাবে গ্রহণ করল সৌম্যেন্দু। সে মুখে বার বার বলতে লাগল, এমন স্বামী-স্ত্রীর জুটি সচরাচর দেখা যায় না। যেন ঈশ্বর স্বয়ং এই জুটি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোনো বিশেষ ইচ্ছে পূরণের জন্যেই এই সৃষ্টি। সৌম্যেন্দু অবিশ্যি মনে মনে জানতো, অরুণাভ ধনী বলেই সুমিত্রা তাকে বিয়ে করেছে। এবং তার এই বিয়ের উদ্দেশ্য হল, তার নৃত্যের জগতটাকে আরো বিস্তৃত করা। একজন অর্থবান স্বামীর সাহায্য না পেলে নৃত্যের মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করতে পারা কষ্টসাধ্য। তাই এই বিবাহ। ভালোবাসা নয়, নৃত্যে ভারত জোড়া খ্যাতির আকর্ষণই সুমিত্রাকে এই বিয়েতে প্ররোচিত করেছে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরকম দেখা গেল। সৌম্যেন্দুর ধারণার সঙ্গে তা মিলল না।

বিয়ের ঠিক তিন মাস পর সুমিত্রা সকলের সামনেই বলল, এবার থেকে সে আর নাচবে না, চিরদিনের জন্য নাচ ছেড়ে দেবে। এবার থেকে সে পুরোপুরি সংসারী হবে।

সুমিত্রার এমন একটা কথায় খুবই অবাক হল সৌম্যেন্দু। সে বুঝল, সুমিত্রাকে সে যা মনে করেছিল তা সে নয়। আত্মপ্রচারের জন্য ধনী অরুণাভকে সে বিয়ে করেনি। অরুণাভকে বিয়ে করেছে ভালোবাসার টানেই। সুমিত্রা সম্বন্ধে সৌম্যেন্দুর মনে শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম দেখা দিল।

বিয়ের পর প্রতাপগড়ের বাড়িতে পা দিয়েই সৌম্যেন্দুকে অরুণাভ বলল, 'আমি যেমন ওকে সুমি বলে ডাকছি, তুইও তেমনি ডাকতে পারিস। অবিশ্যি সুমির যদি এই ডাকে আপত্তি না থাকে।'

সৌম্যেন্দু উত্তর না দিয়ে সুমিত্রার দিকে তাকাল।

সুমিত্রা মিষ্টি হেসে সৌম্যেন্দুর দিকে একবার তাকিয়েই অরুণাভর চোখে চোখ রাখল। তারপর বলল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরপো আমাকে যে-নামে ডাকবে আমি তাতেই খুশি। ওর জন্যেই তো আমি তোমাকে পেয়েছি।'

একটু থেমে সৌম্যেন্দুর মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে সে যোগ করল, 'প্রয়াগে সন্ন্যাসী-ঠাকুরপোকে দেখতে না পেলে আমাদের কি বিয়ে হত? আমাদের যোগাযোগই ঘটত না। সন্ন্যাসী-ঠাকুরপোর কাছে আমার, মানে আমাদের অনেক ঋণ!'

সৌম্যেন্দুর মুখে কোনো কথা জোগাল না। সে মুগ্ধ চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। এই মুহূর্তে সুমিত্রাকে অজন্তা-ইলোরার কোনো জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে তার মনে হল না। বরং মনে হল, যেন একরাশ রূপ নিয়ে সদ্য ফোটা একটি পদ্মফুল। অনাবিল, অনাঘ্রাত। যে কেবল আপনার আনন্দে আপনিই বিভোর নয়। আপনার আনন্দ অপরকে বিলিয়ে দিতে আগ্রহীও।

সৌম্যেন্দু সুমিত্রাকে নতুন করে চিনল। সুমিত্রার মুখের আবরণ তার সামনে নতুন করে উন্মোচিত হল। সুমিত্রা সম্বন্ধে তার আগ্রহ কমল না। বরং আরো বাড়ল।

'সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো।' সম্বোধনটাও তার কাছে নতুন মাধুর্য বহন করে আনল। তার মনে হল এর চেয়ে সুন্দর সম্বোধন আর হতে পারত না।

সৌম্যেন্দু একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে অরুণাভকে বলল, 'অরু সেদিন আগুন ছুঁয়ে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোর তা মনে আছে?'

অরুণাভ টান টান চোখে তাকিয়ে বলল, 'মনে আছে মানে? সেদিন বেনারস-এলাহাবাদ ছোটাছুটি করেছিলাম কেন? মনে ছিল বলেই তো।'

সৌম্যেন্দু লাজুক চোখে হাসল। তারপর সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল, 'সেই প্রতিজ্ঞাকে মানতে গেলে তুই আমার দাদা হোস না? আর দাদার স্ত্রীকে কেউ নাম ধরে ডাকে?'

সৌম্যেন্দুর কথায় অরুণাভ শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'এদিকটা আমি ভাবিনি।' একটু থেমে যোগ করল, 'তাহলে বৌদি বলেই ডাকিস।'

সৌম্যেন্দুর মুখে বিষণ্ণতার ছায়া সামান্য সময়ের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে হাতের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'নাঃ, বৌদি না। বৌদি ডাকটার মধ্যে কলকাতার বিচ্ছিরি স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি বরং ডাকব মিতু বৌঠান বলে।'

'ইস্ কি মিষ্টি!' সুমিত্রার চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

অরুণাভ এবং সৌম্যেন্দু দুজনেই তাকিয়ে রইল সুমিত্রার দিকে। তাদের দুজনের চোখেই একইরকম মুগ্ধতা।

ওরা তিনজন হালকা পালকের মতো মন নিয়ে হাসি ঠাট্টা-গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে লাগল। আজ এখানে, কাল ওখানে।

এমনি করে কেটে গেল একটা বছর।

সেবার হঠাৎ ওরা বেড়াতে গেল শিলং-এ। সৌম্যেন্দুর যাওয়ার তেমন একটা ইচ্ছে ছিল না। টানা এক বছর ছুটোছুটি করতে করতে সে অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই সে আপত্তি করেছিল। কিন্তু সুমিত্রার জবরদস্তির কাছে তার আপত্তি টেকেনি। সে রাজী হতে বাধ্য হয়েছিল।

যাবার সময় জিনিষপত্তর বাঁধাছাদা করতে করতে সুমিত্রা বলল, 'বুঝলে সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো, এবারই তোমাকে আমি একা নিয়ে যাচ্ছি। এরপর থেকে তুমি জোড়ে যাবে। তোমাকে এভাবে আর একা থাকতে দেব না। তাছাড়া আমারো একজন সঙ্গী চাই।'

সৌম্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। সামান্য সময় চুপ করে রইল। তারপর ঠোঁটের ভাঁজে হাসি তুলে বলল, 'না, মিতু বৌঠান, বিয়ের কথা এখন ভাবতে পারছি না।'

সুমিত্রা মাথায় একটা দোলা দিয়ে বলল, 'ভাবতে পারছি না আবার কি? অত ভাবাভাবি করতে গেলে কোনো দিন বিয়ে হবে না।'

সৌম্যেন্দু এবার আর হাসল। সামান্য গাম্ভীর্য নিয়েই বলল, 'আসলে বিয়ের ব্যাপারে আমি কোনো রকম আগ্রহই অনুভব করি না। তবে এ কথা ঠিক, বিয়ে যদি করি, তোমাকেই মেয়ে খুঁজতে বলবো।'

সৌম্যেন্দুর কথার মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল যে, অরুণাভ বা সুমিত্রা কেউই আর কিছু বলতে পারল না। কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখে কোনো কথা জোগাল না। কেমন একটা অস্বস্তির মেঘ দুজনের মনের মধ্যেই জমা হয়ে রইল যেন।

শিলং-এ পা দিয়েই ওদের তিনজনের মন রোদে ঝলমল করে উঠল। শিলং-এর অপরূপ প্রাকৃতিক সম্ভার ওদের আবার খুব কাছাকাছি এনে দিল। আবার খুব সহজ হয়ে গেল।

তিনজনে হৈ-হৈ করে বেড়াল খুব। দর্শনীয় জায়গায় এক-এক বারের পরিবর্তে দু'বারও গেল।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বার এসেছিল এলিফ্যাণ্ট ফলস্-এ। অবিশ্যি অরুণাভ বা সৌম্যেন্দুর এখানে দ্বিতীয় বার আসবার ইচ্ছে ছিল না। সুমিত্রাই একরকম জোর করে নিয়ে এসেছিল।

এলিফ্যাণ্ট ফলস্-এ আসবার পথে সে বার বার বলতে লাগল, 'এই ঝর্ণার মধ্যে যেন নৃত্যের ব্যাঞ্জনা আছে। আমি সেদিন একেবারে নীচে দাঁড়িয়ে ঝর্ণার এই নৃত্য দেখেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, বার বার দেখলেও এই নাচ কখনো পুরোনো হবে না।'

অরুণাভ বা সৌম্যেন্দু এমন করে ঝর্ণাকে দেখেনি। তাই তাদের কেউই সুমিত্রার এই অনুভূতির স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারল না।

অরুণাভ তো এলিফ্যাণ্ট ফলস্-এর কাছে এসে বলেই ফেলল, 'তুমি আর সৌম্যেন নীচটা ঘুরে এসো, আমি বরং ওপরে বসছি।'

সুমিত্রা নির্দ্বিধায় বলল, 'ঠিক আছে, তুমি বোসো। আমি আর সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো ঘুরে আসি।'

কথাটা বলেই সুমিত্রা তরতর করে নীচে নামতে লাগল। সৌম্যেন্দুর সম্মতি বা অসম্মতির জন্য অপেক্ষাও করল না।

অগত্যা সৌম্যেন্দুকেও নামতে হল পেছনে পেছনে।

পথটা খুব একটা ভালো নয়। প্রথম দিকটা ভালো হলেও শেষের দিকটা বিপজ্জনক। বিশেষ করে ব্রিজের ওপারে। ব্রিজ বলতে একটা কাঠের সাঁকো।

সাঁকোর ওপারে পাথর এবং মাটি মেশানো ঢাল-পথ। পথটাও অত্যন্ত সরু। জায়গাটা স্যাঁতসেঁতে হওয়ায় পথটাও বেশ পিচ্ছিল। একটু অসাবধান হলেই বিপদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

সৌম্যেন্দু তাই সুমিত্রার পেছনে নামতে নামতে বলল, 'মিতু বৌঠান, অত তাড়াতাড়ি নেমো না। পথ ভালো না। বিপদ

হতে পারে।’

কিন্তু সেই কথা সুমিত্রার কানে ঠিকঠাক পৌঁছল না। ঝর্ণার জলধারার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সৌম্যেন্দুর কথা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

সুমিত্রা যেমন নামছিল তেমনি করেই নামতে লাগল। একই ভঙ্গিতে। তর তর করে। যেন এক ঝর্ণার সঙ্গে মিশতে যাচ্ছে আর এক ঝর্ণা। যেন এক নৃত্যশিল্পী দেখতে যাচ্ছে আর এক নৃত্য পটীয়সীর নৃত্য সুষমা।

সৌম্যেন্দু একদিকে যেমন আশঙ্কিত হল, অন্যদিকে তেমনি মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল এই নৃত্যশিল্পীর অবতরণ।

সৌম্যেন্দু যা আশঙ্কা করেছিল তা-ই হল। ঢাল পথে দ্রুত নামবার মুহূর্তে সুমিত্রার পা হড়কে গেল। একেবারে গড়িয়ে পড়ল না ঠিকই, তবে পায়ে চোট পেল খুব। বিশেষ করে ডান পায়ের এ্যাঙ্কেলে। একটা পাথরে হাত রেখে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পায়ে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ওই শীতেও তার কপালে ঘাম দেখা দিল। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ প্রকাশও পেল।

এই জায়গাটা এমন যে একেবারে ওপর থেকে. অর্থাৎ অরুণাভ যেখানে বসেছিল সেখান থেকে এখানকার কিছুই নজরে আসে না। জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দে এখানকার চিৎকারও অত ওপরে গিয়ে পৌঁছয় না। অতএব অরুণাভ কিছুই দেখতে পেল না। সুমিত্রা চিৎকার করলেও সে শুনতে পেত না।

সৌম্যেন্দু সুমিত্রার কাছাকাছি এসে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, ‘কি হল মিতু বৌঠান, পায়ে চোট লাগল?’

সুমিত্রা দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘খুব যন্ত্রণা! পায়ের হাড়-টাড় ভেঙে গেল কিনা বুঝতে পারছি না।’

সৌম্যেন্দু সাহস দেবার ভঙ্গিতে সামান্য হেসে বলল, ‘হাড় ভাঙবে

কেন ? এইটুকুতে কখনো হাড় ভাঙে ? হয়তো মচকে গেছে।'

কথা বলতে বলতে সে নীচের দিকে তাকাল। ফলস্-এর জল যেখানে স্পর্শ করেছে সেই দিকে। তারই অদূরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ট্যুরিষ্ট ফলস্-এর দৃশ্য দেখছে। তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেই সৌমোন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি নীচে নামতে পারবে বৌঠান ?'

সৌম্যেন্দুর এই প্রশ্নে একটু বিরক্তই হল সুমিত্রা। যন্ত্রণায় তার তখন চোখে জল আসার উপক্রম। সে কোনো রকমে চোখের জল সামলে কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'আরো নীচে নামার প্রশ্নই ওঠে না। ওপরে উঠব কি করে সেই কথাই ভাবছি।'

সৌম্যেন্দু সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, 'আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করবে ?'

সুমিত্রা এতটুকু দ্বিধা করল না। সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যেন্দুর কাঁধে হাত রেখে হাঁটবার চেষ্টা করল। কিন্তু কয়েক পা উঠেই দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'না, পারব না। তুমি বরং ওকে ডাকো। তোমরা দুজনে মিলে যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।'

সৌম্যেন্দু সামান্য একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমি একাই তোমাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারি। আমার তেমন কষ্ট হবে না। অবিশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

সুমিত্রা কতকটা অসহায়ভাবে বলল, 'আমার আপত্তি থাকবে কেন ? কিন্তু তুমি পারবে কিনা ভালো করে ভেবে ছাখো।'

সৌম্যেন্দু দ্বিতীয় বার ভাবল না। সে প্রায় তৎক্ষণাৎ সুমিত্রাকে পাঁজা করে কোলে তুলে নিল। অনায়াসেই।

সুমিত্রাকে কোলে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যেন্দুর সারা দেহে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। কোলে তোলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এ-রকম কোনো অনুভূতি তার শরীরের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সুমিত্রাকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল।

যে-অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে সৌম্যেন্দু এতদিন অতি     বুকের মধ্যে দমন করে রেখেছিল, যে ভয়ঙ্কর ইচ্ছেকে সে এতদিন কোনোভাবেই মাথা তুলতে দেয়নি, আজ এই অসতর্ক মুহূর্তে, বিপজ্জনক পরিবেশে, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ভয়ঙ্কর ইচ্ছেটাই যেন লেলিহান শিখা হয়ে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। প্রতি পদক্ষেপে মনে হতে লাগল, এইবার সে তার মানস পুত্তলিকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে নেবে।

একটু একটু করে সৌম্যেন্দুর হাতের চাপ সুমিত্রার দেহের ওপর চেপে বসতে লাগল। সুমিত্রা একসময় ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'অত জোরে চাপ দিও না। প্লিজ। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

সৌম্যেন্দু উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতো তখন তার সামর্থ্যও ছিল না। এমনিতেই একটা দেহের ভার বহন করে সে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছিল। তার ওপর প্রচণ্ড উত্তেজনা। ফলে তার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল।

সুমিত্রাকে কোলে নিয়ে সৌম্যেন্দু যখন ওপরে উঠে এলো, তখন ক্লান্তি-উত্তেজনায় তার শরীরের শক্তির শেষ বিন্দুটুকুও নিশ্চিহ্ন। সে সুমিত্রাকে নামিয়ে দিয়েই প্রায় অবসন্নের মতো একটা পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল।

অরুণাভ হতভম্ব। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তখন।

সুমিত্রাই সব গুছিয়ে বলল।

সব শুনে অরুণাভ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সৌম্যেন্দুকে বলল, 'এ-রকম বাহাদুরির কোনো মানে হয়? ওপরে উঠতে উঠতে তোর যদি কিছু একটা হয়ে যেত, তখন?'

সৌম্যেন্দু চোখ বুজে সামান্য হাসল কেবল। কোনো উত্তর দিল না।

তার মাথায় তখন কামনার আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের তাপ অন্য কেউ টের পেল না, সৌম্যেন্দু একাই কেবল ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল।

পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও সুমিত্রা গলায় কতকটা ঠাট্টা, কতকটা কৃতজ্ঞতার সুরের মিশেল দিয়ে বলল, 'আমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে তো ?'

সৌম্যেন্দু এই কথারও কোনো উত্তর দিল না। যদিও সে অনায়াসেই উত্তর দিতে পারত। কারণ, ততক্ষণে তার ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। সে কোনো উত্তর না দিয়ে মুখে অস্ফুট একটা শব্দ করল কেবল। সেই শব্দটা রাগ অথবা আনন্দের প্রকাশ তা ঠিক বোঝা গেল না।

সুমিত্রা হয়তো রাগের প্রকাশ বলেই মনে করল। তাই সে যোগ করল, 'রাগ কোরোনা সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো। বৌঠানকে তুলে এনে পুণ্যিই করেছো। এই পুণ্যির ফল জমা হয়ে রইল। ভবিষ্যতে কাজ দেবে। দেখে নিও।'

সৌম্যেন্দু এবার চোখ মেলে তাকাল সুমিত্রার মুখের দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সুমিত্রা। অদ্ভুত সেই দৃষ্টি। যেন শরীরের প্রচণ্ড তাপ চোখ দিয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি অরুণাভকে বলল, 'বুঝলে, সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো বোধহয় অসুস্থ বোধ করছে। শিগ্‌গির বাড়ি চলো। ওর রেষ্ট দরকার।'

সুমিত্রার কথা শেষ হতে না হতেই উঠে বসল সৌম্যেন্দু। নিজেকে সহজ করার জন্য শব্দ করেই হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আমার কিছুই হয়নি, বৌঠান। আমি দিব্যি আছি। রেষ্ট বলো, চিকিৎসা বলো, এখন সবই তোমার প্রয়োজন।'

বলতে বলতে সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। অরুণাভর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর দেরী করা উচিত নয়। এক্ষুণি ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। পা-এর এক্স-রে করতে হতে পারে।'

এক্স-রে করা হল। এক্স-রেতে ধরা পড়ল, পায়ের একটা হাড় ভেঙে গেছে। অতএব প্লাষ্টার।

প্রতাপগড়ে ফিরে আসার অল্পদিনের মধ্যেই সুমিত্রার পায়ের

ভাঙা হাড় জুড়ে গেল। আবার আগের মতোই স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে লাগল সে।

সুমিত্রা সুস্থ স্বাভাবিক হলেও সৌম্যেন্দু কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারল না। তার মাথার মধ্যে একটা আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল। তার আশঙ্কা হতে লাগল, যে কোনো মুহূর্তে একটা বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। একটা দাবানল গ্রাস করে ফেলতে পারে সব কিছু।

এদিকে অরুণাভর ব্যবসা একটু একটু করে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। ফলে দৈনন্দিন সময়েও টান ধরল তার।

ব্যবসার প্রয়োজনে অরুণাভ আজকাল কেবল প্রতাপগড়ে আটকে থাকতে পারে না! তাকে দিল্লী বম্বে করতে হয় প্রায়ই।

বাইরের অর্ডার সংগ্রহের ব্যাপার দেখে অরুণাভ, আর প্রোডাক-সনের দিকটা দেখে সৌম্যেন্দু।

অরুণাভ ধীরে ধীরে নাম এবং প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একটু একটু করে নাম ও প্রতিষ্ঠার মোহ তাকে পেয়ে বসল। ক্রমশঃ ব্যবসাই তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠল।

অরুণাভ এখন খুবই ব্যস্ত। তার এই ব্যস্ততার মধ্যে সুমিত্রার স্থান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। ফলে সুমিত্রা কেমন নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে লাগল।

অথচ এক বছর আগেও অরুণাভ এরকম ছিল না। ব্যবসা এবং প্রতিষ্ঠার জন্য এরকম পাগল হয়ে ওঠেনি সে। শিলং থেকে ফেরার কিছু দিনের মধ্যেই মানুষটা যেন কেমন বদলে গেছে। মাঝে মাঝে সুমিত্রার মনে হয়, এর জন্য সৌম্যেন্দুই অনেকাংশে দায়ী।

কথাটা হয়তো মিথ্যেও নয়। শিলং থেকে ফিরে সৌম্যেন্দুই একদিন অরুণাভকে বলেছিল, 'আমাদের এভাবে হাওয়া খেয়ে বেড়ানো অনুচিত হচ্ছে।' একটু থেমে যোগ করেছিল, 'আজকাল প্রায়ই মেসোমশাই-এর কথা মনে হয়। এই পাথরের ব্যবসা করতে গিয়েই তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। অরু, শেষ পর্যন্ত তোরও যদি

খারাপ কিছু হয়, তাহলে আমার আক্ষেপের শেষ থাকবে না। বলতে গেলে আমিই তো তোকে এই ব্যবসায় এনেছি।'

সৌম্যেন্দু একটু কাল চুপ করে থেকে আরো বলেছিল, 'যে কোনো জিনিষ গড়তে সময় লাগে, অরু। জীবন থেকে এই যে দিনগুলো হারিয়ে যাচ্ছে, এইসব দিন আর কি কখনো ফিরে আসবে? ব্যবসাকে বড় করার সময় এটাই। এই সময় চলে গেলে, পরে পস্তাতে হবে।'

সৌম্যেন্দুর এই কথার পর থেকেই অরুণাভ অন্যরকম মানুষ হয়েছিল। পুরোপুরি একজন কাজের মানুষ। একেবারে বদলে গিয়েছিল সে।

অরুণাভ অভ্যেসমতো তার ডায়েরীর পাতায় লিখেছিল, 'সৌম্যেন্দু আমার চোখ খুলে দিয়েছে। বিয়ের পর আমি যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছিলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম বাবার কষ্টের কথা। এখানকার ব্যবসা বড় করতে পারলে কলকাতার বাড়ি-ঘর আবার হয়তো কিনেও নিতে পারব। হয়তো কেন! নিশ্চয়ই পারব। বংশের ঐতিহ্য আমাকে ফিরে পেতেই হবে।'

সৌম্যেন্দু একটা পরিকল্পনা মতোই অরুণাভকে এই উপদেশ দিয়েছিল। অরুণাভর পরিবর্তনে সে তাই খুশি হয়েছিল খুব। কেবল খুশি হয়েই ক্ষান্ত হয়নি। মনে মনে ভবিষ্যৎ কর্মধারার একটা ছকও তৈরী করে ফেলেছিল।

শিলং-এ এলিফ্যাণ্ট ফলস্-এ সুমিত্রার ঘনিষ্ঠ স্পর্শ পাওয়ার পর থেকেই সৌম্যেন্দু যে ভেতরে ভেতরে একেবারে বদলে গিয়েছিল সুমিত্রা বা অরুণাভ কেউ-ই তা আঁচ করতে পারেনি। সৌম্যেন্দুর মাথায় তখন একটা ভাবনাই সারাক্ষণ ঘুরত। তা হল, সুমিত্রাকে নিজের করে পাওয়া। একান্ত করে পাওয়া। সেই জন্যেই সে ব্যবসা বাড়ানোর কথা বলে অরুণাভকে সুমিত্রার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। নিজে নির্বিকার থাকার ভাব করে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যার ফলে

সুমিত্রা নিঃসঙ্গতার শিকার হয়।

কার্যত হলও তা-ই। অরুণাভ ব্যবসার জন্য ছুটতে লাগল দিল্লী-বম্বে, আর সুমিত্রা ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সৌম্যেন্দু অরুণাভদের সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করে। থাকে একতলার একটা ঘরে। এই ব্যবস্থা তার নিজেরই। আগে কারণে-অকারণে ঘন ঘন ওপরে আসত। তিনজনে মিলে গল্প-গুজব করত। কিন্তু হালে সে ওপরে একেবারেই আসে না। আসলে সুমিত্রাকে সে এড়িয়েই চলে। এটিও তার পরিকল্পনা অনুসারে।

ব্যাপারটা সুমিত্রার চোখ এড়ায়নি। সে স্পষ্টই অনুভব করল সৌমোন্দু তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তাই সে একদিন সৌম্যেন্দুকে সোজাসুজি বলল, 'তোমার কি ব্যাপার বলো তো, সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো? আমাকে সব সময় এড়িয়ে চলতে চাও কেন? কি করেছি আমি?

—কই না তো! তোমাকে এড়িয়ে চলিনি কখনো। —উত্তর দিল সৌম্যেন্দু।

তার মধ্যে ধিকি-ধিকি জ্বলা আগুন হঠাৎ যেন শিখা মেলতে চাইল। সুমিত্রার দিকে চোখ তুলে তাকাতে কষ্ট হল তার। ভেতরে ভেতরে সে কাঁপতে থাকল। তার ভয় হতে লাগল, যে-কোনো মুহূর্তে সে সুমিত্রাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদরে-আদরে অ.স্থর করে তুলবে।

সৌম্যেন্দু বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত রাখল। সুমিত্রার বিশ্বাস অর্জনের জন্য মনে মনে আরো ক'টা দিন সময় নিতে চাইল সে।

সুমিত্রা নিজেই আবার বলল, 'তোমার বন্ধু বাড়ি না থাকলে একা একা কিভাবে যে আমার দিন কাটে! তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, তুমি কি বুঝবে মেয়েদের দুঃখ?'

সুমিত্রার কথায় সৌম্যেন্দুর বুকের মধ্যে কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই আগুন সুমিত্রা-অরুণাভর সুন্দর সংসারটাকে পুড়িয়ে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। সৌম্যেন্দু অনুভব করল, তার বুকের

এই আগুন কোনোদিন নিভবে না। এই আগুন নেভাতে সে চাইলও না। বরং ইচ্ছে করল, তার বুকের মধ্যে এই আগুন জ্বলুক, জ্বলতেই থাকুক। এবং এই অগ্নিস্পর্শে অরুণাভর সাজানো সংসার জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাক।

অরুণাভ সম্বন্ধে যে-ঈর্ষা, যে-ক্ষোভ এতদিন তার বুকের মধ্যে ছোট্ট বীজের আকারে ছিল আজ সেটাই যেন মহীরুহের রূপে দেখা দিল। বন্ধুর প্রতি প্রীতি-ভালোবাসার পরিবর্তে এক তীব্র ঘৃণা জমা হয়ে উঠল। তার বার বার মনে হতে লাগল, প্রয়াগতীর্থে যে অজন্তা-ইলোরার জীবন্ত মূর্তিকে তার ভালো লেগেছিল, যে নারী-মূর্তিকে স্বয়ং ঈশ্বর তার কাছে পাঠিয়েছিলেন, অরুণাভ অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে সৌম্যেন্দুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এক অর্থে তাকে সর্বস্বান্ত করেছে। তার চোখ থেকে জীবনের সব আলো শুষে নিয়েছে। সৌম্যেন্দুর মনের মধ্যে অরুণাভ সম্বন্ধে ক্ষোভ এবং ঈর্ষা প্রতিহিংসায় পরিণত হতে লাগল। সুমিত্রার দেহের প্রতি লোভ তাকে ভেতরে ভেতরে একেবারে অন্য মানুষ করে দিল। সুন্দর চেহারার আড়ালে একটা বীভৎস চেহারার মানুষ যেন আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু বাইরে কেউ তা টের পেল না।

সুমিত্রা যখন সৌম্যেন্দুর সঙ্গে কথা বলছিল তখনো ঠিক বিকেল হয়নি। তবে গাছের ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। সৌম্যেন্দুর বাইরের কাজ তখনো শেষ হয়নি। বাড়িতে কি একটা জিনিষ রাখতে এসেছিল। কুলি-কামিনদের কাজ তদারকি করবার জন্য আবার বাইরে যাবার কথা। এমন সময় সুমিত্রার এইসব কথা-বার্তায় সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য পাথর কাটাই চেরাই-এর সমস্ত কথা ভুলে গেল সে।

সৌম্যেন্দুকে চুপ করে থাকতে দেখে সুমিত্রা নিজেই আবার বলল, 'বাড়িতে বসে থাকতে বড্ড একঘেয়েমি লাগে। চলো না, ওই ওয়াচ-টাওয়ারে যাই। ওখান থেকে কুলি-কামিনদের কাজ দেখতে বেশ লাগবে।'

সুমিত্রার এই প্রস্তাবে সৌম্যেন্দু বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটাই শুরু হয়ে গেল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে ওয়াচ-টাওয়ারের নির্জন কক্ষে সুমিত্রাকে নিয়ে গিয়ে তার দেহটাকে নিজের দেহের সঙ্গে লেপ্টে নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে সুমিত্রার প্রস্তাবে রাজী হল না। সামান্য হেসে বলল, 'তা হয় না, মিতু বৌঠান। লোকে এটা খারাপভাবে নেবে। তাছাড়া অরু এখন বাড়ি নেই। কি দরকার এসব ঝামেলার?'

সুমিত্রার ভুরুতে টান ধরল। সে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'আসলে তোমার মেয়েদের ব্যাপারে বড্ড শুচি-বাই। মেয়েদের এড়িয়ে সন্ন্যাসীগিরি দেখাতে চাও। অতই যদি সন্ন্যাস-বাতিক তাহলে সত্যি সত্যি সন্ন্যাসী হলেই তো পারতে। প্রয়াগে এক ঝলক সেই মেয়েকে দেখে সন্ন্যাস ছেড়ে সংসারী হবার কথা ভাবলে কেন?'

সুমিত্রার কথায় চমকে উঠল সৌম্যেন্দু। সে ভাবতেই পারেনি এই ব্যাপারটা সুমিত্রার জানা সম্ভব। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সুমিত্রার চোখের দিকে। তার চোখে যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ পেতে লাগল। মুখে কোনো কথা জোগাল না।

সৌম্যেন্দুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভারি মজা পেল সুমিত্রা। মুখটিপে হাসল সে। হাসিমুখেই বলল, 'কি ধরা পড়ে গেলে তো সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো?'

সৌম্যেন্দু কেমন ব্যাকুলভাবে বলল, 'এ-কথা তুমি কি করে জানলে মিতু বৌঠান? আমি তো কাউকে এ-কথা বলিনি। তুমি কি মনের কথা পড়তে জানো?'

সুমিত্রা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, পড়তে জানি। তবে তোমার মনের কথা কেবল আমি একা পড়িনি। আমার মা এবং সুপ্রিয়মামাও তোমার মনের খবর জানে।'

—সত্যি?

সৌম্যেন্দুর চোখে এবার বিস্ময়ের পাশে ক্রোধ জমা হল। ক্রোধ এই জন্য যে, সৌম্যেন্দুর মনের খবর জেনেও সুপ্রিয়বাবু এবং সুমিত্রার

মা কি করে সুমিত্রার সঙ্গে অরুণাভর বিয়ের ব্যবস্থা করল? তার বুঝতে অসুবিধে হল না যে, এই ব্যবস্থার একটাই কারণ থাকতে পারে। এবং তা হল, অরুণাভর অর্থ-কৌলীন্য। সে কেবল অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'অরু কি এ-কথা জানে?' সৌম্যেন্দু বুঝতে চাইল, অরুণাভ এ-সব জেনেশুনেও সুমিত্রাকে বিয়ে করেছে কিনা।

সৌম্যেন্দুর প্রশ্নে সুমিত্রা কেমন কৌতুক অনুভব করল। সে কৌতুকের হাসি মুখে নিয়ে বলল, 'ন্-না। তোমার বন্ধু এখনো এসব জানে না। তবে আমার কথার অবাধ্য হলে তাকে সব বলে দেব।'

সৌম্যেন্দুর তখনকার মনের অবস্থায় সুমিত্রার এই হাল্কা কথায় কোনো মূল্যই নেই। তার সমস্ত চেতনা তখন সুমিত্রার দেহকে লেহন করছে। সেই সঙ্গে এক দানবীয় প্রতিহিংসায় তার সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে উঠেছে।

ভেতরের উত্তেজনা সে দমন করতে পারল না। তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষল। মনে মনে বলল, 'এবার থেকে দিন বদল শুরু হবে। অরুণাভ একাই ভোগ করবে না। এখন থেকে সৌম্যেন্দুও ভোগ করবে।'

সৌম্যেন্দুকে চুপ করে থাকতে দেখে সুমিত্রা শব্দ করে হেসে উঠল। তার রিনরিনে হাসির শব্দ চুর চুর হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

হাসির রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সুমিত্রা কৌতুকের সুরে বলে উঠল, 'সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো খুব লজ্জায় পড়লে তো? ঠিক আছে বাবা আমি তোমার বন্ধুকে কিছু বলব না।'

একটু থেমে কপট আদেশের সুরে বলল, 'এবার চলো। কিছুটা বেড়িয়ে আসি। বেড়াতে বেড়াতে ওয়াচ-টাওয়ারে যাই।'

সৌম্যেন্দু অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোমার অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার কাছে আমি অসহায়।'

সৌম্যেন্দুর এই আপাত নিরীহ কথাটাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করল সুমিত্রা। সে কৌতুকের সুরেই আবার বলল, 'এক

হিসেবে আমি তোমার মানব যে। আমার অবাধ্য হবে কি করে? কাজেই আমার অবাধ্য হবার চেষ্টা করবে না। বুঝলে সন্ন্যাসীজী?'

কথাটার মধ্যে কোনো ঝাঁজ-ই ছিল না। কিন্তু সুমিত্রার মুখে "মনিব" শব্দটা কেমন যেন খট করে লাগল সৌম্যেন্দুর কানে। মুহূর্তে ঈর্ষার আগুন দপ করে জ্বলে উঠল তার মাথার মধ্যে। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ না করে সামান্য হাসল কেবল।

সৌম্যেন্দু আর সুমিত্রা বেড়াতে বেড়াতে সামনের টিলাটার ওপরে উঠে এলো। যে টিলাটা তাদের কাছে ওয়াচ-টাওয়ার নামে পরিচিত। অবশ্য ওয়াচ-টাওয়ার বলতে ওরা কেবল টিলাটাকেই বোঝায় না। টিলাটার ওপরে দু-কামরার যে-বাংলোটা আছে ওয়াচ-টাওয়ার বলতে ওরা আসলে সেটাকেই বোঝায়।

বাংলোটা দেখতে খুবই সুন্দর। তার দেওয়ালের রঙ লাল। মাথার ওপরে টালির ছাদ। ছাদের রঙ সবুজ। বড় বড় কাঁচের জানালা। প্রত্যেকটা দরজা-জানালায় ভেতর থেকে ভারি লাল পর্দা ঝুলছে।

ঘরের পেছন দিককার জানালা দিয়ে অনেক দূরের দৃশ্য দেখা যায়। চাষের ক্ষেত, গ্রামের বাড়ি-ঘর, মাঠ-পুকুর সব কিছুই চোখে পড়ে।

বাংলোর পেছনে টিলার অংশ অত্যন্ত খাড়াই। এত খাড়াই যে এদিক দিয়ে কারো পক্ষেই উঠে আসা সম্ভব নয়। এর ঠিক নিচেই আবার বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো। এখানকার মাটিও পাথুরে। ফলে টিলার ওপর থেকে এদিকে কারো পতন মানেই নিশ্চিত মৃত্যু।

টিলার ওপরে বাংলোর সামনের খানিকটা অংশ বেশ ফাঁকা। ফাঁকা অংশের পরেই ছোট-বড় গাছের ঠাস বুনোট।

জনসন সাহেবের কাছ থেকে কোম্পানীটা কেনার পর সৌম্যেন্দু এবং অরুণাভ এই বাংলোতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মেরেছে। এখানে বসে জানালা দিয়ে কুলি-কামিনদের কাজ দেখতে দেখতে ভবিষ্যৎ কর্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও নিয়েছে।

তাছাড়া কোম্পানীটা কেনার পর সৌম্যেন্দুকে শেয়ার দেবার ব্যাপারে যে-লেখালেখি হয়েছিল তা-ও এই বাংলোতে বসেই। সেই হিসেবে সৌম্যেন্দুর কাছে এই বাংলোটার অন্য একটা অর্থ আছে। সে মনে করে, এই বাংলোটাই তার সৌভাগ্যের সূচক। এই বাংলোই তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দিয়েছে।

সুমিত্রারা যখন বাংলোর সামনের দিককার জানালায় এসে দাঁড়াল, তখন সূর্য অস্তগামী। গাছের মাথায় মাথায় সূর্যের লাল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। গাছ-গাছালির ঠাস-বুনোট ভেদ করে কিছুটা রক্তিমাভা চুঁইয়ে পড়েছে।

সুমিত্রা জানালার ওপর একটা হাত রেখে বাইরের রক্তিম শোভা দেখতে লাগল। তার চোখে যেন অপার বিস্ময়।

এদিকে সুমিত্রার পেছনে মাত্র হাত খানেক দূরে দাঁড়িয়ে সৌম্যেন্দু। তার চোখে ক্ষোভ। বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, দিনের আলো যেমন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, তার জীবনের সমস্ত রসও তেমনি দ্রুত শুকিয়ে যাবে। অনতি বিলম্বে তার জীবনটাও রসহীন একটা পাথরের মতো হয়ে যাবে।

সুমিত্রার পেছনে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে বলল, নাউ অর নেভার। যা কিছু করতে হবে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।

সৌম্যেন্দু সুমিত্রার দিকে দু'হাত বাড়াল। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড অস্থিরতা প্রকাশ পেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল সুমিত্রা। তার এই আচমকা হাসিতে সৌম্যেন্দু কেঁপে উঠল। তার প্রসারিত হাত দুটো স্থির হয়ে গেল।

সুমিত্রা সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেই বলল, 'দেখেছ, সন্ন্যাসী ঠাকুরপো, ওদের কাণ্ড দেখেছো?'

সুমিত্রার কথায় সৌম্যেন্দু এবার সচেতনভাবে বাইরের দিকে

তাকাল। সে দেখল, তুটি দেহাতী কিশোর-কিশোরী শুকনো কাঠ পাতা কুড়োবার জন্যে কখন টিলার ওপর উঠে এসেছে। ঝুড়ি বোঝাই কাঠ পাতা লক্ষ্য করে সৌম্যেন্দুর মনে হল, হয়তো অনেক আগেই তারা উঠে এসেছে সৌম্যেন্দুরা এতক্ষণ দেখতে পায়নি।

ওই কিশোর-কিশোরী তু'জন অদ্ভুত কাণ্ড করছিল। কিশোরটি হাঁটুমুড়ে ঘোড়ার মতো পিঠ পেতে বসেছিল। আর তার পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে কিশোরীটি একটা গাছের শুকনো ডাল ভাঙছিল। এই ব্যাপারটা নিয়ে তুজনের মধ্যেই কোনো বিকার ছিল না। যেন এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

দেহাতী ছেলেমেয়ে তুটোর এই কাণ্ড দেখে খুব মজা লেগেছিল সুমিত্রার। সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠেছিল। আর সেই হাসির দমকে কতকটা ভড়কে গিয়ে ছেলেটি হঠাৎ সোজা হয়ে বসেছিল। আর সে সোজা হয়ে বসতেই পিঠের ওপরের মেয়েটি তার হাতের শুকনো কাঠ নিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। এবং পরক্ষণেই দাঁড়িয়ে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলেছিল, 'তু হাসতি কিঁউ? তেরী লিয়ে ম্যায় গির পড়ি।'

ওর এই কথায় সুমিত্রা আরো একবার হেসে উঠেছিল।

অন্য সময় হলে এই ব্যাপারটায় সৌম্যেন্দুও হেসে ফেলত। কিন্তু এখন সে হাসতে পারল না। বরং তার প্রচণ্ড রাগ হল। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'তোরা এখানে কি করছিস? যা ভাগ। ভাগ এখান থেকে।'

সৌম্যেন্দুর বকুনিতে ওরা তু'জনেই সামান্য জড়সড় হয়ে পড়ল। ওদের জড়সড় ভাব দেখে সুমিত্রা ওদের ডেকে হাসিমুখেই বলল, 'তোদের কোনো ভয় নেই। তোরা তোদের ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে নে।'

কথাটা শেষ করেই ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সৌম্যেন্দুকে উদ্দেশ্য করে সে আবার বলল, 'ওরা কি আনন্দে আছে বলো তো? বেশী চাহিদা নেই। বেশী আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রকৃতির রাজ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যেন এক হয়ে গেছে। শান্তিময় জীবন।'

একটু থেমে সুমিত্রা সামান্য ভারি গলায় যোগ করল, 'তোমার বন্ধুর ওপর খুব রাগ হয়। কেবল টাকা আর বিজনেস। জীবনের মাধুর্যই বুঝল না মানুষটা।'

সৌম্যেন্দু হঠাৎ সুমিত্রার একটা হাত ধরে বলে উঠল, 'তোমার নিঃসঙ্গতা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু—।'

সৌম্যেন্দুর কথা শেষ হতে পারল না। সুমিত্রা তার আগেই হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'একি! একি করছো তুমি?'

সৌম্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করে অত্যন্ত নিরীহের মতো মুখ করে বলল, 'কি হল? তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

সৌম্যেন্দুর মুখের নিরীহ ভাবটা লক্ষ্য করে সুমিত্রা একটু যেন লজ্জাই পেল। সে তাড়াতাড়ি হেসে সহজভাবে বলল, 'নাঃ, কিছু না। এমনিই।'

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে সেই মেয়েটি তার নিজস্ব ভাষায় বলল, 'এই বিটিয়া, তুই খুব ভালো। কিন্তু তোর মরদটা ভালো না।'

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না-রে, এ লোক আমার মরদ না। আমার মরদ বাইরে গেছে। এই লোক আমার মরদের ভাই।'

এই কথায় ওরা কি বুঝল কে জানে। ওরা দুজনেই একসঙ্গে জোরে হেসে উঠল। কতকটা যেন অবিশ্বাসের হাসি তাদের গলায়।

সৌম্যেন্দু সামান্য হেসে বলল, 'ওদের ভুল ভাঙাতে পারবে না। মিছিমিছি প্রতিবাদ করতে যাওয়া। তাছাড়া এই ভুল বোঝায় কি-ই বা এসে যায়?'

সামান্য এই ভুল বোঝায় সত্যিই কিছু যায় আসে না। কিন্তু ভুল বোঝার ব্যাপারটাকেই হাতিয়ার করতে চাইল সৌম্যেন্দু। সে কৌশলে প্রচার করতে লাগল যে, সৌম্যেন্দুর সঙ্গে সুমিত্রার এক অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। ব্যাপারটা লোকের অবিশ্বাস

করারও কথা নয়। কারণ, সেদিনের পর থেকে সৌম্যেন্দু এবং সুমিত্রাকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে দেখা যেতে লাগল।

অল্প ক'দিন পর দিল্লী থেকে স্টোন সাপ্লাই-এর একটা মোটা কনট্রাক্ট নিয়ে ফিরে এলো অরুণাভ। সে খুশিতে একেবারে ডগমগ। সুমিত্রাকে আদর করে বলল, 'সুমি, আমার অনেক অনেক টাকা চাই। বাবার অপমানের পুরোপুরি শোধ আমাকে নিতে হবে। আমাদের পৈতৃক বাড়িটাকে আবার কিনে নিতে চাই। মাড়োয়ারী সেটা বিক্রী করতে অনিচ্ছুক। কিন্তু অনিচ্ছুক লোকের ইচ্ছে কিসে আসে জানো? টাকায়। যে-টাকায় বিক্রী করেছিলাম তার পাঁচ ছ'গুণ টাকা দিলে নিশ্চয় সে অনিচ্ছুক থাকবে না।'

অরুণাভর কথায় তখন সুমিত্রার চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে সজল চোখে বলল, 'তুমি টাকার পেছনে ছুটছো, অথচ আমার দিন কাটে কি করে বলো তো?'

অরুণাভ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'কেন সৌম্যেন্দু তো আছে। ওর অবসর সময়ে একটু গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিও। দ্যাখো না, আর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি সব গুছিয়ে ফেলছি। তাছাড়া ভেবেছি, তোমার মাকে এখানে এনে রাখব। তিনি যতই আপত্তি করুন, এবার আর তার কথায় কান দেব না। তাঁর অসুস্থ শরীর। আমরা ছাড়া তাঁকে দেখাশোনা করার লোকই বা কোথায়?'

সুমিত্রা ঠোঁট উল্টে বলল, 'মা কি বলেছেন মনে নেই? আমাদের বাচ্চা-টাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত উনি একটা রাতও আমাদের এখানে থাকবেন না। কিছু খাবেনও না।'

সুমিত্রার কথায় অরুণাভ বেশ শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতেই সুমিত্রাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তাহলে সবার আগে আমাদের সেই চেষ্টাই করতে হয়।'

অরুণাভর কথায় সুমিত্রার মন ভরে গেল। সে আদুরে মেয়ের মতো গাল ফুলিয়ে বলল, 'তুমি ভারি অসভ্য!'

তা বছর ঘুরতে না ঘুরতে সত্যি সত্যি সুমিত্রা মা হল, নীলঞ্জনা

তার কোলে এলো। কিন্তু সুমিত্রা মা হলেও তার মা মায়ার আর সুমিত্রার বাড়িতে থাকার সুযোগ হল না। নাতনীর জন্মের কয়েক মাস আগেই এপারের সব হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তিনি পরপারের দিকে যাত্রা করলেন। হার্ট-এ্যাটাকের পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বেঁচে ছিলেন তিনি। জামাই-মেয়েকে শেষ দেখাও দেখে যেতে পারেন নি।

মায়ের মৃত্যুতে সুমিত্রা যত না আঘাত পেল তার চেয়ে অনেক বেশী আঘাত পেলেন সুমিত্রার মামা সুপ্রিয় বোস। ভেতরে ভেতরে সুপ্রিয়বাবু যে বোনের ওপর এতখানি নির্ভরশীল ছিলেন তা হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। মায়াদেবীর মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অসুখ থেকে তিনি আর সেরে উঠতে পারলেন না। দিন পনেরো ভুগে তিনিও মারা গেলেন।

মা এবং মামার মৃত্যুর পর সুমিত্রার হঠাৎ যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বিষণ্ণতার ভার তার মনের ওপর যেন দৃঢ়ভাবে চেপে বসল।

অরুণাভ সঞ্জয় বোসকে তার পিসীর মৃত্যুর খবর জানিয়েছিল। কিন্তু সে-খবর পেয়ে সে ভারতে আসে নি। টেলিগ্রাম এবং চিঠির মাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিল কেবল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলো এলাহাবাদ। এবং সেখান থেকে প্রতাপগড়ে বোনের বাড়িতে। তবে পারলৌকিক কোনো কাজ সে করল না। কারণ এ-ব্যাপারে তার কোনো বিশ্বাসই ছিল না।

অঘ্রানের এক সকাল।

তখনো রোদ্দুর তত চড়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু প্রতাপগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চলছে কর্মচাঞ্চল্য। ছোট ছোট টিলা ভেঙে, মাটি খুঁড়ে পাথর বের করা হচ্ছে। সেই পাথরগুলো নির্দিষ্ট মাপে কাটা হচ্ছে। টুকরো পাথরের খোয়া স্তূপীকৃত হচ্ছে। লরী জিপ ছুটে যাচ্ছে পাথর বোঝাই হয়ে। শাবল গাঁইতি করাতের শব্দের সঙ্গে মানুষের চিৎকার উঠছে অবিরাম। সব মিলিয়ে এক বিশাল

কর্মযজ্ঞ। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের মূল ঋত্বিক যেন সৌম্যেন্দু বিশ্বাস।

কুলি-কামিন, ক্লার্ক-সুপারভাইজার সবাই সৌম্যেন্দুকেই আপনজন হিসেবে জানে। জনসন সাহেবের আমল থেকেই সে ওদের সঙ্গে আছে। আবার মিত্র সাহেবের আমলে সৌম্যেন্দু নিজে কোম্পানীর অংশীদার হয়েও একইভাবে মেশামেশি করছে ওদের সঙ্গে। বরং আগের চেয়ে অনেক গভীরভাবে। একান্ত আপনজনের মতো। কাজের সময় কেউ আহত হলে নিজেই ছুটে যায় তার কাছে। কোম্পানীর মেডিকেল ইউনিটকে তৎপর হতে বলে। তেমন প্রয়োজন হলে নিজেই জিপ চালিয়ে আহত মানুষটাকে নিয়ে যায় নিকটবর্তী হাসপাতালে। কুলি কামিনদের অভাব-অভিযোগ মন দিয়ে শোনে। তার একার পক্ষে যতটা অভাব মেটানো সম্ভব সে মেটাতে চেষ্টা করে। ফলে কোম্পানীর লোকজনের কাছে সে কেবল বিশ্বাস সাহেব না। অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন আপনজন। অন্যদিকে কোম্পানীর মালিক অরুণাভ মিত্র কেবলই মিত্র সাহেব। কুলি-কামিনদের থেকে অনেক দূরের মানুষ।

সঞ্জয় বোস প্রতাপগড়ে পা দিয়েই এই পার্থক্যটুকু টের পেল। এটা তার সহজাত ক্ষমতা। এই ক্ষমতার বলেই সে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। সে একটা চলমান যন্ত্রের শব্দ শুনেই বুঝতে পারে কোনটা তার দুর্বলতম স্থান। কোন জায়গা থেকে যন্ত্রটার অসুস্থতা শুরু হতে পারে। কোনো কারখানার ব্লু-প্রিণ্ট তার সামনে মেলে ধরলেই সে বলে দিতে পারে, কি কি প্রি-কসনারি মেজার নিলে কারখানাটা কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারে। এবং এসব পারে বলেই সঞ্জয় বোসকে অনেক কারখানার মালিকই উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

মিত্র ভিলায় যেতে যেতে সঞ্জয় মনে মনে ভাবল, বিশ্বাস সাহেব কে তা সে জানে না, তবে সে যে-ই হোক, আসল মালিক মিত্র সাহেবের চেয়ে তার এতটা প্রতিপত্তি থাকাটা ভালো না। মূল

মালিকের চেয়ে অন্য কোনো লোকের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশী থাকার ব্যাপারটা যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একটা ছিদ্রপথ। এই ছিদ্র-পথে খোদ মালিকের তুর্দিন নেমে আসা অসম্ভব নয়। অন্তত সঞ্জয়ের মতে, এইসব ক্ষেত্রে আসল মালিক একদিন কোণঠাসা হতে বাধ্য।

মিত্র ভিলায় যাবার পথে অনেকের কাছে বিশ্বাস সাহেবের নামটা শুনতে শুনতে সঞ্জয় বোসের মাথার মধ্যে একটা কৌতূহল দানা বেধে উঠল। কুলি-কামিনদের জিজ্ঞাসা করে দূর থেকে বিশ্বাস সাহেবকে একবার দেখতেও পেল। খাকি প্যান্ট সার্ট পরে সৌম্যেন্দু তখন চার দিকে ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম দেখছে। কখনো কখনো অনায়াস ভঙ্গিতে কুলিদের সঙ্গে নিজেও কাজ করছে।

সৌম্যেন্দুর এই অনায়াস ভঙ্গিটা সঞ্জয়কেও খুব প্রভাবিত করল। মনে মনে সৌম্যেন্দুর প্রশংসা না করে পারল না সে। বুঝল, মানুষটা নিঃসন্দেহে কর্মঠ এবং নিরহঙ্কার।

প্রকৃতপক্ষে সৌম্যেন্দু কেবল কর্মঠ এবং নিরহঙ্কারই ছিল না। তার মধ্যে আরো অনেক গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু তার অন্যান্য সমস্ত গুণাবলি একটা মাত্র চারিত্রিক দোষের কাছে সম্পূর্ণ-ভাবে পরাভূত হয়েছিল। চারিত্রিক সেই দোষ, সেই ত্রুটির নাম ঈর্ষা। সুমিত্রাকে কেন্দ্র করে অরুণাভ সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর ঈর্ষা। যা একটা বিশাল ব্লটিং পেপারের মতো তার জীবনের সমস্ত মাধুর্য শুষে নিয়ে তাকে একেবারে অন্য মানুষ করে দিয়েছিল।

সৌম্যেন্দু আগেও কুলি-কামিনদের সঙ্গে মেলামেশা করত। তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কায়িক শ্রমও করত কখনো কখনো। কিন্তু তখন তার মনে কোনোরকম অসৎ উদ্দেশ্য খেলা করত না। কিন্তু এখন কুলি-কামিনদের মেলামেশার পেছনে একটা উদ্দেশ্যই কাজ করে। আর তা হল, সকলের কাছে নিজের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। যাতে সুমিত্রার মনে ধারণা জন্মায় যে, সৌম্যেন্দু সব দিক দিয়েই একজন মহৎ মানুষ। তার মহত্বে কোনো খাদ নেই। এর পাশাপাশি আরো বড় কাজের কথাও সে ভেবে রেখেছিল।

সৌম্যেন্দুর মনের এত কথা বাইরের মানুষ জানত না। তাদের জানবার কথাও না।

সে যা হোক, অরুণাভর সেদিন জব্বলপুর যাবার কথা ছিল। ব্যবসা সংক্রান্ত জরুরী কাজে।

কিছুদিন হল সুমিত্রার কোনো কাজেই মন ছিল না। মা এবং সুপ্রিয়মামার মৃত্যুতে খুবই ভেঙে পড়েছিল সে। সংসারের প্রতি কোনো আকর্ষণই যেন ছিল না। সংসার সম্বন্ধে একটা বৈরাগ্য, একটা অনাসক্তি তার মনে বাসা বেঁধে ছিল। সেই অনাসক্তি সেই বৈরাগ্য হয়তো ছিল ক্ষণিকের। তবু তাকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

কিন্তু সুমিত্রার এই মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করার মতো সময় বা মন কোনোটাই ছিল না অরুণাভর। তখন তার কাছে ব্যবসার প্রতিষ্ঠাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা। তার চোখের সামনে সেই সময় সর্বক্ষণ ভেসে থাকত মিত্তির-বাড়ির সিংহ-দরজা। মিত্তির-বাড়ির বড় বড় থামগুলো তাকে যেন হাতছানি দিত। তার শরীরের মধ্যে জমিদার বংশের রক্ত টগবগ করে ফুটত সারাক্ষণ। যতদিন সে অনেক সম্পদের স্বাদ পায়নি ততদিন এমন করে তার রক্ত টগবগ করেনি। এখন সে স্বপ্ন দেখে। অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন। জমিদার না, রাজা না, সে এখন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

সেই সকালে অরুণাভ দোতলায় তার নিজের ঘরে বসে ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিল। পাশের ঘরেই বসেছিল সুমিত্রা। দুই ঘরের মাঝখানের দরজা খোলাই ছিল। তবে একটা পর্দা ঝুলছিল।

নীচ থেকে ওপরে উঠলে সুমিত্রার ঘরটাই প্রথমে পড়ে।

সুমিত্রা তখন খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিল চুপচাপ। স্পষ্ট করে কোনো কিছুই দেখছিল না। তার মনটা খোলোস ছাড়ানো সাপের মতন নিস্তেজভাবে পড়েছিল যেন। সুষ্ঠুভাবে কোনো কিছুই ভাবতে পারছিল না।

এমন সময় সুমিত্রার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সঞ্জয়।

সুমিত্রাকে বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে দেখে সে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকল, 'সুমি !'

সুমিত্রা এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, ডাকটা তার কানে ঠিকঠাক পৌঁছল না। তবে সুমিত্রার কানে না পৌঁছলেও পাশের ঘরে অরুণাভর কানে পৌঁছল। সে পর্দার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করল, আপাদমস্তক সাহেবীয়ানায় মোড়া এক সুদর্শন যুবক দরজায় দাঁড়িয়ে।

অরুণাভ সঞ্জয়কে আগে কখনো দেখেনি। ফটোতেও না। কেবল স্ত্রীর মুখে তার দাদার সৌন্দর্য এবং গুণের বিবরণ শুনেছে। সেই বিবরণ থেকে সে অনুমান করে নিল, মানুষটি নিঃসন্দেহে লণ্ডন প্রবাসী সঞ্জয় বোস। সুমিত্রার সঞ্জুদা।

অরুণাভ উঠতে গিয়েও উঠল না। সে ভাবল, আগে ভাই-বোনের সাক্ষাৎ-পর্বটা চুকে যাক, তারপর সে এগিয়ে যাবে।

অরুণাভ নিঃশব্দে বসে আগন্তুক মানুষটিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

সঞ্জয়কে সে যতটা সুন্দর বলে অনুমান করেছিল, চাক্ষুস দেখে বুঝল, আসল মানুষটি তার কল্পনার চেয়েও অনেক সুন্দর। গায়ের রঙ ফর্সা। বলা যায়, লালচে। ছ' ফুটের ওপর লম্বা। মেদহীন সুঠাম দেহ। দেখলেই বোঝা যায়, অফুরাণ স্বাস্থ্যের অধিকারী। চোখে-মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

সঞ্জয়কে দেখে অরুণাভর ভালো লাগল।

সঞ্জয় দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই আরো বার দুই সুমিত্রাকে ডাকল।

এতক্ষণে সাড়া মিলল সুমিত্রার। দরজার দিকে তাকিয়ে সেই আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। কতকটা ছেলেমানুষের মতোই ছুটে গেল দরজার কাছে। আবেগ জড়ানো গলায় বলল, 'আমাদের একেবারে ভুলে গেলে সঞ্জুদা ? এতদিনে মনে পড়ল ?'

সঞ্জয় বোস সামান্য হেসে উত্তর দিল, 'ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু এ্যাকিউজ। আমি আমার অন্যায় মেনে নিচ্ছি।'

তারপর ঘরের ভেতরে পা রাখতে রাখতে বলল, 'কিন্তু আমি তোর কথা ভাবি না তা নয়। আমি তোর কথা ভাবি। রাদার,

ইউ মে সে, আই এ্যাম ফোর্সড টু থিঙ্ক অব ইউ। তোর কথা ভাবতে বাধ্য হই।'

একটু থেমে যোগ করল, 'ইউ নো, নস্টালজিয়া হণ্টস মি। ছেলেবেলার স্মৃতি ভুলতে পারি না। তোর কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে। ইউ মে বিলিভ ইট।'

সুমিত্রার চোখে জল এসে গেল।

মা এবং সুপ্রিয়মামার মৃত্যুর পর শোকের যে-পাথরটা এতদিন তার বুকের ওপর চেপে বসেছিল, সঞ্জয়ের কথায় সেই পাথরটা যেন গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করল। তার বুকটা যেন অনেক হালকা হয়ে গেল।

সুমিত্রা কান্না ভেজা গলায় বলল, 'তুমি এসে গেছ আর আমার কোনো দুঃখ নেই। মা এবং মামার পর তুমিই তো রইলে।'

সঞ্জয় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। হাতের এ্যাটাচিটা রাখল টেবিলের ওপর। তারপর সহজ গলায় বলল, 'দুঃখ করবি কেন? নো ওয়ান ইজ ইম-মরটাল। মরতে সবাইকেই হবে। বাট দ্য কোশ্চেন ইজ হোয়েন এ্যাণ্ড হাউ। কখন এবং কিভাবে। পরিণত বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুই সবাই চায়। বাবা এবং পিসীর মৃত্যু সেই রকমই হয়েছে। এ্যাণ্ড সো ইউ শুড নট—।'

সঞ্জয় কথাটা শেষ না করেই পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরাল।

চুরুটটা দাঁতে চেপে বলল, 'আমি ধর্মটর্ম নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাই না। বাবার মৃত্যুতে কোনো নিয়ম-টিয়ম মানিনি, এটা থেকেই নিশ্চয় তা বুঝতে পারছিস। বাট স্টিল আই হ্যাভ গট এ পিকিউলিয়ার কনসেপসন এ্যাবাউট লাইফ। আমার মনে হয়, মানুষের জীবনটা একটা পাপেট শো। পুতুল খেলা। এ্যাণ্ড দেয়ার ইজ সামওয়ান বিহাইণ্ড হুজ এক্সপার্টস হ্যাণ্ডস প্লে। এ্যাজ হি প্লেস, উই প্লে।'

সঞ্জয়ের কথা শুনে সুমিত্রা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল তার

দিকে। সঞ্জয়ের মতো নাস্তিকের মুখে এরকম একটা কথা শুনে অবাক না হয়ে পারল না। সে তার বিস্ময়টা প্রকাশ করেও ফেলল। স্মিত মুখে বলল, 'একি বলছো সঞ্জুদা? আমরা সবাই পুতুল?'

সঞ্জয় দাঁতের ফাঁকে চুরুটটা চেপে রেখে একই ভঙ্গিতে বলল, 'ইয়েস পুতুল। এ্যাণ্ড ছাট পুতুল ইন এক্সপার্টস হ্যাণ্ডস।'

সঞ্জয় একটু থেমে সহাস্যে বলল, 'তুই কখনো ভাবতে পেরেছিলি তোর এরকম সুন্দর বিয়ে হবে। এরকম বিরাট বড়লোক হবি? তাছাড়া আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম বিলেতে আমাকে এভাবে আটকে থাকতে হবে? সেইজন্যেই বলছিলাম, ইটস এ পাপেট শো। থাকগে সে-কথা, তোর হাজব্যাণ্ডকে দেখছি না। তিনি কোথায়? হোয়্যার ইজ হি?'

—ও হ্যাঁ। বোসো ডাকছি।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াল। অরুণাভ এতক্ষণ তার ডাকের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল এবং দ্রুত পায়ে এ-ঘরে চলে এল।

এ-ঘরে এসে অরুণাভ সহাস্যে নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি অরুণাভ। আর আপনি তো সঞ্জয়বাবু। সুমিত্রার সঞ্জুদা।'

সঞ্জয় চেয়ার থেকে উঠে অরুণাভর একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে নিয়ে হাসিমুখে বলল, 'কি বলব? আপনি না তুমি?'

—অফকোর্স তুমি। অরুণাভ, তুমি।

কথাটা বলে অরুণাভ সঞ্জয়ের পায়ে হাত দেবার জন্য ঝুঁকল। সঞ্জয় দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল তাকে। বলল, 'নো মাই ডিয়ার ব্রাদার। এসব না। আই ডোণ্ট লাইক অল দিস। তার চেয়ে বোসো মন খুলে গল্প করা যাক।'

সুমিত্রা কেমন লজ্জিতভাবে সঞ্জয়কে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমিও তোমায় প্রণাম করতে ভুলে গেছি।'

সঞ্জয় সুমিত্রার হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তুই কি ভুলে

গেলি সব ? আমি কোনোদিন কারো প্রণাম নিয়েছি ? তার চেয়ে দুজনে একসঙ্গে বোস্। গল্প করি।'

সঞ্জয়ের ঠিক উল্টোদিকে পাশাপাশি চেয়ারে বসল অরুণাভ এবং সুমিত্রা। সুমিত্রা চেয়ারে বসেই কতকটা আবদারের সুরে বলল, 'আগে তোমার কথা বলো। তুমি ওখানে কেমন আছ। মেমবৌদি কেমন আছে ?'

সঞ্জয় বোস চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এই প্রসঙ্গেই তো বলছিলাম, আমাদের যেন কোনো কিছুর ওপরই হাত নেই।'

অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যোগ করল, 'ভেবে ছাখ আমি একদিন যে ভদ্রমহিলার পেয়িং গেষ্ট ছিলাম, আজ আমি তাঁরই সান-ইন-ল। কেবল তা-ই না, ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের বিয়ের পর একেবারে অথর্ব হয়ে পড়েছেন এবং আমাকে কাছে দেখতে না পেলে সাইকোলজিক্যালি দারুণ আপসেট হয়ে পড়েন। ফলে আমরা একরকম বন্দী। ইচ্ছে থাকলেও কোথাও যেতে পারি না।'

অরুণাভ সামান্য কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার ওপর এ-রকম আকর্ষণের কারণ কি ? কিছু বুঝতে পারেন ?'

সঞ্জয় সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আমি যখন ওদের ওখানে পেয়িং গেষ্ট হিসেবে যাই, তার মাত্র বছর খানেক আগে আমার ওয়াইফ-এর বড় ভাই প্লেন-ক্র্যাশে মারা যায়। হয়তো সেই জন্যেই ভদ্রমহিলা আমাকে একটু বেশি স্নেহ করেন। বলতে গেলে নিজের ছেলের মতোই।'

সুমিত্রা এর পর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তোমার তো একটি মেয়ে। এখন নিশ্চয় বছর দেড়েক হল।'

মেয়ের কথায় সঞ্জয়ের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলল, 'না আর একটু বেশি। এক বছর আট মাস। ভারি ছটফটে হয়েছে। আমাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না।'

সামান্য হেসে যোগ করল, 'এ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, আমিই ওকে ছেড়ে থাকতে পারি না।'

সুমিত্রাও হাসল। বলল, 'তা তোমার মেয়ে কার মতো দেখতে হয়েছে? তোমার মতো, না বৌদির মতো?'

সঞ্জয় শব্দ করে হাসল এবার। মুখে হাসির রেশ থাকতে থাকতেই বলল, 'লোকে তো বলে মুখশ্রী আমার মতো। রঙ অবিশ্যি মায়ের মতোই হয়েছে।'

সুমিত্রা মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে বলল, 'ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি ওদের একবার আনো না।'

'আনব। নিশ্চয়ই আনব। এটাই তো ওদের দেশ। এখানে ওদের আনব না?' কথাটা বলে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল সঞ্জয়।

অরুণাভ এবার বলল, 'ওখানে আপনার কাজকর্ম কেমন?'

সঞ্জয় কাঁধে একটা দোলা দিয়ে বলল, 'সেটাও এক অদ্ভুত ব্যাপার। আই আর্ন মোর দ্যান আই ডিজার্ভ। আমার যা জ্ঞান টেকনিক্যাল এ্যাড্‌ভাইজার হিসেবে আমি তার তুলনায় অনেক বেশি রোজগার করি। আই ডোন্ট নো হোয়াই দে কল মি।'

আবার কাঁধে একটা দোলা দিয়ে বলল, 'এনি ওয়ে, এবার তোমাদের কথা বলো। আসবার সময় দেখলাম, খুব জোর কাজ চলছে। পাথর কাটা, পাথর ভাঙার কাজ।'

সুমিত্রা অদ্ভুত এক মুখভঙ্গি করে বলল, 'সে-কথা আর বোলো না সঞ্জুদা। তোমার ভগ্নীপতি কাজ-পাগল মানুষ। কেবলই ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ এখানে কাল সেখানে। অর্ডার আর কন্ট্রাক্ট। আজ রাত্রেই তো জব্বলপুর যাবে। কি জানো আমার এরকম টাকার নেশা একেবারেই ভালো লাগে না। শান্তির জন্যে কি টাকার প্রয়োজন হয়? বলো।'

শেষের দিকের সুমিত্রার গলা কেমন ভারি শোনাল।

সুমিত্রার কথায় অরুণাভ বিরক্ত হল। বিরক্তির সঙ্গেই সে বলল, 'শান্তি সবাই চায়। কিন্তু সবাই একরকম ভাবে শান্তি না-ও পেতে পারে।'

ব্যাপারটা তর্কের দিকে মোড় নিতে পারে ভেবে সুমিত্রা হাল্কা

স্বরে বলল, 'কথাটা আমি এমনিই বললাম।'

সঞ্জয় স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিষয়ে কিছু বলল না। সে অন্য কথায় চলে গেল। অরুণাভর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা, তোমাদের কোম্পানীতে বিশ্বাস সাহেব কে বলোতো? আসবার পথে মনে হল, কর্মচারীমহলে ভদ্রলোক অত্যন্ত পপুলার।'

উত্তরটা সুমিত্রাই দিল। বলল, 'ওর এক বন্ধু। ছেলেবেলার। বলতে গেলে ভাই-এর মতন। ওরা কলকাতায় এক পাড়ায় থাকত।'

সুমিত্রার কথার পিঠে পিঠে অরুণাভ বলল, 'আসলে আমার তো ভাই-বোন কেউ নেই। ওই সৌম্যেন্দু বিশ্বাসই আমার ভাই। আমরা পরস্পরের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

একটু থেমে যোগ করল, 'কোম্পানীর প্রডাকশন সাইডের ও-ই ম্যানেজার। তাছাড়া কোম্পানীর টুয়েন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট শেয়ার আছে। সত্যি কথা বলতে কি, সৌম্যেন্দু না থাকলে আমি এই কোম্পানী চালাতেই পারতাম না। আসলে ও না থাকলে আমি কোম্পানীর মালিকও হতে পারতাম না।'

সুমিত্রা মিষ্টি করে হেসে বলল, 'কেবল কোম্পানীর মালিক হওয়ার কথা বলছো কেন? বলো, সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো না থাকলে আমাদের বিয়েও হত না।'

'সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো? তার মানে?' সঞ্জয়ের চোখে বিস্ময়।

সুমিত্রা হেসে বলল, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরপোর মানে বুঝতে গেলে অনেক কথা শুনতে হবে। দাঁড়াও তোমাকে সব বলছি।'

সুমিত্রা গোড়া থেকে সব বলল। প্রয়াগে দেখা হওয়ার পর থেকে সব কিছু।

সব শুনে সঞ্জয় তার ডান হাতটা সামনে প্রসারিত করে বলল, 'ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং তো। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে করছে।'

অরুণাভ বলল, 'আলাপ করার কোনো অসুবিধে নেই। সৌম্যেন্দু তো এই বাড়িতেই থাকে। আপনিও আছেন। আমি জব্বলপুর

থেকে দু'দিন পরেই ফিরে আসছি। তারপর চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তো অনেক দিনের প্রোগ্রাম করে ফেললে হে, কিন্তু আমার একজিসটেনস্ তো কয়েক ঘন্টার। কালকের সন্ধ্যের ফ্লাইটেই আমাকে চলে যেতে হবে। আজ বিকেলেই এলাহাবাদে ফিরব।'

অরুণাভ এবং সুমিত্রা প্রায় একসঙ্গেই বলল, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সুমিত্রা বলল, 'না সঞ্জুদা, তুমি আজ যেতে পারবে না। অন্ততঃ কটা দিন তোমাকে থাকতেই হবে। প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করো।'

- আজ যেতে হবে বোন। কয়েক মাসের মধ্যে আর একবার আসব। তোদের সব কিছু তো দেখে গেলাম।

সুমিত্রা মুখ ভার করে বলল. 'হ্যাঁ, তুমি আর এসেছো।'

—আসব রে. আসব। কথা দিচ্ছি। এলাহাবাদের বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—কি ব্যবস্থা করবে?

—ভেবেছি তোর নামে লিখে দেব।

—তার মানে দেশের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক থাকবে না; না সঞ্জুদা ও-দান আমি নেব না। তুমি কিছু মনে করো না। তুমি বরং কাউকে ভাড়া দাও। এমন শর্তে যে, তুমি এখানে এলে বাড়িটা ফিরে পাও। আমরা অবিশ্যি দেখাশোনা করব। কিগো, তুমি বলো না।

সুমিত্রা অরুণাভকে সাক্ষী মানল। অরুণাভ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'হ্যাঁ দাদা, সুমি ঠিকই বলেছে। ভাড়া দেওয়াই উচিত। তবে নিশ্চয়ই আমরা দেখাশোনা করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—তুমি তো আবার আজই জব্বলপুর যাচ্ছ। তুমি থাকলে

ভালো হত। আমি একজনের সঙ্গে প্রিলিমিনারি কথা বলেছি। ভদ্রলোকের নাম রবীন্দ্র মিশ্র। একজন স্কুল-টিচার। ছেলেবেলায় আমি ওঁর কাছে পড়েছি। ওঁর ছেলে আমার বন্ধু। সেও এখন অধ্যাপক। বাবাকে খুব মানত ওঁরা। ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা ভাড়া নিতে রাজী হয়েছে। সুমি অবিশ্যি ওদের সবাইকেই চেনে। তুমি হয়তো চেনো না। আপাততঃ এই ব্যবস্থাই চলুক। যদি কখনো মনে হয় যে, এখানে ফেরা আর সম্ভব নয়, তখন সুমিকেই এ বাড়ির দায়িত্ব নিতে হবে। পৈতৃক বাড়ি, বিক্রী করতে পারব না।'

'পৈতৃক বাড়ি, বিক্রী করতে পারব না'—কথাটা খট করে অরুণাভর কানে লাগল। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পৈতৃক বাড়িটা ফিরে পাবার জন্যে মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠল সে। তবে মুখে কিছু বলল না।

অন্য দিনের মতো সেই দুপুরেও বাড়িতে খেতে এল সৌম্যেন্দু। বাড়িতে একজন নতুন মানুষকে দেখে প্রথমটা অপ্রতিভ হল সে। পরে অরুণাভর কাছে সঞ্জয়ের পরিচয় পেয়ে সৌম্যেন্দুর খুশি হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ সে খুশি হতে পারল না। বরং তার চোখে-মুখে অস্বস্তির ভাবই প্রকাশ পেল। নেহাৎ সৌজন্যের জন্যেই মুখে বলল, 'আপনার বাবার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।'

সঞ্জয় উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, সুমির কাছে সব শুনলাম। সেদিন প্রয়াগে সুমি আপনাকে ও-ভাবে না দেখলে সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো অন্য রকম হয়ে যেত। ইটস স্ট্রেঞ্জ মিটিং।'

সুমিত্রার কথা উঠতেই সৌম্যেন্দু তার দিকে একবার তাকাল।

সেই মুহূর্তে সৌম্যেন্দুর দৃষ্টিতে ভালবাসা-ঈর্ষা-ঘৃণা তিনটেই যুগপৎ প্রকাশ পেল। সঞ্জয়ের চোখে তা ধরাও পড়ল। সৌম্যেন্দুর সেই দৃষ্টি দেখে সঞ্জয় ভেতরে ভেতরে কেমন চমকে উঠল। সে মনে মনে বলল, মানুষটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য কি? আড়ালে কোনো

ষড়যন্ত্র করছে না তো ?

প্রশ্নটা সঞ্জয়ের মনের মধ্যে উদয় হলেও বাইরে সে কিছুই প্রকাশ করল না।

এ-কথা বাইরে প্রকাশ করার কথাও অবিশ্যি নয়। কারণ, সুমিত্রা তার যত আপনজনই হোক, কাছের মানুষ কখনোই না। বরং অনেক দূরের। তাছাড়া এই স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতে এসব কথা কাউকে বলাও যায় না। বিশেষ করে তার হাতে যখন কোনো প্রমাণ নেই। এমনও তো হতে পারে, সৌম্যেন্দুর দৃষ্টিটা পড়তে সে ভুল করেছে। জোর দিয়ে তো কিছুই বলা যায় না।

সঞ্জয় তাই এই ব্যাপার নিয়ে কোনো আলোচনাই করল না।

কিন্তু সঞ্জয় যদি ব্যাপারটা নিয়ে সেদিন আর একটু ভাবত, সুমিত্রার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না করুক অন্ততঃ একটু যদি ইঙ্গিতও দিত, তাহলে ঘটনার মোড় অন্য দিকে ঘুরত। ঘটনার এমন একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি কিছুতেই হতে পারত না।

কিংবা এটা হয়তো ভ্রান্ত ধারণা। যা ঘটবার তা ঘটতই। আসলে হয়তো ও-ই কথাটাই ঠিক। মানুষের জীবন একজন দক্ষ বাজীকরের হাতে পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। লাইফ ইজ জাস্ট এ পাপেট শো।

তেইশ বছর পর ভারতের মাটিতে পা রাখার পূর্ব মুহূর্তে এমনই দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাবনা সঞ্জয়ের মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল।

অবিশ্যি এই তেইশ বছরের মধ্যে সঞ্জয় যে ভারতের মাটিতে আর পা রাখেনি তা নয়। আরো বার কয়েক সে এখানে এসেছে। এলাহাবাদের বাড়িতেও কাটিয়ে গেছে কয়েকদিন করে। এবং শেষবার ফেরার সময় তার মন ছিল অত্যন্ত বিষণ্ণ।

সে কথা এখন থাক।

সেদিন ফেরার সময় অরুণাভ নিজেই সঞ্জয়কে এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। গিয়েছিল অবিশ্যি গাড়ি করেই। সঞ্জয় কথায়

কথায় সেদিন বলেছিল, 'অরুণাভ, তোমাকে একটা এ্যাডভাইস দিচ্ছি। এ্যাজ ইওর ওয়েল-উইশার। পারটিকুলার কাউকে মনে রেখেও কথাটা বলছি না। সাধারণভাবেই বলছি। জাস্ট ফর ইওর ফিউচার গাইডেন্স : ভবিষ্যতে চলার সুবিধের জন্য।'

অরুণাভ হেসে বলল, 'এত হেজিটেট করছেন কেন ? কি বলবেন, বলুন না।'

সঞ্জয় শান্তভাবে বলল, 'সবাইকেই ওয়েলথ্ এবং উওম্যান সম্বন্ধে খুব কন্সাস থাকতে হয়। এই দুটো জিনিষ জীবনে বড় অনর্থ ঘটায়। এই দুটো বিষয়ে কাউকেই তাই খুব বেশি রিলাই করা যায় না। টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, নিজের ভাইকেও না। এর জন্য কেউ-ই বিশেষভাবে দায়ী নয়। আমাদের ভেরি স্ট্রাকচার অব দি সোসাইটিই হয়তো দায়ী।'

অরুণাভ কোনো উত্তর দিল না।

সঞ্জয় নিজেই আবার যোগ করল, 'কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ : তবু এটা সত্য। সূর্যের আলোর মতোই সত্য।'

অরুণাভ কোনো উত্তর না দিলেও মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল : এত অসন্তুষ্ট যে, সেই মুহূর্তে সঞ্জয়ের দিকে মুখ তুলে তার তাকাতেও ভালো লাগেনি।

ক'দিন পর ডায়েরির পাতায় সে লিখেছিল, 'সঞ্জয় বোসকে প্রথম দর্শনে খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু এলাহাবাদে যাবার পথে তার কথা শুনে মনে হল, মনের দিক দিয়ে ভদ্রলোক খুবই নিকৃষ্ট। ভদ্রলোক উপদেশ দিয়েছেন, ওয়েলথ্ এবং উওম্যান সম্বন্ধে সাবধান থাকতে। আমি বুঝতে পারছি, কেন তিনি এ-কথা বলেছেন। কার সম্বন্ধে এই কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়েছেন। সত্যিই ব্যাপারটা দুঃখের এবং খুবই লজ্জার। একজন শিক্ষিত মানুষের মন যে এত ছোট হতে পারে ভাবতে পারা যায় না। উনি আমার আত্মীয় এ-কথা ভাবতেও খারাপ লাগছে। এ-রকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক যত কম থাকে ততই মঙ্গল। এরা সংসারের হাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

সুমিত্রাকে এসব বলা ঠিক হবে না। এ-কথা শুনলে সে হয়তো মনে মনে আঘাত পাবে।'

অরুণাভর ডায়েরির কথাগুলো শুনতে খুবই নিরীহ। কিন্তু আপাত নিরীহ এই কথাগুলোর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সেদিন সে ডায়েরির পাতায় আরো লিখেছিল, 'সুমিত্রা আমার ভাবী সন্তানের জননী হতে চলেছে। এখন তার মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। তার মনের ওপর কোনোরকম চাপ পড়া ঠিক নয়। ওর নিঃসঙ্গতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন কোনো অল্পবয়েসী দেহাতী মেয়েকে ওর কাছে রাখলে ভালো হয়। আমি তো আমার কাজ কমাতে পারব না। আমাকে আরো অনেক অনেক কিছু করতে হবে। পিতৃপুরুষের সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটেছে। এটা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের যুগ। পিতৃপুরুষের গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।'

অরুণাভর ডায়েরি সেদিনের মতো ওখানেই শেষ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সাক্ষ্য রেখে যায় একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের মনের।

## ॥ তিন ॥

তেইশ বছর পর আবার কাহিনীর শুরু। বলতে গেলে মূল কাহিনীর শুরু এইসময় থেকেই।

শীতকালের এক সকাল।

একটা ঢাউস এয়ার-ক্র্যাফট্ দমদম এয়ারপোর্টের আকাশে চক্কর মেরে মেরে ঝকঝকে টারম্যাকে ল্যাণ্ড করল। আবহাওয়া প্রথম থেকেই খুব একটা পরিস্কার ছিল না। শীতকালের ঘন ধোঁয়াশায় এয়ারপোর্টের চৌহদ্দিটা আগাপাশতলা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল যেন। কাজেই প্লেনটার সেফ ল্যাণ্ডিং সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল যথেষ্টই। ওপর থেকে রানওয়ের ইণ্ডিকেশন লাইটটাও ঠিকঠাক দেখা

যাচ্ছিল না। একমাত্র ভরসা ছিল কন্ট্রোল টাওয়ারের ডিরেকশন। নেহাত অভিজ্ঞ পাইলট বলেই এ যাত্রা কিছু হল না। নিশ্চিন্তভাবে দমদমের মাটি স্পর্শ করল প্লেনটা। অবস্থাটা অন্যান্য যাত্রীদের যেমন দোলা দিয়েছিল, তেমনি দোলা দিয়েছিল সঞ্জয় বোসকেও।

সঞ্জয় যখন লাউঞ্জে ঢুকল, তখন সেখানে বেশ ভিড়। কেউ ফিরছে, কেউ যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে, কাউকে বিদায় দিতে। হাসি-কান্নায় ভরা এক দঙ্গল মানুষের ভিড়। সঞ্জয় বোস ভাল করে নজর করল চারদিক। সে জানে, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে না কেউ। প্রথমতঃ কলকাতায় তার এমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন নেই যারা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চেনা কাউকেই সে তার আসার সংবাদ দেয়নি। তবু চারদিক ভাল করে দেখে নিল। যদি তেমন কোনো চেনা মুখ তার দৃষ্টিতে পড়ে যায়। কিন্তু না। কোনো চেনা মুখ তারা নজরে পড়ল না। সঞ্জয় কি মনে করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তেইশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও সঞ্জয়ের চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। চুলের পাক আর দেহে সামান্য মেদের আধিক্য ভিন্ন আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তার শরীর এখনো আগের মতোই টানটান। কোথাও কোনো খাঁজ-খোঁজ নেই। সেদিনের সেই আগন্তুক মানুষই যেন। তাকে দেখলে বাঙালী বলে মনেই হয় না। পোষাকেও স্বদেশের কোনো ছাপ নেই। টাই থেকে জুতোর টিপ পর্যন্ত নিখুঁত সাহেবীয়ানায় মোড়া। লাউঞ্জের অনেকেই তাকে বিদেশী বলে ভুল করল। বিদেশী মনে করেই ইংরেজীতে কথা বলল কেউ কেউ।

সঞ্জয়ের সঙ্গে লটবহরের কোনো ঝামেলা নেই। মালপত্তর সামান্যই। বাইরে বেরিয়ে সে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। একবার ভাবল, প্রথমেই হোটেলে উঠবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে সে তার কাজের একটা ছক তৈরি করে ফেলল। তারপর পকেট

থেকে নোটবুক বের করে ঠিকানা দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলল, সারকাস এভিন্যু।

ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে সারকাস এভিন্যুর একটা মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এর সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল।

সঞ্জয় একতলার যে অফিসঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তার গায়ে একটা মাঝারি গোছের সাইন-বোর্ড। তাতে লেখা— রিসার্চ সেন্টার।

অফিসঘরের দরজার গায়ে একটা ছোট নেমপ্লেট। তাতে লেখা— সত্যসিন্ধু মুন্সী, গবেষক।

সঞ্জয় বোস 'রিসার্চ সেন্টার' এবং 'গবেষক' এই শব্দ ক'টা জিভে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল। তারপর নিজের মনেই প্রশ্ন করল, ক্রাইম নিয়ে কি রিসার্চ বা গবেষণা হয়?

হয়তো হয়। তার জানা নেই। সঞ্জয় নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল। পরক্ষণেই ভাবল, এই সত্যসিন্ধু মানুষটা বেশ প্রকৃতিস্থ তো? নাকি সমস্ত ব্যাপারটাই একটা খ্যাপাটে মানুষের খাম-খেয়ালি? শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার মাইল পথ উড়ে আসার নীট ফল শূন্য হবে না তো?

সত্যসিন্ধু মুন্সীর সঙ্গে সঞ্জয়ের চাক্ষুস পরিচয় নেই। অবশ্য পত্রালাপ হয়েছে। পত্রালাপের সূত্র কাগজের একটা বিজ্ঞাপন।

সঞ্জয় তখন লণ্ডনে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটা কাগজ একদিন তার হাতে এসে পড়েছিল। কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের ওপর তার চোখ আটকে গিয়েছিল।

বিজ্ঞাপনটা ছিল এইরকম,—

"বন্ধুগণ। একটু শুনুন। আপনারা জানেন, সমাজে নানারকম ব্যাধি আছে। যাকে সামাজিক ব্যাধি বলে। ক্রাইম সেইরকম একটা সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে অনেকেই আক্রান্ত হন। এই ব্যাধি নির্মূল করা আমাদের ব্রত। সমাজ-সচেতন মানুষ এবং শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

নতুন এবং পুরোনো উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক ডায়াগ্‌নোসিস করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল সঞ্জয় বোস। প্রথমটা ভেবেছিল, কোনো দুষ্টু লোকের মস্করা। পরে ভেবেছিল কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের ভাবপ্রবণতা।

তারপর সাত পাঁচ ভেবে সাত সমুদ্দুর পার থেকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিল। কয়েকটা চিঠি আদান-প্রদানের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুখোমুখি সাক্ষাৎ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ছুটে এসেছে এতদূর।

সঞ্জয় স্প্রিং-ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল অফিসঘরে।

অফিসঘরে প্রবেশ করে দেখল, সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন দেখছে। টেবিলের ওপর খবরের কাগজের কাটিং, চিঠি এবং আরো নানারকম কাগজপত্র ছড়ানো। হাতের কাছে একটা বড়সড় ম্যাগনেফাইং গ্লাস।

ভদ্রলোকের বয়েস কত তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে চারের কোঠায় বলেই মনে হয়।

লম্বাটে ধরনের মুখ। দেহের গড়ন রোগাটে, কিন্তু যথেষ্ট মজবুত। বসা অবস্থাতেও বোঝা যায়, বেশ লম্বা মানুষ। পাঁচ ফুট আট-নয় ইঞ্চির কম তো নয়ই। পরনে প্যান্ট হাওয়াই শার্ট। সব মিলিয়ে ঝকঝকে চেহারা। ভদ্রলোকের নাম সত্যসিন্ধু মুন্সী।

ভদ্রলোকের পেছন দিকে কতকটা কোণাকুণিভাবে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে একটি যুবক। তারও গড়ন মজবুত এবং ঝকঝকে চেহারা। যুবকটির সামনেও বেশ কিছু কাগজ এবং অনেকগুলো ফটো।

অফিসঘরটি সুন্দর করে সাজানো। টেবিল-চেয়ার, স্টিলের র‍্যাক-আলমারি যেমনটি থাকার কথা তেমনি আছে। বোঝাই যায়, পাশেও আর একটি ঘর আছে। সেই ঘরের দরজায় একটা পর্দা

ঝুলছে। পর্দাটা হাওয়ায় মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। ফলে ভেতরের আসবাবপত্রের কিছু কিছু অফিসঘর থেকেই চোখে পড়ছে। সে-সবের আকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ঘরটা একটা ছোটখাট ল্যাবরটরি।

সঞ্জয় ঘরে ঢুকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'গুড মর্নিং। মে আই স্পিক টু মিঃ মুন্সী ?'

রিসার্চ সেন্টারের অফিসঘরের একটা বিশেষত্ব আছে। তা হল তিনটি ভালো গ্লাসের আয়নার এক বিশেষ কৌণিক বিন্দুতে অবস্থিতি।

তিনটি আয়নার প্রথম দুটি টাঙানো আছে ঘরের দুই দেওয়ালে। আর তৃতীয়টি আছে সত্যসিন্ধুর টেবিলের ওপর রাখা একটা ছোট ডেস্কের আড়ালে।

কেউ ঘরে ঢুকলেই তার ছায়া তিনটি আয়নাতেই পর্যায়ক্রমে প্রতিবিম্বিত হয়। ফলে সত্যসিন্ধু মুন্সী মুখ না তুলেও আগন্তুক ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে।

সঞ্জয় বোস ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা না তুলেই সত্যসিন্ধু তাকে ভালোভাবে নজর করল। অবশ্য সঞ্জয় তা টের পেল না।

সত্যসিন্ধু সঞ্জয়ের কোট প্যান্ট টাই থেকে জুতোর টিপ পর্যন্ত সব কিছু ভালো করে দেখল। হাতের এ্যাটাচি, ফোল্ডিং ছাতা কোনোটাই তার নজর এড়াল না।

সত্যসিন্ধুর চোখে দুটো জিনিষ বিশেষ করে ধরা পড়ল। সে দেখল, এ্যাটাচির গায়ে লণ্ডনের একটা কোম্পানির লেবেল সাঁটা। ছাতাটার গায়েও তা-ই। তাছাড়া আগন্তুকের গায়ের রঙে ঠাণ্ডা দেশের শীতল ছায়া পড়েছে যেন।

সত্যসিন্ধু মনে মনে দ্রুত হিসেব কষে নিল। হ্যাঁ, সঞ্জয় বোস নামে এক নামী টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসারের বৃটিশ এয়ার ওয়েজের ফ্লাইটে আজই কলকাতায় এসে পৌঁছবার কথা। তার শেষ চিঠিতে সেই রকমই বলা ছিল। ভদ্রলোকের কেসটা অত্যন্ত পুরোনো

কিছুটা জটিলও। বেশ ইন্টারেস্টিং।

সত্যসিন্ধু মনে মনে সময়ের হিসেবও কষে নিল। সকালের ফ্লাইটে দমদম। তারপর সেখান থেকে সারকাস এভিন্যু।

অতএব আগন্তুক ভদ্রলোক সঞ্জয় বোস না হয়েই যায় না।

সত্যসিন্ধু মুখ না তুলেই উত্তর দিল, 'আমিই সত্যসিন্ধু মুন্সী, গবেষক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করল, 'সম্ভবতঃ আমি লণ্ডনের সঞ্জয় বোসের সঙ্গে কথা বলছি।'

সত্যসিন্ধুর এই কথায় সঞ্জয় খুব অবাক হল। সে ভেবে পেল না, সত্যসিন্ধু মুন্সী কি করে তার পরিচয় অনুমান করল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেল না। সঞ্জয়ের উত্তর না পেয়ে ততক্ষণে সত্যসিন্ধু চোখ তুলে তাকিয়েছে।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করল সঞ্জয়। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তা-ই। মানুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে যেন কোনো কিছুই গোপন করা যায় না। মনের ভেতরের সব কিছুই যেন সে দেখে নিতে পারে।

সঞ্জয় সামান্য হেসে বলল, 'আপনার অনুমান ঠিক। আমি সঞ্জয় বোস। এখন লণ্ডন থেকেই আসছি। তবে এক বছর আগে একবার এলাহাবাদে এসেছিলাম। সেখানে কিছু দিন একটা কনস্ট্রাকসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তারপর আবার চলে যাই লণ্ডনে।'

সঞ্জয় একটু আগেও ভাবেনি এত কথা বলবে। কিন্তু সত্যসিন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গড়গড় করে সব বলে ফেলল।

সত্যসিন্ধুর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শান্ত, নম্র হয়ে গেল। সে সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

সঞ্জয় টান টান হয়ে বসে বলল, 'আমার কেসটার কথা নিশ্চয় মনে আছে!'

সত্যসিন্ধুর ভুরুজোড়া সামান্য সূক্ষ্ম হল। সে তার এ্যাসিসট্যাণ্টকে ডেকে বলল, 'বিকাশ, একশো চৌত্রিশ নম্বর ফাইলটা দাও তো। প্রতাপগড়ের কেস। পুরোনো রোগ। বিশ বছরেরও বেশি। ইট নিডস্ স্পেশ্যাল কেয়ার।'

সঞ্জয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'আপনার তো সবই মনে আছে দেখছি। কিন্তু কেসটার সমাধান হবে তো?'

সত্যসিন্ধু ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'ডায়াগ্‌নোসিসের কথা বলছেন?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হবে, এই আশা নিয়েই তো কেসটা হাতে নিয়েছি। তবে পুরোনো রোগ তো। আরো এ্যানালিসিসের প্রয়োজন। সেই জন্যে হয়তো দু'এক মাস দেরি হতে পারে। তাছাড়া এই ব্যাপারে প্রাইমারি কন্‌ডিশন হল, আপনার কো-অপারেশন।

সঞ্জয় উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'এ ব্যাপারে আমার সেণ্ট পার্সেণ্ট এ্যাস্যুরেন্স রইল। আমি সবরকমভাবে আপনাদের কো-অপারেট করতে প্রস্তুত আছি।'

সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে সত্যসিন্ধু বলল, 'মনে রাখবেন, আমরা কো-অপারেশন চাই নট এ্যাজ এ ক্লায়েন্ট, বাট এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড। এ রিয়্যাল ফ্রেণ্ড।'

'শ্‌, সিওর!' সঞ্জয় কাঁধে একটা দোলা দিল।

সত্যসিন্ধু ম্যাগনেফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'দ্যাটস অল রাইট মিঃ বোস। আপনি আজ তাহলে আসুন। এক সপ্তাহ বাদে আবার দেখা করুন।'

সঞ্জয় সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনাকে কত এ্যাডভান্স দিতে হবে?'

সত্যসিন্ধু হাসিমুখে বলল, 'এখন কিছুই দিতে হবে না। এক সপ্তাহ বাদে দেখা করুন, তখন এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

## ॥ চার ॥

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হরিসাধন নন্দী তার স্টাডিতে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিল। এই সময় তাকে বড় একটা কেউ বিরক্ত করে না। তবে মাঝে-মধ্যে যে একেবারেই ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয়। বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ এসে পড়ে এক-একদিন।

আজো এমনি একটা ব্যতিক্রম ঘটল। বিনা অনুমতিতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সত্যসিন্ধু।

সত্যসিন্ধুর আগমনে হরিসাধনের মুখে বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ পেল। সে দাঁড়িয়ে দুটো হাত সামনে প্রসারিত করে কতকটা অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'এসো গবেষক। তারপর তোমার গবেষণার কাজ কেমন চলছে? অনেকদিন তো এ-পথ মাড়াও নি।'

সত্যসিন্ধু বন্ধু মহলে গবেষক হিসেবেই আদৃত।

সত্যসিন্ধু হরিসাধনের সম্বোধনের উত্তরে ঠোঁট জোড়া সামান্য সূক্ষ্ম করে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করল। তারপর বলল, 'গবেষণা চলছে এবং চলবেও। আর ওই গবেষণার ব্যাপারেই তোমার একটু সাহায্য দরকার। সেই জন্যেই তোমাকে এমন সময় বিরক্ত করতে আসা।'

হরিসাধনের ভুরু জোড়া সামান্য সূক্ষ্ম হল। সে বেশ ধীরে ধীরে বলল, 'ত্যাখো গবেষক তোমাকে আমি কোনোদিনই ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। যখন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলে তখনো পারিনি, এখনো না। কাজেই তোমার প্রয়োজনটা একটু খোলোসা করে বলো তো, ব্রাদার।'

সত্যসিন্ধুকে সামান্য গম্ভীর দেখাল। সে বলল, 'একটা পুরোনো এবং জটিল রোগের কেস হাতে এসেছে। কেসটার আদ্যপান্ত পড়েছি। রোগের উৎস কোথায় তা যে একেবারে ধরতে পারিনি তা নয়। তবে কনফারমেশন দরকার। এ্যাণ্ড ত্যাটস হোয়াই আই রিকয়ার ইওর হেলপ।'

হরিসাধন মুখে একরকম চুকচুক শব্দ করে বলল, 'সব গোলমাল করে দিচ্ছ গবেষক। আমি করি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা। আর তুমি করো সামাজিক ব্যাধি নিয়ে গবেষণা। দুটোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র পাচ্ছি না তো।'

সত্যসিন্ধু মোলায়েম হেসে বলল, 'যোগসূত্র পাচ্ছ না? আমিও পাচ্ছি না। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরা সমাজের বাইরে থাকে, এটা আমার জানা ছিল না। এবার বুঝতে পারছি সামাজিক ব্যাধিগুলো তাদের স্পর্শ করে না।'

হরিসাধন সামান্য থতিয়ে গিয়ে বলল, 'আই ডোণ্ট মিন ইট। আমি জানি, যে-কোনো মানুষ সোস্থাল ডাইসেসের শিকার হতে পারে। সোস্থাল ডাইসেস, তুমি যাকে সামাজিক ব্যাধি বলছো তার প্রতিকারের ব্যাপারে আমার কতটুকু স্থান আছে? হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ?'

—প্রথমেই অতটা ভাবতে যাচ্ছ কেন? আগে আমার প্রয়োজনটা শুনে নাও।

—বেশ বলো।

টান টান হয়ে বসল হরিসাধন।

সত্যসিন্ধু টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'নীলাঞ্জনা মিত্র নামে কাউকে তুমি চেনো? মেয়েটি তোমাদের কলেজে বি. এ. পড়ে।'

প্রশ্নটায় হরিসাধনবাবুর ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'কলেজের সব মেয়েকে তোমার চেনার কথা নয়। সবার নাম জানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দ্যাট আই নো। তবে আমি যার কথা বলছি, তার কিছু কিছু একস্ট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ আছে। মেয়েটি ভালো নাচে। প্রফেসনাল স্টেজেও অনেক বার নেচেছে। তাই হয়তো চিনতে পারো।'

হরিসাধনবাবুর কুঞ্চিত ভুরুজোড়া প্রশস্ত হল। সে হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ চিনি। কেবল আমি না। সম্ভবতঃ কলেজের সবাই

তাকে চেনে। নাচে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু হঠাৎ তার খোঁজ করছো কেন? মেয়েটি কোনো গোলমালে জড়িত নাকি?'

সত্যসিন্ধু এর উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মেয়েটি সম্বন্ধে তুমি কিছু খবর রাখো?'

—না, তেমন কিছু খবর রাখি না। তবে মেয়েটি পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। নিজের গাড়ি করেই কলেজে যাতায়াত করে। তাকে দেখতেও ভালো। খবরের মধ্যে এইটুকুই বলতে পারি।

সত্যসিন্ধু সহাস্যে বলল, 'এটাই বা কম কি?'

হরিসাধন সত্যসিন্ধুর চোখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে কৌতূহলের সঙ্গে বলল, 'তোমার কথাবার্তা কেমন যেন সাস্‌পিসাস্ বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি কোনো বাজে দলে পড়ে যায়নি তো!'

সত্যসিন্ধু নিরীহ মুখ করে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু না। তুমি বলছো, মেয়েটি দেখতে ভালো। তার ওপর আবার পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে। অপূর্ব যোগাযোগ। এই দুটোর একটা নিয়েই তো পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটছে। এখানে আবার দুটোরই সহাবস্থান। কামিনী এবং কাঞ্চন।'

—তা আমাকে কি করতে হবে?

—একটি ভালো ছেলের খোঁজ দিতে হবে। সুন্দর এবং শিক্ষিত যুবক। পরিবারটাও ভালো হওয়া চাই। তোমার কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেই ভালো হয়।

সত্যসিন্ধুর এ-রকম একটা উদ্ভট কথা শুনে হরিসাধন না হেসে পারল না। বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল সে। তারপর মুখে হাসির রেশ রেখেই বলল, 'সোস্যাল ডিজিসের রিসার্চার, আই মিন গবেষক, তার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি? বিয়ের ঘটকালি? আমি এতক্ষণ ভাবছি, কি না কি!'

সত্যসিন্ধু হাসল না। মুখের অভিব্যক্তি-ও পাল্টাল না। সহজ ভাবেই বলল, 'ঘটকালিও বলতে পারো। এ-ও তো একরকম ঘটকালি।'

সত্যসিন্ধুর কথায় হরিসাধনের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে। তার কথার অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'তবে এ-ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচারের প্রয়োজন নেই। অবিশ্যি একটা কণ্ডিশন আছে। পাত্রকে ভালো অভিনেতা হতে হবে। নীলাঞ্জনা মিত্রের সঙ্গে তার পূর্বের কোনো পরিচয় থাকা চলবে না। তাছাড়া পাত্রটিকে পুরোপুরি বেকার হতে হবে।'

হরিসাধন অবাক হয়ে বলল, 'এমন অদ্ভুত পাত্রের চাহিদা তো কখনো শুনিনি হে! তোমার উদ্দেশ্যটা একটু খুলে বলবে?'

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। তবে এখন না। কারণ, গোটা ব্যাপার আমার কাছেই ততটা পরিষ্কার নয়। আগে পরিষ্কার হোক। তুমি বরং এ-রকম একটি ছেলের কথা ভাবো।'

হরিসাধন চিন্তিত মুখে বলল, 'এ-রকম রেডিমেড পাত্র হঠাৎ কোথায় পাই বলো তো? আমার তো কাউকে মনে পড়ছে না।'

সত্যসিন্ধু নির্বিকারভাবে উঠে দাঁড়াল। একটা বই-এর আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বই দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন একটা দামী কিছু পেয়ে গেছে এমনি ভাব করে একটা বই বের করল। বইটা হরিসাধনের সামনে মেলে দিয়ে বলল, 'নন্দী, আমি যে-রকম ছেলেকে চাইছিলাম, তাকে পেয়ে গেছি। এই দ্যাখো।'

হরিসাধন বইটার দিকে এক নজর দেখেই বলল, 'ঠাট্টা করছো? হ্যামলেট হাতে নিয়ে বলছো, ছেলেকে পেয়ে গেছি।'

সত্যসিন্ধুর মুখে একটা তুষ্টু হাসি খেলে গেল। বলল, 'ঠাট্টা বোলো না। বলো, এ্যাসোসিয়েশন অব থটস্। হ্যামলেটটা দেখেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল।'

—কি রকম?

সত্যসিন্ধু বইটা হাতে নিয়েই চেয়ারে এসে বসল। তারপর বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'একটা গ্রুপ থিয়েটারে ছেলেটিকে

হ্যামলেটের অভিনয় করতে দেখেছিলাম। এর এ্যাকটিং ভালো লেগেছিল। কৌতূহলী হয়ে ওদের গ্রুপের একজনের কাছে ওর নাম-ধাম সব জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। ছেলেটি তখন সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তোমাদের কলেজ থেকেই। হঠাৎ তার কথাটাই মনে পড়ে গেল। তুমি একবার তার খোঁজ নাও।'

হরিসাধন এবার সামান্য বিরক্ত হয়েই বলল, 'খোঁজ নেব মানে?'

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বলল, 'ঘটকালির আগাম ব্যাপারটা তুমিই করো। খোঁজ নাও ছেলেটি এখনো বেকার কিনা। যদি বেকার থাকে তাহলে তোমাদের কলেজের কোনো ফাংসনে তাকে দিয়ে অভিনয় করাও। ধরো হ্যামলেটের কোনো নির্বাচিত সিনে অভিনয় করল। কলেজের ফাংসনের জন্য যদি ডোনেশন লাগে তাহলে তা-ও দেওয়া যাবে। তবে আমার নাম কাউকে ডিসক্লোজ করা চলবে না।'

হরিসাধন কোনো উত্তর দিল না। সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে বুঝতে চেষ্টা করল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'তোমার কাছ থেকে এইটুকু সহযোগিতা নিশ্চয় আশা করতে পারি?'

সত্যসিন্ধু উঠে দাঁড়াল। যেন তার কথা শেষ হয়ে গেছে।

হরিসাধন এবার রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো, গবেষক? তুমি ছেলেটির নাম ঠিকানা বললে না, অথচ তার খোঁজ করব?'

'ও-হো, নাম-ঠিকানা!' কথাটা বলে কতকটা হতাশভাবে বসে পড়ল সত্যসিন্ধু।

তারপর নিঃশব্দে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

'নাম-ঠিকানা ভুলে গেছ বুঝি? কিন্তু তুমি তো ভুলবার পাত্র নও, হে! একবার যা শোনো তা-তো ভোলো না।' হরিসাধনের চোখে কৌতূহল।

সত্যসিন্ধু চোখ বুজেই বলল, 'ইয়েস দেবরাজ। ছেলেটির নামের সঙ্গে দেবরাজের নামের মিল আছে।'

থেকে দু'দিন পরেই ফিরে আসছি। তারপর চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।'

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তো অনেক দিনের প্রোগ্রাম করে ফেললে হে, কিন্তু আমার একজিসটেনস্ তো কয়েক ঘণ্টার। কালকের সন্ধ্যের ফ্লাইটেই আমাকে চলে যেতে হবে। আজ বিকেলেই এলাহাবাদে ফিরব।'

অরুণাভ এবং সুমিত্রা প্রায় একসঙ্গেই বলল, 'সে কি? তা কখনো হয়?'

সুমিত্রা বলল, 'না সঞ্জুদা, তুমি আজ যেতে পারবে না। অন্ততঃ কটা দিন তোমাকে থাকতেই হবে। প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করো।'

—আজ যেতে হবে বোন। কয়েক মাসের মধ্যে আর একবার আসব। তোদের সব কিছু তো দেখে গেলাম।

সুমিত্রা মুখ ভার করে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আর এসেছো।'

—আসব রে, আসব। কথা দিচ্ছি। এলাহাবাদের বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—কি ব্যবস্থা করবে?

—ভেবেছি তোর নামে লিখে দেব।

—তার মানে দেশের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক থাকবে না? না সঞ্জুদা ও-দান আমি নেব না। তুমি কিছু মনে করো না। তুমি বরং কাউকে ভাড়া দাও। এমন শর্তে যে, তুমি এখানে এলে বাড়িটা ফিরে পাও। আমরা অবিশ্যি দেখাশোনা করব। কিগো, তুমি বলো না।

সুমিত্রা অরুণাভকে সাক্ষী মানল। অরুণাভ তাড়াতাড়ি জবাব দিল, 'হ্যাঁ দাদা, সুমি ঠিকই বলেছে। ভাড়া দেওয়াই উচিত। তবে নিশ্চয়ই আমরা দেখাশোনা করব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

—তুমি তো আবার আজই জব্বলপুর যাচ্ছ। তুমি থাকলে

ভালো হত। আমি একজনের সঙ্গে প্রিলিমিনারি কথা বলেছি। ভদ্রলোকের নাম রবীন্দ্র মিশ্র। একজন স্কুল-টিচার। ছেলেবেলায় আমি ওঁর কাছে পড়েছি। ওঁর ছেলে আমার বন্ধু। সেও এখন অধ্যাপক। বাবাকে খুব মানত ওঁরা। ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা ভাড়া নিতে রাজী হয়েছে। সুমি অবিশ্যি ওদের সবাইকেই চেনে। তুমি হয়তো চেনো না। আপাততঃ এই ব্যবস্থাই চলুক। যদি কখনো মনে হয় যে, এখানে ফেরা আর সম্ভব নয়, তখন সুমিকেই এ বাড়ির দায়িত্ব নিতে হবে। পৈতৃক বাড়ি, বিক্রী করতে পারব না।'

'পৈতৃক বাড়ি, বিক্রী করতে পারব না'—কথাটা খট করে অরুণাভর কানে লাগল। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। পৈতৃক বাড়িটা ফিরে পাবার জন্যে মনে মনে অশান্ত হয়ে উঠল সে। তবে মুখে কিছু বলল না।

অন্য দিনের মতো সেই দুপুরেও বাড়িতে খেতে এল সৌম্যেন্দু। বাড়িতে একজন নতুন মানুষকে দেখে প্রথমটা অপ্রতিভ হল সে। পরে অরুণাভর কাছে সঞ্জয়ের পরিচয় পেয়ে সৌম্যেন্দুর খুশি হওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু কার্যতঃ সে খুশি হতে পারল না। বরং তার চোখে-মুখে অস্বস্তির ভাবই প্রকাশ পেল। নেহাৎ সৌজন্যের জন্যেই মুখে বলল, 'আপনার বাবার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।'

সঞ্জয় উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, সুমির কাছে সব শুনলাম। সেদিন প্রয়াগে সুমি আপনাকে ও-ভাবে না দেখলে সমস্ত ব্যাপারটাই হয়তো অন্য রকম হয়ে যেত। ইটস স্ট্রেঞ্জ মিটিং।'

সুমিত্রার কথা উঠতেই সৌম্যেন্দু তার দিকে একবার তাকাল।

সেই মুহূর্তে সৌম্যেন্দুর দৃষ্টিতে ভালবাসা-ঈর্ষা-ঘৃণা তিনটেই যুগপৎ প্রকাশ পেল। সঞ্জয়ের চোখে তা ধরাও পড়ল। সৌম্যেন্দুর সেই দৃষ্টি দেখে সঞ্জয় ভেতরে ভেতরে কেমন চমকে উঠল। সে মনে মনে বলল, মানুষটা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য কি? আড়ালে কোনো

ষড়যন্ত্র করছে না তো ?

প্রশ্নটা সঞ্জয়ের মনের মধ্যে উদয় হলেও বাইরে সে কিছুই প্রকাশ করল না।

এ-কথা বাইরে প্রকাশ করার কথাও অবিশ্যি নয়। কারণ, সুমিত্রা তার যত আপনজনই হোক, কাছের মানুষ কখনোই না। বরং অনেক দূরের। তাছাড়া এই স্বল্প সময়ের উপস্থিতিতে এসব কথা কাউকে বলাও যায় না। বিশেষ করে তার হাতে যখন কোনো প্রমাণ নেই। এমনও তো হতে পারে, সৌম্যেন্দুর দৃষ্টিটা পড়তে সে ভুল করেছে। জোর দিয়ে তো কিছুই বলা যায় না।

সঞ্জয় তাই এই ব্যাপার নিয়ে কোনো আলোচনাই করল না।

কিন্তু সঞ্জয় যদি ব্যাপারটা নিয়ে সেদিন আর একটু ভাবত, সুমিত্রার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা না করুক অন্ততঃ একটু যদি ইঙ্গিতও দিত, তাহলে ঘটনার মোড় অন্য দিকে ঘুরত। ঘটনার এমন একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি কিছুতেই হতে পারত না।

কিংবা এটা হয়তো ভ্রান্ত ধারণা। যা ঘটবার তা ঘটতই। আসলে হয়তো ও-ই কথাটাই ঠিক। মানুষের জীবন একজন দক্ষ বাজীকরের হাতে পুতুল ছাড়া কিছুই নয়। লাইফ ইজ জাস্ট এ পাপেট শো।

তেইশ বছর পর ভারতের মাটিতে পা রাখার পূর্ব মুহূর্তে এমনই দুটি পরস্পর-বিরোধী ভাবনা সঞ্জয়ের মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছিল।

অবিশ্যি এই তেইশ বছরের মধ্যে সঞ্জয় যে ভারতের মাটিতে আর পা রাখেনি তা নয়। আরো বার কয়েক সে এখানে এসেছে। এলাহাবাদের বাড়িতেও কাটিয়ে গেছে কয়েকদিন করে। এবং শেষবার ফেরার সময় তার মন ছিল অত্যন্ত বিষণ্ণ।

সে কথা এখন থাক।

সেদিন ফেরার সময় অরুণাভ নিজেই সঞ্জয়কে এলাহাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। গিয়েছিল অবিশ্যি গাড়ি করেই। সঞ্জয় কথায়

কথায় সেদিন বলেছিল, 'অরুণাভ, তোমাকে একটা এ্যাডভাইস দিচ্ছি। এ্যাজ ইওর ওয়েল-উইশার। পারটিকুলার কাউকে মনে রেখেও কথাটা বলছি না। সাধারণভাবেই বলছি। জাস্ট ফর ইওর ফিউচার গাইডেন্স। ভবিষ্যতে চলার সুবিধের জন্য।'

অরুণাভ হেসে বলল, 'এত হেজিটেট করছেন কেন? কি বলবেন, বলুন না।'

সঞ্জয় শান্তভাবে বলল, 'সবাইকেই ওয়েলথ্ এবং উওম্যান সম্বন্ধে খুব কন্সাস থাকতে হয়। এই দুটো জিনিষ জীবনে বড় অনর্থ ঘটায়। এই দুটো বিষয়ে কাউকেই তাই খুব বেশি রিলাই করা যায় না। টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, নিজের ভাইকেও না। এর জন্য কেউ ই বিশেষভাবে দায়ী নয়। আমাদের ভেরি স্ট্রাকচার অব দি সোসাইটিই হয়তো দায়ী।'

অরুণাভ কোনো উত্তর দিল না।

সঞ্জয় নিজেই আবার যোগ করল, 'কথাটা শুনতে হয়তো খারাপ; তবু এটা সত্য। সূর্যের আলোর মতোই সত্য।'

অরুণাভ কোনো উত্তর না দিলেও মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল; এত অসন্তুষ্ট যে, সেই মুহূর্তে সঞ্জয়ের দিকে মুখ তুলে তার তাকাতেও ভালো লাগেনি।

ক'দিন পর ডায়েরির পাতায় সে লিখেছিল, 'সঞ্জয় বোসকে প্রথম দর্শনে খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু এলাহাবাদে যাবার পথে তার কথা শুনে মনে হল, মনের দিক দিয়ে ভদ্রলোক খুবই নিকৃষ্ট। ভদ্রলোক উপদেশ দিয়েছেন, ওয়েলথ্ এবং উওম্যান সম্বন্ধে সাবধান থাকতে। আমি বুঝতে পারছি, কেন তিনি এ-কথা বলেছেন। কার সম্বন্ধে এই কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়েছেন। সত্যিই ব্যাপারটা দুঃখের এবং খুবই লজ্জার। একজন শিক্ষিত মানুষের মন যে এত ছোট হতে পারে ভাবতে পারা যায় না। উনি আমার আত্মীয় এ-কথা ভাবতেও খারাপ লাগছে। এ-রকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক যত কম থাকে ততই মঙ্গল। এরা সংসারের হাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

সুমিত্রাকে এসব বলা ঠিক হবে না। এ-কথা শুনলে সে হয়তো মনে মনে আঘাত পাবে।'

অরুণাভর ডায়েরির কথাগুলো শুনতে খুবই নিরীহ। কিন্তু আপাত নিরীহ এই কথাগুলোর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

সেদিন সে ডায়েরির পাতায় আরো লিখেছিল, 'সুমিত্রা আমার ভাবী সন্তানের জননী হতে চলেছে। এখন তার মন প্রফুল্ল রাখা দরকার। তার মনের ওপর কোনোরকম চাপ পড়া ঠিক নয়। ওর নিঃসঙ্গতা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছি। কিছুদিন কোনো অল্পবয়েসী দেহাতী মেয়েকে ওর কাছে রাখলে ভালো হয়। আমি তো আমার কাজ কমাতে পারব না। আমাকে আরো অনেক অনেক কিছু করতে হবে। পিতৃপুরুষের সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসান ঘটেছে। এটা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের যুগ। পিতৃপুরুষের গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।'

অরুণাভর ডায়েরি সেদিনের মতো ওখানেই শেষ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সাক্ষ্য রেখে যায় একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের মনের।

## ॥ তিন ॥

তেইশ বছর পর আবার কাহিনীর শুরু। বলতে গেলে মূল কাহিনীর শুরু এইসময় থেকেই।

শীতকালের এক সকাল।

একটা ঢাউস এয়ার-ক্র্যাফট্ দমদম এয়ারপোর্টের আকাশে চক্কর মেরে মেরে ঝকঝকে টারম্যাকে ল্যাণ্ড করল। আবহাওয়া প্রথম থেকেই খুব একটা পরিস্কার ছিল না। শীতকালের ঘন ধোঁয়াশায় এয়ারপোর্টের চৌহদ্দিটা আগাপাশতলা চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল যেন। কাজেই প্লেনটার সেফ ল্যাণ্ডিং সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল যথেষ্টই। ওপর থেকে রানওয়ের ইণ্ডিকেশন লাইটটাও ঠিকঠাক দেখা

যাচ্ছিল না। একমাত্র ভরসা ছিল কন্ট্রোল টাওয়ারের ডিরেকশন। নেহাত অভিজ্ঞ পাইলট বলেই এ যাত্রা কিছু হল না। নিশ্চিন্তভাবে দমদমের মাটি স্পর্শ করল প্লেনটা। অবস্থাটা অন্যান্য যাত্রীদের যেমন দোলা দিয়েছিল, তেমনি দোলা দিয়েছিল সঞ্জয় বোসকেও।

সঞ্জয় যখন লাউঞ্জে ঢুকল, তখন সেখানে বেশ ভিড়। কেউ ফিরছে, কেউ যাচ্ছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবরা কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে, কাউকে বিদায় দিতে। হাসি-কান্নায় ভরা এক দঙ্গল মানুষের ভিড়। সঞ্জয় বোস ভাল করে নজর করল চারদিক। সে জানে, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে না কেউ। প্রথমতঃ কলকাতায় তার এমন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন নেই যারা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চেনা কাউকেই সে তার আসার সংবাদ দেয়নি। তবু চারদিক ভাল করে দেখে নিল। যদি তেমন কোনো চেনা মুখ তার দৃষ্টিতে পড়ে যায়। কিন্তু না। কোনো চেনা মুখ তারা নজরে পড়ল না। সঞ্জয় কি মনে করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তেইশ বছর অতিক্রান্ত হবার পরেও সঞ্জয়ের চেহারায় তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। চুলের পাক আর দেহে সামান্য মেদের আধিক্য ভিন্ন আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। তার শরীর এখনো আগের মতোই টানটান। কোথাও কোনো খাঁজ-খোঁজ নেই। সেদিনের সেই আগন্তুক মানুষই যেন। তাকে দেখলে বাঙালী বলে মনেই হয় না। পোষাকেও স্বদেশের কোনো ছাপ নেই। টাই থেকে জুতোর টিপ পর্যন্ত নিখুঁত সাহেবীয়ানায় মোড়া। লাউঞ্জের অনেকেই তাকে বিদেশী বলে ভুল করল। বিদেশী মনে করেই ইংরেজীতে কথা বলল কেউ কেউ।

সঞ্জয়ের সঙ্গে লটবহরের কোনো ঝামেলা নেই। মালপত্তর সামান্যই। বাইরে বেরিয়ে সে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল। একবার ভাবল, প্রথমেই হোটেলে উঠবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে সে তার কাজের একটা ছক তৈরি করে ফেলল। তারপর পকেট

থেকে নোটবুক বের করে ঠিকানা দেখে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বলল, সারকাস এভিন্যু।

ঠিকানা মিলিয়ে মিলিয়ে সারকাস এভিন্যুর একটা মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এর সামনে ট্যাক্সিটাকে দাঁড় করাল।

সঞ্জয় একতলার যে অফিসঘরের সামনে এসে দাঁড়াল তার গায়ে একটা মাঝারি গোছের সাইন-বোর্ড। তাতে লেখা— রিসার্চ সেন্টার।

অফিসঘরের দরজার গায়ে একটা ছোট নেমপ্লেট। তাতে লেখা— সত্যসিন্ধু মুন্সী, গবেষক।

সঞ্জয় বোস 'রিসার্চ সেন্টার' এবং 'গবেষক' এই শব্দ ক'টা জিভে নিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল। তারপর নিজের মনেই প্রশ্ন করল, ক্রাইম নিয়ে কি রিসার্চ বা গবেষণা হয়?

হয়তো হয়। তার জানা নেই। সঞ্জয় নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিল। পরক্ষণেই ভাবল, এই সত্যসিন্ধু মানুষটা বেশ প্রকৃতিস্থ তো? নাকি সমস্ত ব্যাপারটাই একটা খ্যাপাটে মানুষের খাম-খেয়ালি? শেষ পর্যন্ত কয়েক হাজার মাইল পথ উড়ে আসার নীট ফল শূন্য হবে না তো?

সত্যসিন্ধু মুন্সীর সঙ্গে সঞ্জয়ের চাক্ষুস পরিচয় নেই। অবশ্য পত্রালাপ হয়েছে। পত্রালাপের সূত্র কাগজের একটা বিজ্ঞাপন।

সঞ্জয় তখন লণ্ডনে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটা কাগজ একদিন তার হাতে এসে পড়েছিল। কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের ওপর তার চোখ আটকে গিয়েছিল।

বিজ্ঞাপনটা ছিল এইরকম,—

"বন্ধুগণ। একটু শুনুন। আপনারা জানেন, সমাজে নানারকম ব্যাধি আছে। যাকে সামাজিক ব্যাধি বলে। ক্রাইম সেইরকম একটা সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে অনেকেই আক্রান্ত হন। এই ব্যাধি নির্মূল করা আমাদের ব্রত। সমাজ-সচেতন মানুষ এবং শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

নতুন এবং পুরোনো উভয় ক্ষেত্রেই সঠিক ডায়াগ্‌নোসিস করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনটা দেখে খুব অবাক হয়েছিল সঞ্জয় বোস। প্রথমটা ভেবেছিল, কোনো দুষ্টু লোকের মস্করা। পরে ভেবেছিল কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের ভাবপ্রবণতা।

তারপর সাত পাঁচ ভেবে সাত সমুদ্দুর পার থেকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিল। কয়েকটা চিঠি আদান-প্রদানের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুখোমুখি সাক্ষাৎ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে ছুটে এসেছে এতদূর।

সঞ্জয় সুয়িং-ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল অফিসঘরে।

অফিসঘরে প্রবেশ করে দেখল, সাদামাটা চেহারার একজন মানুষ চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন দেখছে। টেবিলের ওপর খবরের কাগজের কাটিং, চিঠি এবং আরো নানারকম কাগজপত্র ছড়ানো। হাতের কাছে একটা বড়সড় ম্যাগনেফাইং গ্লাস।

ভদ্রলোকের বয়েস কত তা ঠিক বোঝা যায় না। তবে চারের কোঠায় বলেই মনে হয়।

লম্বাটে ধরনের মুখ। দেহের গড়ন রোগাটে, কিন্তু যথেষ্ট মজবুত। বসা অবস্থাতেও বোঝা যায়, বেশ লম্বা মানুষ। পাঁচ ফুট আট-নয় ইঞ্চির কম তো নয়ই। পরনে প্যান্ট হাওয়াই শার্ট। সব মিলিয়ে ঝকঝকে চেহারা। ভদ্রলোকের নাম সত্যসিন্ধু মুন্সী।

ভদ্রলোকের পেছন দিকে কতকটা কোণাকুণিভাবে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে একটি যুবক। তারও গড়ন মজবুত এবং ঝকঝকে চেহারা। যুবকটির সামনেও বেশ কিছু কাগজ এবং অনেকগুলো ফটো।

অফিসঘরটি সুন্দর করে সাজানো। টেবিল-চেয়ার, স্টিলের র‍্যাক-আলমারি যেমনটি থাকার কথা তেমনি আছে। বোঝাই যায়, পাশেও আর একটি ঘর আছে। সেই ঘরের দরজায় একটা পর্দা

ঝুলছে। পর্দাটা হাওয়ায় মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক সরে যাচ্ছে। ফলে ভেতরের আসবাবপত্রের কিছু কিছু অফিসঘর থেকেই চোখে পড়ছে। সে-সবের আকৃতি এবং প্রকৃতি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, ঘরটা একটা ছোটখাট ল্যাবরটরি।

সঞ্জয় ঘরে ঢুকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'গুড মর্নিং। মে আই স্পিক টু মিঃ মুন্সী?'

রিসার্চ সেন্টারের অফিসঘরের একটা বিশেষত্ব আছে। তা হল তিনটি ভালো গ্লাসের আয়নার এক বিশেষ কৌণিক বিন্দুতে অবস্থিতি।

তিনটি আয়নার প্রথম দুটি টাঙানো আছে ঘরের দুই দেওয়ালে। আর তৃতীয়টি আছে সত্যসিন্ধুর টেবিলের ওপর রাখা একটা ছোট ডেস্কের আড়ালে।

কেউ ঘরে ঢুকলেই তার ছায়া তিনটি আয়নাতেই পর্যায়ক্রমে প্রতিবিম্বিত হয়। ফলে সত্যসিন্ধু মুন্সী মুখ না তুলেও আগন্তুক ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে।

সঞ্জয় বোস ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা না তুলেই সত্যসিন্ধু তাকে ভালোভাবে নজর করল। অবশ্য সঞ্জয় তা টের পেল না।

সত্যসিন্ধু সঞ্জয়ের কোট প্যাণ্ট টাই থেকে জুতোর টিপ পর্যন্ত সব কিছু ভালো করে দেখল। হাতের এ্যাটাচি, ফোল্ডিং ছাতা কোনোটাই তার নজর এড়াল না।

সত্যসিন্ধুর চোখে দুটো জিনিষ বিশেষ করে ধরা পড়ল। সে দেখল, এ্যাটাচির গায়ে লণ্ডনের একটা কোম্পানির লেবেল সাঁটা। ছাতাটার গায়েও তাই। তাছাড়া আগন্তুকের গায়ের রঙে ঠাণ্ডা দেশের শীতল ছায়া পড়েছে যেন।

সত্যসিন্ধু মনে মনে দ্রুত হিসেব কষে নিল। হ্যাঁ, সঞ্জয় বোস নামে এক নামী টেকনিক্যাল এ্যাডভাইসারের বৃটিশ এয়ার ওয়েজের ফ্লাইটে আজই কলকাতায় এসে পৌঁছবার কথা। তার শেষ চিঠিতে সেই রকমই বলা ছিল। ভদ্রলোকের কেসটা অত্যন্ত পুরোনো

কিছুটা জটিলও। বেশ ইন্টারেস্টিং।

সত্যসিন্ধু মনে মনে সময়ের হিসেবও কষে নিল। সকালের ফ্লাইটে দমদম। তারপর সেখান থেকে সারকাস এভিন্যু।

অতএব আগন্তুক ভদ্রলোক সঞ্জয় বোস না হয়েই যায় না।

সত্যসিন্ধু মুখ না তুলেই উত্তর দিল, 'আমিই সত্যসিন্ধু মুন্সী, গবেষক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করল, 'সম্ভবতঃ আমি লণ্ডনের সঞ্জয় বোসের সঙ্গে কথা বলছি।'

সত্যসিন্ধুর এই কথায় সঞ্জয় খুব অবাক হল। সে ভেবে পেল না, সত্যসিন্ধু মুন্সী কি করে তার পরিচয় অনুমান করল। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেল না। সঞ্জয়ের উত্তর না পেয়ে ততক্ষণে সত্যসিন্ধু চোখ তুলে তাকিয়েছে।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করল সঞ্জয়। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তা-ই। মানুষটির চোখের দিকে তাকিয়ে যেন কোনো কিছুই গোপন করা যায় না। মনের ভেতরের সব কিছুই যেন সে দেখে নিতে পারে।

সঞ্জয় সামান্য হেসে বলল, 'আপনার অনুমান ঠিক। আমি সঞ্জয় বোস। এখন লণ্ডন থেকেই আসছি। তবে এক বছর আগে একবার এলাহাবাদে এসেছিলাম। সেখানে কিছু দিন একটা কনস্ট্রাকসনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তারপর আবার চলে যাই লণ্ডনে।'

সঞ্জয় একটু আগেও ভাবেনি এত কথা বলবে। কিন্তু সত্যসিন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও গড়গড় করে সব বলে ফেলল।

সত্যসিন্ধুর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ শান্ত, নম্র হয়ে গেল। সে সৌজন্যের হাসি হেসে বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

সঞ্জয় টান টান হয়ে বসে বলল, 'আমার কেসটার কথা নিশ্চয় মনে আছে!'

সত্যসিন্ধুর ভুরুজোড়া সামান্য সূক্ষ্ম হল। সে তার এ্যাসিসট্যান্টকে ডেকে বলল, 'বিকাশ, একশো চৌত্রিশ নম্বর ফাইলটা দাও তো। প্রতাপগড়ের কেস। পুরোনো রোগ। বিশ বছরেরও বেশি। ইট নিডস্ স্পেশ্যাল কেয়ার।'

সঞ্জয় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'আপনার তো সবই মনে আছে দেখছি। কিন্তু কেসটার সমাধান হবে তো?'

সত্যসিন্ধু ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলল, 'ডায়াগ্নোসিসের কথা বলছেন?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হবে, এই আশা নিয়েই তো কেসটা হাতে নিয়েছি। তবে পুরোনো রোগ তো। আরো এ্যানালিসিসের প্রয়োজন। সেই জন্যে হয়তো দু'এক মাস দেরি হতে পারে। তাছাড়া এই ব্যাপারে প্রাইমারি কন্ডিশন হল, আপনার কো-অপারেশন।

সঞ্জয় উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'এ ব্যাপারে আমার সেন্ট পারসেন্ট এ্যাস্যুরেন্স রইল। আমি সবরকমভাবে আপনাদের কো-অপারেট করতে প্রস্তুত আছি।'

সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে সত্যসিন্ধু বলল, 'মনে রাখবেন, আমরা কো-অপারেশন চাই নট এ্যাজ এ ক্লায়েন্ট, বাট এ্যাজ এ ফ্রেণ্ড। এ রিয়্যাল ফ্রেণ্ড।'

'ও, সিওর!' সঞ্জয় কাঁধে একটা দোলা দিল।

সত্যসিন্ধু ম্যাগনেফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'দ্যাটস অল রাইট মিঃ বোস। আপনি আজ তাহলে আসুন। এক সপ্তাহ বাদে আবার দেখা করুন।'

সঞ্জয় সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনাকে কত এ্যাডভান্স দিতে হবে?'

সত্যসিন্ধু হাসিমুখে বলল, 'এখন কিছুই দিতে হবে না। এক সপ্তাহ বাদে দেখা করুন, তখন এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

॥ চার ॥

ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হরিসাধন নন্দী তার স্টাডিতে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিল। এই সময় তাকে বড় একটা কেউ বিরক্ত করে না। তবে মাঝে-মধ্যে যে একেবারেই ব্যতিক্রম ঘটে না তা নয়। বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ এসে পড়ে এক-একদিন।

আজো এমনি একটা ব্যতিক্রম ঘটল। বিনা অনুমতিতে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সত্যসিন্ধু।

সত্যসিন্ধুর আগমনে হরিসাধনের মুখে বিরক্তির পরিবর্তে আনন্দ প্রকাশ পেল। সে দাঁড়িয়ে দুটো হাত সামনে প্রসারিত করে কতকটা অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'এসো গবেষক। তারপর তোমার গবেষণার কাজ কেমন চলছে? অনেকদিন তো এ-পথ মাড়াও নি।'

সত্যসিন্ধু বন্ধু মহলে গবেষক হিসেবেই আদৃত।

সত্যসিন্ধু হরিসাধনের সম্বোধনের উত্তরে ঠোঁট জোড়া সামান্য সূক্ষ্ম করে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করল। তারপর বলল, 'গবেষণা চলছে এবং চলবেও। আর ওই গবেষণার ব্যাপারেই তোমার একটু সাহায্য দরকার। সেই জন্যেই তোমাকে এমন সময় বিরক্ত করতে আসা।'

হরিসাধনের ভুরু জোড়া সামান্য সূক্ষ্ম হল। সে বেশ ধীরে ধীরে বলল, 'ছাখো গবেষক তোমাকে আমি কোনোদিনই ঠিকঠাক বুঝতে পারি না। যখন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলে তখনো পারিনি, এখনো না। কাজেই তোমার প্রয়োজনটা একটু খোলোসা করে বলো তো, ব্রাদার।'

সত্যসিন্ধুকে সামান্য গম্ভীর দেখাল। সে বলল, 'একটা পুরোনো এবং জটিল রোগের কেস হাতে এসেছে। কেসটার আদ্যপান্ত পড়েছি। রোগের উৎস কোথায় তা যে একেবারে ধরতে পারিনি তা নয়। তবে কনফারমেশন দরকার। এ্যাণ্ড ছাটস হোয়াই আই রিকয়ার ইওর হেলপ।'

হরিসাধন মুখে একরকম চুকচুক শব্দ করে বলল, 'সব গোলমাল করে দিচ্ছ গবেষক। আমি করি ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা। আর তুমি করো সামাজিক ব্যাধি নিয়ে গবেষণা। দুটোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র পাচ্ছি না তো।'

সত্যসিন্ধু মোলায়েম হেসে বলল, 'যোগসূত্র পাচ্ছ না? আমিও পাচ্ছি না। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরা সমাজের বাইরে থাকে, এটা আমার জানা ছিল না। এবার বুঝতে পারছি সামাজিক ব্যাধিগুলো তাদের স্পর্শ করে না।'

হরিসাধন সামান্য থতিয়ে গিয়ে বলল, 'আই ডোণ্ট মিন ইট। আমি জানি, যে-কোনো মানুষ সোস্যাল ভাইসেসের শিকার হতে পারে। সোস্যাল ভাইসেস, তুমি যাকে সামাজিক ব্যাধি বলছো তার প্রতিকারের ব্যাপারে আমার কতটুকু জ্ঞান আছে? হাউ ক্যান আই হেলপ্ ইউ?'

—প্রথমেই অতটা ভাবতে যাচ্ছ কেন? আগে আমার প্রয়োজনটা শুনে নাও।

—বেশ বলো।

টান টান হয়ে বসল হরিসাধন

সত্যসিন্ধু টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'নীলাঞ্জনা মিত্র নামে কাউকে তুমি চেনো? মেয়েটি তোমাদের কলেজে বি. এ. পড়ে।'

প্রশ্নটায় হরিসাধনবাবুর ভুরুজোড়া কুঁচকে গেল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'কলেজের সব মেয়েকে তোমার চেনার কথা না। সবার নাম জানার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দ্যাট আই নো। তবে আমি যার কথা বলছি, তার কিছু কিছু একস্ট্রা কারিকুলার এ্যাকটিভিটিজ আছে। মেয়েটি ভালো নাচে। প্রফেসনাল স্টেজেও অনেক বার নেচেছে। তাই হয়তো চিনতে পারো।'

হরিসাধনবাবুর কুঞ্চিত ভুরুজোড়া প্রশস্ত হল। সে হাসিমুখে বলল, 'হ্যাঁ চিনি। কেবল আমি না। সম্ভবতঃ কলেজের সবাই

তাকে চেনে। নাচে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। কিন্তু হঠাৎ তার খোঁজ করছো কেন? মেয়েটি কোনো গোলমালে জড়িত নাকি?'

সত্যসিন্ধু এর উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'মেয়েটি সম্বন্ধে তুমি কিছু খবর রাখো?'

—না, তেমন কিছু খবর রাখি না। তবে মেয়েটি পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়। নিজের গাড়ি করেই কলেজে যাতায়াত করে। তাকে দেখতেও ভালো। খবরের মধ্যে এইটুকুই বলতে পারি।

সত্যসিন্ধু সহাস্যে বলল, 'এটাই বা কম কি?'

হরিসাধন সত্যসিন্ধুর চোখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে কৌতূহলের সঙ্গে বলল, 'তোমার কথাবার্তা কেমন যেন সাস্‌পিসাস্ বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি কোনো বাজে দলে পড়ে যায়নি তো!'

সত্যসিন্ধু নিরীহ মুখ করে বলল, 'অস্বাভাবিক কিছু না। তুমি বলছো, মেয়েটি দেখতে ভালো। তার ওপর আবার পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে। অপূর্ব যোগাযোগ। এই দুটোর একটা নিয়েই তো পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটছে। এখানে আবার দুটোরই সহাবস্থান। কামিনী এবং কাঞ্চন।'

—তা আমাকে কি করতে হবে?

—একটি ভালো ছেলের খোঁজ দিতে হবে। সুন্দর এবং শিক্ষিত যুবক। পরিবারটাও ভালো হওয়া চাই। তোমার কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেই ভালো হয়।

সত্যসিন্ধুর এ-রকম একটা উদ্ভট কথা শুনে হরিসাধন না হেসে পারল না। বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল সে। তারপর মুখে হাসির রেশ রেখেই বলল, 'সোস্যাল ডিজিসের রিসার্চার, আই মিন গবেষক, তার শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি? বিয়ের ঘটকালি? আমি এতক্ষণ ভাবছি, কি না কি!'

সত্যসিন্ধু হাসল না। মুখের অভিব্যক্তি-ও পাল্টাল না। সহজ ভাবেই বলল, 'ঘটকালিও বলতে পারো। এ-ও তো একরকম ঘটকালি।'

সত্যসিন্ধুর কথায় হরিসাধনের মুখে হাসি মিলিয়ে গেল। সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে। তার কথার অর্থটা বুঝতে চেষ্টা করল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'তবে এ-ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর যোটক বিচারের প্রয়োজন নেই। অবিশ্যি একটা কণ্ডিশন আছে। পাত্রকে ভালো অভিনেতা হতে হবে। নীলাঞ্জনা মিত্রের সঙ্গে তার পূর্বের কোনো পরিচয় থাকা চলবে না। তাছাড়া পাত্রটিকে পুরোপুরি বেকার হতে হবে।'

হরিসাধন অবাক হয়ে বলল, 'এমন অদ্ভুত পাত্রের চাহিদা তো কখনো শুনিনি হে! তোমার উদ্দেশ্যটা একটু খুলে বলবে?'

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। তবে এখন না। কারণ, গোটা ব্যাপার আমার কাছেই ততটা পরিষ্কার নয়। আগে পরিষ্কার হোক। তুমি বরং এ-রকম একটি ছেলের কথা ভাবো।'

হরিসাধন চিন্তিত মুখে বলল, 'এ-রকম রেডিমেড পাত্র হঠাৎ কোথায় পাই বলো তো? আমার তো কাউকে মনে পড়ছে না।'

সত্যসিন্ধু নির্বিকারভাবে উঠে দাঁড়াল। একটা বই-এর আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বই দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন একটা দামী কিছু পেয়ে গেছে এমনি ভাব করে একটা বই বের করল। বইটা হরিসাধনের সামনে মেলে দিয়ে বলল, 'নন্দী, আমি যে-রকম ছেলেকে চাইছিলাম, তাকে পেয়ে গেছি। এই ছাখো।'

হরিসাধন বইটার দিকে এক নজর দেখেই বলল, 'ঠাট্টা করছো? হ্যামলেট হাতে নিয়ে বলছো, ছেলেকে পেয়ে গেছি।'

সত্যসিন্ধুর মুখে একটা তুষ্টু হাসি খেলে গেল। বলল, 'ঠাট্টা বোলো না। বলো, এ্যাসোসিয়েশন অব থটস্। হ্যামলেটটা দেখেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেল।'

—কি রকম?

সত্যসিন্ধু বইটা হাতে নিয়েই চেয়ারে এসে বসল। তারপর বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'একটা গ্রুপ থিয়েটারে ছেলেটিকে

হ্যামলেটের অভিনয় করতে দেখেছিলাম। এর এ্যাকটিং ভালো লেগেছিল। কৌতূহলী হয়ে ওদের গ্রুপের একজনের কাছে ওর নাম-ধাম সব জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। ছেলেটি তখন সবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তোমাদের কলেজ থেকেই। হঠাৎ তার কথাটাই মনে পড়ে গেল। তুমি একবার তার খোঁজ নাও।'

হরিসাধন এবার সামান্য বিরক্ত হয়েই বলল, 'খোঁজ নেব মানে?'

সত্যসিন্ধু মৃদু হেসে বলল, 'ঘটকালির আগাম ব্যাপারটা তুমিই করো। খোঁজ নাও ছেলেটি এখনো বেকার কিনা। যদি বেকার থাকে তাহলে তোমাদের কলেজের কোনো ফাংসনে তাকে দিয়ে অভিনয় করাও। ধরো হ্যামলেটের কোনো নির্বাচিত সিনে অভিনয় করল। কলেজের ফাংসনের জন্য যদি ডোনেশন লাগে তাহলে তা-ও দেওয়া যাবে। তবে আমার নাম কাউকে ডিসক্লোজ করা চলবে না।'

হরিসাধন কোনো উত্তর দিল না। সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে বুঝতে চেষ্টা করল।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'তোমার কাছ থেকে এটুকু সহযোগিতা নিশ্চয় আশা করতে পারি?'

সত্যসিন্ধু উঠে দাঁড়াল। যেন তার কথা শেষ হয়ে গেছে।

হরিসাধন এবার রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো, গবেষক? তুমি ছেলেটির নাম ঠিকানা বললে না, অথচ তার খোঁজ করব?'

'ওহো, নাম-ঠিকানা!' কথাটা বলে কতকটা হতাশভাবে বসে পড়ল সত্যসিন্ধু।

তারপর নিঃশব্দে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

'নাম-ঠিকানা ভুলে গেছ বুঝি? কিন্তু তুমি তো ভুলবার পাত্র নও, হে। একবার যা শোনো তা-তো ভোলো না।' হরিসাধনের চোখে কৌতূহল।

সত্যসিন্ধু চোখ বুজেই বলল, 'ইয়েস দেবরাজ। ছেলেটির নামের সঙ্গে দেবরাজের নামের মিল আছে।'

হরিসাধন সত্যসিন্ধুর কোনো কিছু মনে রাখার পদ্ধতিটা জানে। তাই সহজেই বলল, 'কি নাম, ইন্দ্র?'

সত্যসিন্ধু ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ইন্দ্র। কিন্তু এর সঙ্গে আর একটা কি যেন যুক্ত আছে।'

হরিসাধন সোৎসাহে বলল, 'নাথ? আই মিন, ইন্দ্রনাথ?'

'উঁহু।' মাথা নাড়ল সত্যসিন্ধু। বলল, 'দ্যাটস লিঙ্কড্ উইথ শরৎচন্দ্র। নট নাথ।'

—তাহলে 'জিত'? ইন্দ্রজিত?

—নাঃ।

সোজা হয়ে বসল সত্যসিন্ধু। তার ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসি খেলে গেল। বলল, 'ইটস নীল। ইন্দ্রনীল। আই মিন, ইন্দ্রনীল রায়। রাস্তার নাম মহিম হালদার স্ট্রীট। নাম্বার সাতও হতে পারে, সতেরোও হতে পারে। তোমাকে কষ্ট করে বের করে নিতে হবে। অভিনয়ের প্রপোজাল তুমিই দিও। আমি ফোন করে সব জেনে নেব। কি পারবে তো?'

'তুমি যখন বলেছো তখন পারতেই হবে।' হাসল হরিসাধন।

সত্যসিন্ধু উঠে পড়ল এবার। হরিসাধনের হাসির উত্তরে হেসেই বলল, 'আমি জানতাম, তোমার সহযোগিতা আমি পাবই।'

কথাটা বলেই বেরিয়ে গেল সে। হরিসাধনের জবাবের জন্য অপেক্ষা করল না।

## ॥ পাঁচ ॥

ইন্দ্রনীল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। বয়েস পঁচিশ। বছর দুই হল এম. এ. পাশ করেছে। কিন্তু এখনো চাকরি জোটাতে পারেনি। নিখাদ বেকার এখনো।

বি. এ. পাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ডজন খানেক ইন্টারভ্যু দিয়েছে। কিন্তু তার নীটফল হয়েছে শূন্য। বেকারত্ব

ঘোচেনি। ঘুচবে যে এই আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। অন্ততঃ ইন্দ্রনীল নিজে এখন আর তেমন আশাবাদী নয়।

ইন্দ্রনীলদের পরিবার এক সময় কালীঘাটে খুবই অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই। তিন পুরুষ ধরে জায়গা জমি বিক্রী করতে করতে এবং শরীকী ভাগ হতে হতে ইন্দ্রনীলদের অংশে এখন খান চারেক ঘরের একটা ভাঙা চোরা দোতলা বাড়িতে এসে ঠেকেছে।

ইন্দ্রনীলের অন্য কোনো দায়-দায়িত্বও তেমন একটা নেই। একটা মাত্র বোন। বছর পাঁচেক হল তার বিয়ে হয়ে গেছে। ঘর-বর নিয়ে সে সুখী। বাবা অনিমেষ এখনো চাকরি করছে। এক সরকারী অফিসের মাঝারী কেরাণী। ভদ্রলোক নেহাতই ভালো মানুষ। কারো সাতে পাঁচে থাকে না। লোকের সঙ্গে মেলামেশাও খুব কম। চাকরি, নিজের সংসার আর পুজো-আরচা, এই নিয়েই তার জীবন। ইন্দ্রনীলের মা-ও ঠিক একই রকম। শান্ত, সংযত, ধর্মপরায়না।

ইন্দ্রনীলের স্বভাবটা কিন্তু একেবারে অন্য রকমের। সে দারুণ মিশুকে। চুটিয়ে আড্ডা মারে। সব চেয়ে বড় কথা, ইন্দ্রনীল মঞ্চে অভিনয় করতে ভালোবাসে। অভিনয় করেও খুব। এ-ব্যাপারে তার যথেষ্ট প্রশংসাও আছে। অপেশাদারী দল থেকে প্রায়ই ডাক আসে তার। সেই সূত্রে সে মাঝে মাঝেই কলকাতার বাইরে যায়। তার মা বাবার একেবারেই ইচ্ছে নয় যে সে অভিনয় করে। তবু সে করে। মা বাবার অবাধ্য হয়েই করে।

ইন্দ্রনীলের মধ্যে উদ্ধত ভাব একেবারেই নেই। সে অসংযতও নয়। বরং তাকে শান্তই বলা যায়। তবে শান্ত হলেও তার সাহসের অভাব নেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পিছপা হয় না কখনো।

আপাততঃ সে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কথা ভাবছে না। মঞ্চে বা ফিল্মে সফল শিল্পী হওয়ার কথাও না। তার মাথায় এখন কেবল চাকরির ভাবনা ঘুরছে। বাবার আর মাত্র বছর

দুই চাকরি আছে। এরপর অবসর। এর মধ্যে চাকরি না পেলে খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হবে তাকে। অর্থে টান তো পড়বেই। অতএব চাকরি তার চাই-ই। যত শিগগির সম্ভব। কিন্তু চাকরির বাজারে যা মন্দা চলছে কবে যে চাকরি পাবে তার কোনো ঠিক নেই। তাই মাঝে মাঝেই একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেও হতাশ ভাবেই একা ঘরে বসে ছিল ইন্দ্রনীল। প্ল্যানচেটের একটা বই উল্টে পাল্টে দেখছিল। এই প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা তার মাথায় কিছুদিন হল চেপে বসেছে। অবিশ্যি ব্যাপারটা আপনাআপনি তার মাথায় চেপে বসেনি। ওর বন্ধু সুকুমারের মাধ্যমে এটা এসেছে। কয়েক দিন সুকুমার এবং সে প্ল্যানচেটে বসেওছে। কিন্তু সফল হয়নি। আবারো একদিন বসবে বলে ভেবে রেখেছে ইন্দ্রনীল। কবে বসবে তা' অবিশ্যি ঠিক করেনি।

হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল সুকুমার। তার হাতে চাকরির একটা ইন্টারভ্যু লেটার। সে ঢুকেই বলল, 'বি প্রিপেয়ার্ড, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড। এক্ষুনি প্ল্যানচেটে বসব। একটা ইণ্টারভ্যু দিয়ে এলাম। প্ল্যানচেট করে দেখব সফল হতে পারব কিনা।'

ইন্দ্রনীলের মনটা চনমনে হয়ে উঠল। সে রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই বিব্রতভাবে বলল, 'কিন্তু প্ল্যানচেট করবি কি দিয়ে? সেই সব জিনিষ-টিনিষ এনেছিস?'

—সব এনেছি। আমার ব্যাগে আছে। তুই আগে দরজা জানলা বন্ধ কর। ঘরটা অন্ধকার করে দে। তারপর মোমবাতি জ্বাল।

ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল। লাইট নিবিয়ে দুটো মোমবাতি জ্বালল। তারপর একটা টেবিলের সামনে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল দুজন।

এবার সুকুমার তার ব্যাগ থেকে বের করল পাতলা কাঠের তৈরী পান পাতার আকারের এক ছোট্ট তে-পায়া। তিনটে পায়ায় তিনটে ছোট ছোট চাকা লাগানো। এই চাকাগুলোর সাহায্যে তে-পায়াটা

এদিক-ওদিক নড়াচড়া করতে পারে। পানপাতার কাঠের মাঝখানে একটা ফুটো। এই ফুটোর ভেতরে একটা পেন্সিল ঢোকানো।

তে-পায়াটা একটা সাদা কাগজের ওপর রাখল সুকুমার। পেন্সিলের ডগাটা ছুঁয়ে রইল কাগজটাকে।

সুকুমার এবং ইন্দ্রনীল দুজনেই আলতো করে তে-পায়াকে স্পর্শ করল। ইন্দ্রনীল অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'কাকে আনবি ?'

—ভাবছি, ঠাকুর্দার আত্মাকে আনব। আমাদের দুজনকেই উনি ভালোবাসতেন। ওঁকে আনাই সুবিধে।

ওরা দুজনে একমনে ঠাকুর্দার কথা স্মরণ করতে লাগল। আধো অন্ধকার ঘরে ওদের নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন আর কোনো শব্দই যেন নেই।

কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই ওদের মনে হল, প্ল্যানচেটের তে-পায়াটা যেন সামান্য নড়ছে। একটা পিঁপড়ে যেমন করে এগোয় প্ল্যানচেটের তে-পায়াটা যেন ঠিক তেমনিভাবে গুটিগুটি করে এগোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের শরীরের ভেতর রক্ত-স্রোত দ্রুত হল।

সুকুমার ফিসফিস করে বলল, 'ঠাকুর্দা আপনি কি এসেছেন ?'

সুকুমারের প্রশ্নে প্ল্যানচেটের তে-পায়ার কোনো পরিবর্তন হল না। বরং যেটুকু নড়াচড়া হচ্ছিল তা-ও যেন বন্ধ হয়ে গেল।

সুকুমার আবার বলল, 'ঠাকুর্দা চুপ করে আছেন কেন, কিছু বলুন। যা' হোক কিছু।'

ইন্দ্রনীল ততক্ষণে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। প্ল্যানচেট সম্বন্ধে তার বিশ্বাস তেমন গভীর নয়। তবু একটা অদম্য কৌতূহল তাকে তখন তাড়া দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'আমার চাকরি কবে হবে ? আর কত দিন দেরী ?'

তে-পায়াটা আবার যেন একটু নড়ে উঠল। আর ঠিক তখনই বাইরে কারো ডাক শোনা গেল, 'ইন্দ্রনীল বাড়ি আছ ?'

ইন্দ্রনীল গলা শুনে মানুষটাকে চিনবার চেষ্টা করল। গলাটা চেনাও মনে হল, কিন্তু কোথায় শুনেছে চট করে মনে করতে পারল

না। সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও দিল না।

এদিকে প্ল্যানচেটের টেবিলও স্থির। ওরা দুজনেই তখন প্ল্যানচেটের জবাব পাবার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বাইরের দরজায় আবার ডাক শোনা গেল, 'ইন্দ্রনীল বাড়ি আছ?'

এবার ডাকের সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দও শোনা গেল। অতএব সাড়া না দিয়ে আর বসে থাকা যায় না। প্ল্যানচেটের জিনিষপত্র সামনে রেখেই ইন্দ্রনীল সাড়া দিল, 'আসছি।'

বাইরে বেরিয়ে যাকে দেখল তাকে সে একেবারেই আশা করেনি। ওদের ইংরেজীর অনার্স ক্লাসের অধ্যাপক। হরিসাধন নন্দী।

হঠাৎ অধ্যাপক নন্দী কেন তার কাছে এলেন ইন্দ্রনীল তা কিছুতেই ভেবে পেল না। এতদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাছাড়া হরিসাধনবাবুর তার বাড়ি চেনার কথাও না। তাহলে?

তাহলে কি চাকরি-বাকরির সন্ধান এনেছেন হরিসাধনবাবু!

ইন্দ্রনীলেব বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠল।

ইন্দ্রনীলকে দেখেই হরিসাধন চিনতে পারল। চেনা মুখ। এক সময় তার ক্লাসেরই ছাত্র ছিল। ক্লাসে শেকস্‌পীয়ার থেকে আবৃত্তি করত। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনত ওর আবৃত্তি। হরিসাধনের মনে হল, ইন্দ্রনীলের নামটা তার মনে রাখা উচিত ছিল।

ইন্দ্রনীল হরিসাধনের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'স্যার আপনি! বাড়ি চিনলেন কি করে? আসুন, ভেতরে এসে বসুন।'

হরিসাধন ইন্দ্রনীলকে আশীর্বাদ করতে করতে মৃদু হেসে বলল, 'আবার পায়ে হাত কেন? আজকাল এসব আছে নাকি?'

একটু থেমে বলল, 'তা' করছিলে কি?'

ইন্দ্রনীল সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'প্ল্যানচেট।'

হরিসাধন অবাক হয়ে বলল, 'প্ল্যানচেট? বলো কি।'

ইন্দ্রনীল ভারি অস্বস্তিতে পড়ল। কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'আমার এক বন্ধুর প্ল্যানচেটের হবি আছে। ওর সঙ্গেই দু' একদিন—। তবে

সাকসেসফুল হইনি কখনো।'

একটু থেমে যোগ করল, 'চাকরি-বাকরি না পেলে যা' হয়। এসব ফ্রাস্ট্রেসনের ফল। তা আপনি ভেতরে এসে বসুন না।'

হরিসাধন বলল, 'হ্যাঁ, একটু বসতেই হবে। তোমার সঙ্গে দুটো ব্যক্তিগত কথা আছে।'

ইন্দ্রনীল হরিসাধনকে ঘরে বসাল। সুকুমার ঘরে বসেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। কিন্তু এবার সে উঠে দাঁড়াল।

সুকুমার এবং ইন্দ্রনীল এক কলেজের ছাত্র না। ওরা স্কুল জীবনের বন্ধু। কাজেই হরিসাধনের সঙ্গে সুকুমারের পরিচয় ছিল না। সে তাই আর অপেক্ষা না করে বিদায় নিল।

সুকুমার চলে যেতেই হরিসাধন কাজের কথায় চলে এলো। প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'ইন্দ্রনীল, তুমি কি কোথাও চাকরি-বাকরি করছো না?'

ইন্দ্রনীল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'না স্যার এখনো কিছুই জোটাতে পারিনি।'

ইন্দ্রনীলের উত্তরে হরিসাধনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তাহলে তো ঠিকই আছে।'

ইন্দ্রনীলের বুকের মধ্যে ক্ষীণ আশার আলোটা আবার জ্বলে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'স্যার আপনার হাতে কোনো চাকরির সন্ধান আছে নাকি?'

—না। আপাতত নেই। তবে পেতেও পারি। পেলে নিশ্চয় তোমায় জানাব।

ইন্দ্রনীল নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কোনো উত্তর দিল না।

হরিসাধন আবার বলল, 'আজ তোমার কাছে এসেছি অন্য একটা প্রোপোজাল নিয়ে। সামনেই আমাদের কলেজের স্যোসাল ফাংশন। তুমি ওখানে একস্ স্টুডেন্ট হিসেবে অভিনয় করবে। তুমি তো আগেও শেকস্পীয়ার থেকে ভালো রিসাইট করতে। এখনো এখানে ওখানে স্টেজে অভিনয় করো। তাই আমাদের অনেকেরই ইচ্ছে

তুমি এবার আমাদের কলেজ-সোস্যালে পারটিসিপেট করো। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?'

—আপত্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা আমাকে মনে রেখে অফার দিচ্ছেন, এ-তো আমার গর্বের বিষয়।

হরিসাধন হেসে বলল, 'গর্ব এক তরফা নয়। তুমিও আমাদের গর্ব। এই যে আমাদের কলেজের ছাত্রী নীলাঞ্জনা মিত্র নাচে নাম করেছে, বিভিন্ন জায়গায় প্রাইজ পাচ্ছে, এর জন্যে তো আমাদেরও গর্ব।'

—নীলাঞ্জনা মিত্র ? হ্যাঁ, নামটা কাগজে দেখছিলাম বটে। অল ইণ্ডিয়া ডান্স কমপিটিশনে কথকে ফার্স্ট হয়েছে।

—এই তো তুমিও মনে রেখেছো। বলো, এটা আমাদের গর্বের বিষয় না ? সেই রকম তোমার অভিনয়ের প্রশংসাও আমরা শুনি। শুনে আমাদের ভালো লাগে।

হরিসাধনের প্রশংসায় ইন্দ্রনীলের মুখ আরক্ত হল। সে কোনো উত্তর দিতে পারল না।

কথা হল, হ্যামলেট থেকে একটা দৃশ্য অভিনীত হবে। এর জন্যে নিয়মমতো রিহার্সাল দেবে ইন্দ্রনীল।

পরদিন চারটের সময় হরিসাধন সত্যসিন্ধুকে ফোন করল। ইন্দ্রনীলের সম্মতির খবরটা পেয়ে সে খুশি হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ অধ্যাপক। ইটস রিয়াল হেল্প। আর একটা কথা। নীলাঞ্জনা এবং ইন্দ্রনীল এই তুজনের কাছে তুজনের প্রশংসা করতে হবে। এমনভাবে যেন কেউ মনে করতে না পারে যে, তুমি কারো নির্দেশ মতো এটা করছো। ও-কে ?'

—তা করব। তুমি যখন বলছো তখন নির্দ্বিধায় করতে পারি। কিন্তু এসব কেন করব তা' তো বুঝতে পারছি না।

সত্যসিন্ধু সামান্য শব্দ করে হেসে উত্তর দিল, 'এইটুকু বলতে পারি, মাই প্রমিথিউস ইজ স্টিল বাউণ্ড। নো হারকিউলিস আনবাইণ্ড্স হিম ইয়েট।'

—তুমি কি হারকিউলিসের মতো প্রমিথিউস-এর মুক্তির ব্যবস্থা করছো।

—আই এ্যাম জাস্ট-ট্রাইং। এ্যাজ ইউ নো আই এ্যাম এ সিম্পল গবেষক। এ্যাণ্ড নট হারকিউলিস। আমার মনের মধ্যে শেলীর সেই কথাটা ঘুরে বেড়ায়, 'Tis love, All love'।

—বুঝলাম, প্রমিথিউস, যাকে মানবতার প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, তার মুক্তির জন্যে তুমি জোর লড়াই শুরু করতে চাইছো। অফকোর্স, ইন ইওর ওউন ওয়ে, আই মিন বুদ্ধির লড়াই। তোমার কেসের সঙ্গে তাহলে মানবতার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে?

—বেশিরভাগ সামাজিক ব্যাধির সঙ্গে মানবতার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে। এই কেসটার সঙ্গেও আছে। এনি ওয়ে তুমি আমার কথাটা মনে রেখো। দিস ইজ ভেরি ইমপরট্যাণ্ট।

—মনে রাখব। সেই সঙ্গে আশা করব, তোমার প্রমিথিউস খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে। লেট ইওর প্রমিথিউস বি আনবাউণ্ড ভেরি সুন।

হরিসাধন ফোনটা রেখে দিল।

পরদিন কলেজে গিয়েই হরিসাধন খোঁজ নিল নীলাঞ্জনার। সে সেকসন বি-র ছাত্রী। ক্লাসের শেষে মেয়েটিকে সে নিজের ঘরে ডেকেও পাঠাল।

হরিসাধন নিজের ঘরে বসে খাতা দেখছিল তখন। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়াল নীলাঞ্জনা। সামান্য সময় দেখল অধ্যাপক নন্দীকে। তারপর সহজ গলায় বলল, 'স্যার আমায় ডেকেছেন?'

নীলাঞ্জনার কথায় মুখ তুলে তাকাল হরিসাধন। এত কাছ থেকে মেয়েটিকে এই প্রথম দেখল সে। তাছাড়া বিশেষ করে দেখার জন্য খুঁটিয়ে দেখেনি কখনো। এখন মুখ তুলে তাকিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মেয়েটিকে।

নীলাঞ্জনার পরনে চুড়িদার পাজামা এবং চাপা পাঞ্জাবী। ফর্সা গায়ের রঙ। মিষ্টি মুখশ্রী। মসৃণ চুল টপ নট করে বাঁধা। প্লাক

করা সুন্দর ভুরু। সবচেয়ে সুন্দর চোখ দুটো। এমন টান টান চোখে অনায়াসেই অসংখ্য অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যেতে পারে :

হরিসাধন লক্ষ্য করল. নীলাঞ্জনার হাতে কানে বা গলায় কোনো অলঙ্কার নেই। কেবল ডান হাতে একটি দামী বিদেশী ঘড়ি।

নীলাঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে হরিসাধন অনুভব করতে চেষ্টা করল, কোনো দুষ্ট চক্রের সঙ্গে সে জড়িত কিনা, কিংবা কোনো দুষ্ট চক্রের শিকার কিনা। কিন্তু মেয়েটির মুখ-চোখ দেখে হরিসাধন কিছুই বুঝতে পারল না। আর পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মধ্যে যে স্বাভাবিকতা থাকে ওর মধ্যেও তা-ই লক্ষ্য করল। কোনো ব্যতিক্রম নয়। চোখের কোথাও কোনো উত্তেজনার প্রকাশ নেই। হরিসাধন মনে মনে বলল, সত্যসিন্ধু হয়তো কোথাও ভুল করছে।

নীলাঞ্জনা এবার সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'স্যার আমায় কিছু বলবেন ?'

—হ্যাঁ। বসো। কথা আছে।

মৃদু হেসে বলল হরিসাধন।

নীলাঞ্জনা কুণ্ঠিতভাবে বসল। তার চোখের কোণে কৌতূহল খেলা করতে লাগল।

হরিসাধন হাসি মুখেই আবার বলল, 'আমার এক বন্ধু তোমার নাচের খুব প্রশংসা করছিলেন। বন্ধুটি এক সময় কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। এখন অবিশ্যি অধ্যাপনা করেন না। একটা জটিল বিষয়ের ওপর গবেষণা করছেন। সেই বন্ধুটি আমাদের কলেজের সোস্যালে তোমার নাচ দেখতে আসবেন। তা' তুমি এবারেও পারটিসিপেট করছো তো ?'

নীলাঞ্জনা মাথায় একটা দোলা দিয়ে বলল, 'কেন করব না ? আমাকে বললে নিশ্চয়ই করবো।'

—তাহলে আমি এখনই সবার হয়ে তোমাকে বলে দিচ্ছি। তুমি এবার একটা ভালো নাচ কমপোজ করো। আমার এই বন্ধুটি খুবই রসিক। তাকে ভালোভাবে ইম্প্রেস করা চাই। তাছাড়া এবার

একটি খুব গুণী ছেলেও আমাদের সোস্যালে পারটিসিপেট করছে। তুমি ইন্দ্রনীল রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয় ?'

'ইন্দ্রনীল রায় ?' নীলাঞ্জনা নামটা নিয়ে জিবে কয়েকবার নাড়াচাড়া করল। কিন্তু মনে করতে পারল না।

হরিসাধন নিজেই বলল, 'ইন্দ্রনীল আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। ইংরেজীতে এম. এ.। শেকস্‌পীয়ারের নাটকে ভালো অভিনয় করে। আসলে ছেলেটি সব দিক দিয়েই ভালো। আমি তাকে খুবই ভালোবাসি। তাকে দেখে, আই মিন, তার অভিনয় দেখে তোমারও ভালো লাগবে। আমার বন্ধুটি তো ইন্দ্রনীলের অভিনয়েরও খুব ভক্ত।'

নীলাঞ্জনা সামান্য নড়েচড়ে বসে বলল, 'আপনার বন্ধুর কি নাম ?'

—তার আসল সাম অনিন্দ্য সেন। তবে গবেষক হিসেবে সে ছদ্মনাম ব্যবহার করে। ওর সঙ্গে তোমার একদিন পরিচয় করিয়ে দেব। অনিন্দ্য ইজ ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার। সে আমার বছর তিনেকের জুনিয়ার। স্টিল উই আর ফ্রেণ্ডস। যে-কোনো দিন তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে।

– আচ্ছা স্যার।

নীলাঞ্জনা সামান্য সময় অপেক্ষা করে বলল, 'তাহলে এখন উঠি স্যার ?'

হরিসাধন সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'শেলীর প্রমিথিউস আনবাউণ্ড পড়েছ ?'

নীলাঞ্জনা বেশ লজ্জায় পড়ল। তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে ছেলেমানুষের মতো ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'না স্যার পড়িনি।'

হরিসাধন নীলাঞ্জনার উত্তরটা শোনার প্রয়োজন বোধ করল না। কতকটা আপন মনে বলতে লাগল, 'আমার এই গবেষক বন্ধুটিও কবি শেলীর মতো আদর্শ সমাজের কথা ভাবতে ভালোবাসে। এমন এক সমাজ যেখানে ঈর্ষা থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না। থাকবে কেবল

ভালোবাসা। গবেষক প্রায়ই নিজের মনে আবৃত্তি করে,—

"Music is in the sea and air,
Winged clouds soar here and there,
Dark with the rain new buds are dreaming of :
'Tis love, all love"

হরিসাধন চুপ করল।

নিঃশব্দে কাটল কয়েকটা সেকেণ্ড।

হরিসাধনের কথা শুনতে শুনতে নীলাঞ্জনার মধ্যে অদ্ভুত এক জগতের সৃষ্টি হল। সে নিঃশব্দে নিজের মনে আওড়াল, 'Tis love, all love।' কতকটা ঘোরের মধ্যে। স্পষ্ট করে কোনো কিছু না ভেবেই।

নীলাঞ্জনার অন্যমনস্কতা অধ্যাপকের দৃষ্টি এড়াল না। তবে সে কোনো মন্তব্য করল না। সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা, এখন তাহলে এসো।'

নীলাঞ্জনা দরজা অবধি গিয়ে আবার ঘুরে এলো। সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে বলল, 'ইন্দ্রনীল রায় আমাদের সোস্যালে কি করছেন, ইংরেজী নাটক?'

—'সম্ভবতঃ। শেকস্পীয়ারের কোনো নাটকের অংশও হতে পারে। সঙ্গে আমাদের কলেজের দু'একজন ছাত্র থাকতে পারে।'

নীলাঞ্জনা আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হয়তো এ-রকম কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক হয়নি ভেবেই তার লজ্জা হয়ে থাকবে। তাই দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল।

কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্যে একটি নামী হল ভাড়া করা হয়েছিল। সেই ভাড়া করা হলের গ্রীনরুমে বসে মেক-আপ নিচ্ছিল নীলাঞ্জনা। মেক-আপ নেওয়া নীলাঞ্জনার মধ্যে সেদিনের সেই পাজামা-পাঞ্জাবী পরা আধুনিক মেয়েটিকে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ যেন অন্য কোনো মেয়ে। শান্ত লজ্জাবনতা কোনো

আশ্রম-বালা।

নীলাঞ্জনা তখন পরিপূর্ণ শকুন্তলা। অন্তরে এবং বাইরে। পতি দুষ্মন্তের গৃহে যাত্রার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত সে। তার সমস্ত চেতনা এখন পতি প্রেমের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার নৃত্যভাবনা নীলাঞ্জনার নিজের মাথায় আসেনি। সে অন্য আরো সব নাচের কমপোজিসনের কথা ভেবেছিল। কিন্তু কোনোটাই তার মনে ধরছিল না। এমন সময় হরিসাধনবাবুই এই নৃত্যের আইডিয়াটা বললেন। অবিশ্যি এই আইডিয়াটা নাকি হরিসাধনবাবুর সেই গবেষক বন্ধুর। তা' আইডিয়া যারই হোক ব্যাপারটা মনে ধরেছিল নীলাঞ্জনার।

প্রথম দৃশ্যেই নীলাঞ্জনার নৃত্য। সে তাই গ্রীনরুমে বসে শকুন্তলার তাৎক্ষণিক অনুভূতি আনবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় তার দরজায় টোকা পড়ল।

নীলাঞ্জনা বাইরে বেরিয়ে দেখল, হরিসাধনবাবু দাঁড়িয়ে আছে। আর ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শেকস্‌পীয়ারের নাটক থেকে উঠে আসা এক চরিত্র। সেকালের রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদে মোড়া হুবহু সেই রাজকুমারের ছবি। রাজকুমার হ্যামলেট। শকুন্তলা রূপী নীলাঞ্জনার মনে হল, ইংরেজী কোনো ফিল্ম থেকে নায়ক হ্যামলেট সোজাসুজি তার সামনে এসে হাজির হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নীলাঞ্জনা বর্তমান পরিবেশ ভুলে গেল। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল হ্যামলেট রূপী ইন্দ্রনীলের দিকে।

একই রকম মুগ্ধতা ইন্দ্রনীলের চোখেও প্রকাশ পেল। সে-ও নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল নীলাঞ্জনার দিকে। সে-ও যেন অনুভব করল, কালিদাসের আশ্রম-কন্যা তার সামনে উপস্থিত।

ওদের চোখের মুগ্ধতা মিলিয়ে যাবার জন্য কয়েক সেকেণ্ড সময় দিল হরিসাধনবাবু। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। এ আমার প্রিয় ছাত্র ইন্দ্রনীল রায়। আপাততঃ প্রিন্স অব ডেনমার্ক। আর এ আমার প্রিয় ছাত্রী নীলাঞ্জনা মিত্র।'

দুজন দুজনের দিকে হাত তুলে নমস্কার করার মুহূর্তে অকারণ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠল দুজনেই।

অদূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সত্যসিন্ধু দেখল সব কিছু। দুজনের মধ্যে তার অভিপ্রেত মতো প্রতিক্রিয়া ঘটায় সে খুশি হল খুব। পরিচয়ের পালা চুকিয়ে হরিসাধন ফিরে এলে সত্যসিন্ধু বলল, 'ওয়েল ডান অধ্যাপক। ইট ওয়াজ দ্য প্রপার মোমেণ্ট। ওদের পরস্পরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত হতে পারত না। তুমি আমার কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছো। তুমি কালিদাস এবং শেকস্‌পীয়ারের মিলন ঘটালে।

হরিসাধন বলল, 'কেন এসব করছি তা' জিজ্ঞাসা করতে বারণ করেছো তাই করছি না। তবে কৌতূহল থেকেই যাচ্ছে।'

—ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু নো। কিন্তু এখন না। লেট প্রমিথিউস বি আনবাউণ্ড ফার্স্ট।

—আজ ওদের নাচ এবং অভিনয় দেখবে তো?

—তা' দেখব। তবে আজ পরিচয় নয়। পরিচয় অন্য কোনো দিন করা যাবে।

হরিসাধন ঘাড়ে সামান্য দোলা দিয়ে বলল, এ্যাজ ইউ লাইক।

মঞ্চে পর্দা সরে যেতেই এক সুন্দর আশ্রমিক পরিবেশ দর্শকের সামনে ভেসে উঠল। আশ্রম কন্যারা শকুন্তলাকে বিদায় জানাচ্ছে। শকুন্তলার আসন্ন বিদায়ের জন্য মানুষ এবং প্রকৃতি একই রকম শোকাচ্ছন্ন। অবোধ হরিণ শিশুটি পর্যন্ত তাকে যেতে দিতে চাইছে না। শকুন্তলার মনও চাইছে না এদের কাউকে ছেড়ে যেতে। তবু হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে পতির সঙ্গে মিলনের জন্য। একদিকে আশ্রমের টান, অন্যদিকে প্রেমের আকর্ষণ। এই দো-টানায় তার হৃদয় বিদীর্ণ। হৃদয়ের এই দো-টানার ভাবটা নীলাঞ্জনার নৃত্যের ভঙ্গিতে এবং তার মুখ-চোখের অভিব্যক্তিতে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠল।

কৌতূহলী ইন্দ্রনীল উইংস-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জনার নাচ দেখে মুগ্ধ হল।

নাচ শেষ হতেই হাততালির মধ্যে মঞ্চ পর্দার আড়ালে চলে গেল। মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসার সময় নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের মুখোমুখি হল। ইন্দ্রনীলের পরনে হ্যামলেটের পোষাক। একটা গানের পরেই তার দৃশ্য। সে মনে মনে প্রস্তুত। নীলাঞ্জনাকে দেখে বলল, 'আপনি স্যারের মান বাড়িয়েছেন। চমৎকার হয়েছে আপনার নাচ। তবে আমি কতদূর কি করতে পারব বুঝতে পারছি না।'

নীলাঞ্জনা আন্তরিকতার সঙ্গে বলল, 'আপনিও পারবেন। নিশ্চয় পারবেন। আমার বিশ্বাস, আপনার পারফরমান্স খুব ভাল হবে।'

মঞ্চের পর্দা আবার উঠল।

হ্যামলেটের একটা বিশেষ দৃশ্য। দেখা যাচ্ছে, রাজপ্রাসাদের একাংশ। হ্যামলেটের বেশে ইন্দ্রনীল পায়চারী করছে। সঙ্গে হোরাসিও, কলেজের আর একটি ছাত্র। তারা কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনায় রত। কিন্তু তাদের কথাবার্তা দর্শকদের কানে পৌঁছচ্ছে না। কারণ মাইকে তখন একটা ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই ঝড় হ্যামলেটের অন্তরের ঝড়ের প্রতীক।

হ্যামলেট এবং হোরাসিওর কথাবার্তা শোনা না গেলেও হ্যামলেটের বুকের জ্বালা তার অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

মাইকে ঝড়ের শব্দ সামান্য কম হতেই ঘোষকের কণ্ঠে শোনা গেল, "হ্যামলেটের পিতার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই তার মায়ের সঙ্গে তার কাকার বিয়ের ব্যাপারটা রাজকুমার হ্যামলেট কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। যদিও সে জানে এটাই দেশীয় রীতি। সে ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, কোথাও যেন কোনো গোলমাল আছে। অস্থিরতার মধ্যে তার দিন কাটছে।'

ঠিক এই সময় প্রাসাদের একদিকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে এক প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটল। হোরাসিও হ্যামলেটের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে বলল।

হোরাসিও—লুক, মাই লর্ড, ইট কামস।

হ্যামলেট—এ্যানজেলস্ এ্যাণ্ড মিনিস্টারস্ অব গ্রেস, ডিফেণ্ড আস!

প্রেতাত্মা মিলিয়ে গেল।

হ্যামলেট এবং হোরাসিও-র কথার মধ্যে ঝড়ের শব্দ বাড়তে লাগল। শব্দের তীব্রতায় ডুবে গেল ওদের কথাবার্তা। কেবল দেখা যেতে লাগল, দুজনের অঙ্গ-ভঙ্গি এবং মুখের অভিব্যক্তি। কিছুক্ষণের জন্যে মনে হল, যেন মূকাভিনয় চলছে।

হোরাসিও এক সময় উঠে গেল। মঞ্চে রইল হ্যামলেট একা। আর তখনই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল প্রেতাত্মা।

ঝড়ের শব্দ তখন অনেক কম। প্রেতাত্মাকে দেখে হ্যামলেট এগিয়ে গেল।

হ্যামলেট—এ্যালাস, পুওর গোষ্ট!

প্রেতাত্মা—পিটি মি নট, বাট লেণ্ড মি দাই সিরিয়াস হিয়ারিং টু হোয়াট আই শ্যাল আনফোল্ড।

বিদেহী আত্মা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল হোরাসিও। হ্যামলেট এবং হোরাসিওর মধ্যে আবার আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা গেল না। দেখা যেতে লাগল দুজনের মূকাভিনয়। কারণ, তখন মাইকে ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঝড়টা যেন হ্যামলেটের অন্তরের অবস্থাকেই প্রকাশ করছে।

অল্পক্ষণ পরেই হোরাসিও মঞ্চ থেকে প্রস্থান করল। মঞ্চে আবার আবির্ভাব ঘটল বিদেহী আত্মার।

বিদেহী আত্মা—আই এ্যাম দাই ফাদারস স্পিরিট।

কথাটায় চমকে উঠল হ্যামলেট। সঙ্গে সঙ্গে মাইকে বজ্রপাতের শব্দ শোনা গেল। যেন প্রচণ্ড দুঃখে হ্যামলেটের হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তার মুখে কোনো কথা ফুটল না।

সেই মুহূর্তে মাইকে ঝড়ের শব্দের সঙ্গে ঘোষকের গলাও ভেসে উঠল।

"এমনিভাবে যখন তার দিন কাটছে তখন একদিন হঠাৎ হ্যামলেটের পিতার বিদেহী আত্মা তার সামনে উপস্থিত হল। কেবল উপস্থিত হল না। উপস্থিত হয়ে তাকে যা বলল, তার মর্মার্থ, হ্যামলেটের পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তার পিতাকে খুন করা হয়েছে। খুন করেছে তার কাকা স্বয়ং। পিতা যখন নিদ্রিত তখন তার কানের ভেতর বিষ ঢেলে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। হ্যামলেটকেই নিতে হবে এই প্রতিশোধ। যেমন করে হোক।"

ঘোষকের কণ্ঠ থেমে গেল। ভেসে উঠল হ্যামলেটের পিতার বিদেহী আত্মা এবং হ্যামলেটের কণ্ঠস্বর।

বিদেহী আত্মা—লিষ্ট, লিষ্ট, ও লিষ্ট। ইফ দাউ ডিড্স্ট এভার দাই ডিয়ার ফাদার লাভ।

হ্যামলেট—ও, হেভেন!

বিদেহী আত্মা—রিভেঞ্জ হিজ ফাউল এ্যাণ্ড মোস্ট আন ন্যাচারাল মার্ডার!

হ্যামলেট—মার্ডার!

আত্মা—মার্ডার মোস্ট ফাউল।

আবার ঝড় এবং বজ্রপাতের শব্দ।

হ্যামলেট—ও, হরিব্ল। ও, হরিব্ল। মোস্ট হরিব্ল!

বিদেহী আত্মা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হ্যামলেট—ও, ভিলেন, ভিলেন, স্মাইলিং ড্যামড্ ভিলেন।...দ্যাট ওয়ান মে স্মাইল, এ্যাণ্ড স্মাইল, এ্যাণ্ড বি এ ভিলেন।...সো আঙ্কল্ দেয়ার ইউ আর।

হ্যামলেটের কথাটা বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। "দ্যাট ওয়ান মে স্মাইল, এ্যাণ্ড স্মাইল, এ্যাণ্ড বি এ ভিলেন। সো আঙ্কল্ দেয়ার ইউ আর।"

অভিনয় শেষ।

গ্রীণরুমে ইন্দ্রনীল একা। তখনো সে পোশাক পাল্টায় নি। হ্যামলেটের চরিত্রের কয়েকটা দিক তার মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। তাই খুবই অন্যমনস্ক।

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল নীলাঞ্জনা। ততক্ষণে সে পোশাক বদলে নিয়েছে, যদিও তখনও তার মুখে মেক-আপ। হয়তো মেক-আপের জন্যেই তাকে তখন আরো রোমান্টিক দেখাচ্ছিল।

ইন্দ্রনীল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের কাছাকাছি এসে সপ্রতিভভাবে বলল, 'দারুণ হয়েছে। সত্যিই চমৎকার।'

ইন্দ্রনীলের চোখে-মুখে খুশির ছটা ছড়িয়ে পড়ল। সে নীলাঞ্জনার চোখে চোখ রেখে বলল, 'সত্যি বলছেন? সত্যি ভালো লেগেছে আপনার?'

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, 'আপনি যখন বলছিলেন, ছাট ওয়ান মে স্মাইল, এ্যাণ্ড স্মাইল, এ্যাণ্ড বি এ ভিলেন', তখন, বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, আমার মনে হচ্ছিল, আমি চোখের সামনে এক ভয়ঙ্কর মানুষকে দেখতে পাচ্ছি।'

একটু থেমে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন মানুষ, যে হাসতে হাসতে খুন করতে পারে। আবার সে খুন করেও হাসি দিয়ে নিজেকে আড়াল করতে পারে। ভয়ঙ্কর, অথচ বাইরে সুন্দর।'

নীলাঞ্জনা সামান্য সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। যেন সে তার সামনে কোনো ভয়ঙ্কর সুন্দর মানুষকে দেখতে পাচ্ছে।

ইন্দ্রনীল চোখ সূক্ষ্ম করে সামান্য সময় তার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করল। তারপর বলল, 'আপনি এ-রকম কোনো মানুষকে চেনেন? স্মাইলিং ড্যাম্‌ড ভিলেন?'

'এঁ্যা!' একটু যেন চমকে উঠল নীলাঞ্জনা।

ইন্দ্রনীল কিন্তু নীলাঞ্জনার চমকানোটা লক্ষ্য করল না। সে সহজভাবেই বলল, 'কথাটা কিন্তু এমনিই বললাম।'

নীলাঞ্জনা চোখ দিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'ভাবছিলাম, বাস্তব জীবনে এ-রকম মানুষ তো থাকতেই পারে। বলুন পারে না?'

ইন্দ্রনীল হাসল। পরক্ষণেই হ্যামলেটের ভঙ্গি নকল করে বলল, 'মানুষ আর পশুতে এখানেই তফাৎ, হোরাসিও। পশু তার পশুত্ব লুকোতে পারে না। পশু জন্মেই পশু। কিন্তু মানুষ তার পশুত্ব লুকোতে পারে। আর সেই জন্যেই তো মানুষ পশুর চেয়ে বড়। এ্যাণ্ড সো দেয়ার আর মোর থিঙ্স ইন হেভেন এ্যাণ্ড আর্থ।'

ইন্দ্রনীল শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসল নীলাঞ্জনাও। মুখে হাসির জের রেখেই বলল, 'আপনি দারুণ মজা করে কথা বলতে পারেন তো। মানুষ তার পশুত্ব লুকোতে পারে বলেই পশুর চেয়ে বড়। সত্যি আশ্চর্য ব্যাখ্যা। রিয়্যালী প্রেজ-ওয়ার্দি।'

গ্রীনরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথা আড়ি পেতে শুনছিল সত্যসিন্ধু। ওরা কিন্তু তা' লক্ষ্যই করল না। সত্যসিন্ধু অবিশ্যি ওইটুকু শুনেই সরে পড়ল ওখান থেকে।

নীলাঞ্জনা আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলা হল না। বাধা পড়ল।

এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে ঘরে ঢুকল। তারা কলকলিয়ে উঠল, 'নীলাঞ্জনা, তোকে প্রিন্সিপ্যাল ডাকছেন। ইন্দ্রনীলদা, আপনাকেও।'

'কেন? ব্যাপার কি?'

দুজনেই প্রায় একসঙ্গে কথাটা বলল।

উত্তরে সবাই বলল, 'আপনাদের অভিনয় এবং নাচ দেখে সবাই খুব খুশি। তাই দেখা করতে চাইছেন।'

অতএব যেতে হল।

যাবার মুহূর্তে ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা পরস্পরের দিকে তাকাল। মুহূর্তের জন্য তাদের মনে হল, তারা যেন কত কালের চেনা। সেই কালিদাস-শেকস্‌পীয়ারের যুগ থেকেই।

## ॥ ছয় ॥

এক সপ্তাহ পর।

পাড়ার একটা ছোট চায়ের দোকানে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল ইন্দ্রনীল। সঙ্গে পাড়ারই বন্ধু-বান্ধব। রাজনীতি-নাটক-সিনেমা অনেক কিছুই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেখানে। যেমন সব আড্ডাতে হয়ে থাকে।

কথায় কথায় একটি ছেলে ইন্দ্রনীলকে বলল, 'বুঝলি ইন্দ্র, আমার যদি তোর মতন চেহারা থাকত, তাহলে লড়িয়ে দিতাম সিনেমায়।'

তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'চাকরি-বাকরি তো হবে না। তবু যদি অভিনয় ক্ষমতা আর চেহারাটা থাকত।'

সামান্য সময়ের জন্য গম্ভীর হয়ে গেল ইন্দ্রনীলও। তারপর কতকটা অন্যমনস্কের মতো বলল, 'চাকরির কথা ভাবতে আমারো আর ভালো লাগে না। মিছিমিছিই এম. এ পাশ করেছি।'

ইন্দ্রনীলের কথা শেষ হতে না হতেই ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে অচেনা কারো গলার স্বর গম গম করে উঠল।

'বাঙালীর কিস্সু হবে না। ঘরকুনো বাঙালী টুকটুক করে টেঁসে যাবে।'

সবাই গলার স্বর লক্ষ্য করে তাকাল। সবাই দেখল, এক ভদ্রলোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসছে। ভদ্রলোকের চোখে ক্যালো চশমা। পরনে কোট-প্যান্ট-টাই। মাথায় একরাশ কাঁচা-পাকা চুল। ছুঁচলো গোফ। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তার মুখ তখনো ইন্দ্রনীলের দিকেই ফেরানো।

ভদ্রলোকের কথার উত্তরে ইন্দ্রনীল কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইন্দ্রনীলের কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক আবার বলল, 'বাঙালী উইল স্টার্ভ, স্টার্ভ টু ডেথ।'

কথাটা বলে চায়ের দোকানের বয়কে ডেকে বলল, 'খোকা আগে এক গ্লাস প্লেন ওয়াটার দাও তো। খুব জল তেষ্টা পেয়েছে।'

ইন্দ্রনীলরা নিঃশব্দে ভদ্রলোককে দেখতে লাগল।

লোকটি নির্বিকারভাবে হাতের এ্যাটাচি সামনের টেবিলে রাখল। এ্যাটাচি থেকে কিছু কাগজ-পত্র বের করল। তার ভাবখানা এমন যেন তার আশপাশে আর কেউ নেই। যেন সে নিজের ঘরে বসেই কাজকর্ম করছে।

ইন্দ্রনীল আর থাকতে পারল না। যথেষ্ট ভদ্রতার আবরণ রেখেই সে বলল, 'একস্‌কিউজ মি। আপনি ও-কথা বললেন কেন? বাঙালি উইল স্টার্ভ টু ডেথ।'

ভদ্রলোক মুখ তুলল ইন্দ্রনীলের দিকে। তার কপালে সামান্য কুঞ্চন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে হাসি দেখা দিল। বেশ শান্ত-সংযত কণ্ঠে বলল, 'কেন বললাম জানেন? বাঙালি ভীতু বলে। কেবল ভীতুই বা বলি কেন, যথেষ্ট সন্দেহপ্রবণও। ফলে জীবনে সে কোনোরকম রিস্ক নিতে পারে না। তা' তারা না খেয়ে মরবে না তো কি করবে? ঘর-কুনো বাঙালি।'

লোকটি আবার নিজের কাজে মন দিল। মুখে-চোখে এমন একটা ভাব আনল যেন এর পর আর কোনো কথাই থাকতে পারে না।

ইন্দ্রনীলের মাথায় কেমন একটা জেদ চেপে গেল। সে বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'আপনি ঠিক বলছেন না। বাঙালি ঘরকুনো, এই বদনাম এখন আর নেই।'

'নেই?' ভুরু কুঁচকোলো লোকটি। তারপর বলল, 'কত উদাহরণ চান?'

ইন্দ্রনীল বিরক্ত হয়ে বলল, 'একটা উদাহরণও চাই না। আমি কেবল নিজের কথা বলতে পারি। আমি ভদ্রস্থ মাইনে পেলে যে-কোনো জায়গায় যেতে পারি। আমার কোয়ালিফিকেশন, এম. এ. ইন ইংলিশ।'

একটু থেমে যোগ করল, 'দেবেন আমাকে একটা চাকরি?'

ভদ্রলোক একটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনীলের দিকে। কালো চশমার আড়ালে তার চোখের অভিব্যক্তি অবিশ্যি বোঝা গেল না।

ইন্দ্রনীল মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করে বলল, 'জানি পারবেন না। যা পারেন না, পারবেন না, তা' নিয়ে বড় বড় কথা বলেন কেন? কেনই-বা একটা জাতির সম্বন্ধে বাজে কথা বলেন? কখনো এসব বলবেন না।'

কিন্তু এরপর ভদ্রলোক যা করলেন তার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না।

ভদ্রলোক দ্রুত হাতে এ্যাটাচি কেস থেকে একটা ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা বের করল। কাগজটা সেদিনেরই। কাগজটার ওয়াণ্টেড কলমের একটা জায়গায় লাল ডটপেনে দাগ দেওয়া রয়েছে। ভদ্রলোক সেই জায়গাটা দেখিয়ে ইন্দ্রনীলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এ স্মার্ট এ্যাণ্ড এডুকেটেড ইয়ংম্যান লাইক ইউ ইজ রিকোয়ার্ড হিয়ার। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনি যদি চান, আপনাকে চাকরিটা করে দিতে পারি। তবে অবশ্যই চাকরিটা বাইরে। কলকাতা কেন, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। ভেবে দেখুন।'

কথাটা বলে কাগজটা একরকম ছুঁড়েই দিল ইন্দ্রনীলের দিকে।

ইন্দ্রনীল এবং অন্যান্যরা ঝুঁকে পড়ল কাগজটার ওপর। পোষ্ট বক্সের ঠিকানা দেওয়া বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের ভাষা মোটামুটি এইরকমঃ একটি চালু দেশী কোম্পানীর এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের জন্য স্মার্ট ইয়ংম্যান প্রয়োজন। অবশ্যই এম. এ. হতে হবে। অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। থাকতে হবে প্রতাপগড়ে। ফ্রি কোয়ার্টার। সম্মানজনক বেতন। প্রতাপগড় এলাহাবাদ থেকে খুব একটা দূরে নয়। পারটিকুলার্স দিয়ে লিখুন।'

ভদ্রলোক ব্যঙ্গের হাসি মুখে ঝুলিয়ে বলল, 'দূরত্বের কথা ভেবে নিশ্চয়ই পিছিয়ে যাচ্ছেন? অথচ দেখুন সব কিছুই আপনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই যেতে পারতেন। তবে জায়গাটা

সত্যিই শহর থেকে দূরে।'

ইন্দ্রনীলও একটা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতেই বলল, 'আমি এ্যাপলাই করবো। তবে টাকা-পয়সা দিতে পারব না। অন প্রিন্সিপ্‌ল।'

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ পেল। একটু উত্তেজিত ভাবেই বলল, 'ঘুষের কথা বলছেন? ড্যাম ইট। এ-রকম সন্দেহের কোনো মানে হয় না। এনি ওয়ে আপনি যদি এ্যাপলাই করতে চান তাহলে আমাকে আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে দিন।'

একটু থেমে যোগ করল, 'আপনাকে দেখে, আপনার কথাবার্তা শুনে ভালো লাগল তাই—।'

'কেবল ভালো লাগা? অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই তো!'

ইন্দ্রনীলের মনের মধ্যে আবার একটা সন্দেহ উঁকি দিল। সামান্য পিছিয়ে গেল সে। মনে মনে বলল, কি জানি কি হতে কি হয়। তাই প্রশ্নটা না করে পারল না সে।

ভদ্রলোক পিঠে পিঠে উত্তর দিল, 'উদ্দেশ্য আছে বৈকি! যোগ্য লোককে যোগ্য কাজে দেওয়ার স্যাটিসফ্যাকসন নেই?'

কথাটা বলেই বয়কে ডেকে বলল, 'টোস্ট এবং কড়া চা।'

টোস্ট এবং চা এল। ভদ্রলোক নিঃশব্দে টোস্ট এবং চা খেল। দাম চুকিয়ে কাগজটা ফেরৎ নিয়ে কতকটা আপন মনেই বলল. 'সুযোগ বার বার আসে না। ইট ডাজন্‌ট কাম টোয়াইস।'

ভদ্রলোক এ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ইন্দ্রনীলের বন্ধুরা চাপা গলায় বলল, 'ইন্দ্র, তোর নাম ঠিকানা দিয়েই ছাখ্‌না।'

ইন্দ্রনীল দ্বিতীয়বার ভাববার অবসর পেল না। সে বলে উঠল, 'স্যার আপনি চলে যাচ্ছেন? আমার নাম-ঠিকানা নিয়ে গেলেন না? সত্যিই আমি এ্যাপলাই করব।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে বসে পড়ল। ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর একটু হলেই আমার ক্যালকুলেশন উল্টেপাল্টে দিচ্ছিলেন। আপনাকে আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতো মনেই

হয়নি। অথচ—। তাহলে দিন আপনার নাম-ঠিকানা। আই গিভ ইউ ওয়ার্ড।'

ইন্দ্রনীল তাড়াতাড়ি একটা কাগজে নাম-ঠিকানা লিখে দিল।

ভদ্রলোক কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে বলল, 'খবরের কাগজটা আপনার কাছেই থাক। আর হ্যাঁ, আমার নামটা মনে রাখবেন। বি. সমাদ্দার। ইয়েস বি ফর বিকাশ।'

সত্যি সত্যি চাকরিটা হয়েই গেল ইন্দ্রনীলের। এ্যাপলাই করার মাসখানেকের মধ্যে বাড়ির ঠিকানায় এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার চলে এল। মাইনে স্টার্টিং দেড় হাজার টাকা।

এতটা আশা করেনি ইন্দ্রনীল। সে ভেবেছিল, বড়জোর ইন্টারভ্যু পাবে। আর যদি চাকরি পায়ও মাইনে সামান্যই। সেই জায়গায় মাইনে দেড় হাজার। সঙ্গে কোয়ার্টার, ইন্দ্রনীল সত্যি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

এক মাসের মধ্যে জয়েন করতে হবে। বাইরে যাবার আগে কিছু কেনাকাটা না করলে নয়। দিন-দুই মার্কেটিং করতেই চলে গেল ইন্দ্রনীলের। সেদিনও লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে কি একটা কিনতে গিয়েছিল সে। হঠাৎ কে যেন একেবারে কানের কাছে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এই যে হ্যামলেট, এখানে কি?'

ইন্দ্রনীল একরকম চমকেই ফিরে তাকাল। তাকিয়ে দেখল, পেছনে নীলাঞ্জনা। সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আরে শকুন্তলা, আপনি!'

হ্যামলেটের উত্তরে 'শকুন্তলা' বলায় জোরে হেসে উঠল নীলাঞ্জনা। ওর হাসিতে ইন্দ্রনীলও যোগ দিল।

নীলাঞ্জনার অনতিদূরে আরো তিনটি মেয়ে হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। ওদের দেখিয়ে নীলাঞ্জনা বলল, 'জানেন, আমরা আপনাকে মনে মনে খুব খুঁজছিলাম।'

—মনে মনে বলছেন কেন?

—এখনো আপনার বাড়িতে যাইনি বলে।

—আমার ঠিকানা জানেন ?

—পেতে অসুবিধে হবে না। প্রফেসর নন্দী জানেন।

—কিন্তু প্রয়োজনটা কি ?

—মাসখানেক বাদে রবীন্দ্রসদনে আমাদের একটা নৃত্যনাট্য আছে। সেই অনুষ্ঠানে বিদেশের কিছু কিছু লোক থাকবে। ঠিক-ঠাক করতে পারলে বিদেশে কল-শো পাওয়া যেতে পারে।

ইন্দ্রনীল হেসে বলল, 'আমাকে দেখতে যাওয়ার কথা বলছেন। তা' না হয় যাওয়া যাবে।'

'আরে না না, তা নয়। ভাবছিলাম সেদিন আপনারও হ্যামলেটের শো রাখলে কেমন হয় ? হ্যামলেটের গুটিকয়েক সিলেকটেড সিন আর কি !'

ইন্দ্রনীল চোখের কোণ দিয়ে নীলাঞ্জনাকে একবার দেখল। সেই সঙ্গে দেখল বাকী তিনটি মেয়েকে। এদের ঝকঝকে চেহারা দেখলে বুঝতে দেরী হয় না যে, এরা পয়সাওয়ালা ঘরের মেয়ে। নাচ-গান এদের নেশাই বলা যেতে পারে। হুজুগ বললেও ভুল বলা হয় না। মনে মনে তাই হাসল সে। বলল, 'আপনি কি আমার ব্যাপারে সিরিয়াস ? নাকি পথে দেখা হয়ে গেল তাই।'

কথাটায় আহত হল নীলাঞ্জনা। বলল, 'আপনি কি-রকম প্রমাণ পেলে আমাকে সিরিয়াসলি নেবেন ?'

'না না, প্রমাণের প্রশ্ন উঠছে না।'

'তবু বলি। শুনুন। গতকাল নন্দী স্যারের হাতে আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েছি। তাতে আমরা লিখিতভাবে আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছি। স্যার আমাদের এই ব্যাপারটাকে খুব ভালোভাবে নিয়েছেন।'

'মাই গুডনেস ! আপনি এতদূর এগিয়েছেন ?' অবাক হল ইন্দ্রনীল।

নীলাঞ্জনা সামান্য সময় চুপ করে রইল। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সত্যি, আপনার অভিনয় অদ্ভুত। হ্যামলেটের

ওই দৃশ্যটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। মনে হয়, ওই দৃশ্যটা আমাকে যেন হন্ট করছে। একদিন তো স্বপ্নই দেখেছি! রিয়্যালি!'

ইন্দ্রনীল বেশ আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হেসে বলল, 'আপনি খুব ইমোশনাল তো।'

নীলাঞ্জনা একটু সময় চুপ করে কি ভাবল। তারপর বলল, 'এটা ইমোশন কিনা ঠিক বলতে পারব না। আসলে হ্যামলেটের জন্য আমার যত না কষ্ট হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হয়, হ্যামলেটের বাবার বিদেহী আত্মার জন্য। বেচারার কি কষ্ট! মৃত্যুর পরেও শান্তি নেই।'

ইন্দ্রনীল চোখ সূক্ষ্ম করে নীলাঞ্জনাকে একবার দেখল। তারপর বলল, 'তার মানে, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন।'

নীলাঞ্জনা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'ভূত-প্রেতের প্রশ্ন না। এটা চেতনার প্রশ্ন। অনুভূতির ব্যাপার।'

একটু হেসে যোগ করল, 'অবিশ্যি আমি ভূত-প্রেত বিশ্বাসও করি না। আবার ঠিক যে অবিশ্বাস করি তা-ও না। আসলে এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানাই নেই।'

নীলাঞ্জনার কথা ইন্দ্রনীলের মনে রেখাপাত করল। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিল না। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কেবল।

নীলাঞ্জনা মাথায় একটা ঝটকা মেরে এবার বলল, 'যাকগে। আসল কথায় আসুন। আমাদের প্রস্তাবের কি করবেন?'

—দেখি।

—'দেখি না। আপনাকে রাজী হতেই হবে।

ইন্দ্রনীল সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, 'কিন্তু আমি ক'দিন পরেই বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে হয়তো দেরিই হবে।'

ইন্দ্রনীল চাকরির ব্যাপারটা বলল না। আসলে তখনো চাকরিটা সম্বন্ধে তার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটাকে অজুহাত হিসেবেই ধরে নিল। তাই গলায় সামান্য আবদারের সুর মিশিয়ে

বলল, 'ওসব আমি জানি না। আপনাকে আমাদের দলে আসতেই হবে।'

বাকি তিনটি মেয়েও কাছে সরে এসে কলকলিয়ে উঠল, 'আপনি আমাদের দলে এলে সত্যিই ভালো হবে। আমরা সবাই আপনাকে চাই।'

ইন্দ্রনীল এবার খুবই অস্বস্তিতে পড়ল। তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবার জন্য বলে উঠল, 'যত শিগগির সম্ভব আপনাদের ওখানে যাব।'

নীলাঞ্জনা ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে ইন্দ্রনীলের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আমাদের দলের কার্ড। রেখে দিন। তাছাড়া হরিসাধনবাবুর কাছ থেকেও আমার চিঠিটা নিয়ে নেবেন। ওঁর কাছ থেকে চিঠিটা নিতে আপনার কোনো অসুবিধে নেই তো?'

'অসুবিধে? অসুবিধে থাকবে কেন?' হাসল ইন্দ্রনীল। পরক্ষণেই যোগ করল, 'আমি নিশ্চয় যাব।'

বলতে বলতে কার্ডের ওপর চোখ রাখল সে। দেখল, সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন অক্ষরে লেখা, "শিল্পাঙ্গন।" ঠিকানা রাসবিহারী এভিন্যু।

ইন্দ্রনীল কার্ডের ওপর চোখ রেখেই বলল, 'নামটি বেশ।'

আপনাকে কিন্তু আশা করছি। আমরা সপ্তাহে তিনদিন সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা ওখানে থাকি। কেবল ছুটির দিন ঘণ্টা দেড়েক সময় বেশি। আপনাকে পুরো সময় থাকতে হবে না। আপনার কাজের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন হবে ততটুকুই।'

নীলাঞ্জনা এমনভাবে কথাগুলো বলল, যেন সে ধরেই নিয়েছে ইন্দ্রনীল যাচ্ছে।

নীলাঞ্জনা বিদায় নিল। তারপর সবাই একসঙ্গে দ্রুত পায়ে রাস্তা পার হল।

ইন্দ্রনীল এতক্ষণে লক্ষ্য করল, রাস্তার ওপারে একটা গাড়ি পার্ক করা আছে। সাদা রঙের ঝকঝকে এ্যামবাসাডর। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একটি বেঁটে-খাটো লোক। তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ইন্দ্রনীলের দিকে।

নীলাঞ্জনা গাড়ির কাছাকাছি যেতেই লোকটি গাড়ির দরজা খুলে দিল। ওরা সবাই উঠে পড়ল গাড়িতে।

ইন্দ্রনীল এপারের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল ওদের।

লোকটি গাড়ির দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল। এবং গাড়ি স্টার্ট করার মুহূর্তে একই রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আবার তাকাল ইন্দ্রনীলের দিকে। যেন ইন্দ্রনীলকে বুঝে নিতে চাইছে লোকটি।

ইন্দ্রনীল অনুভবে বুঝল. লোকটি নীলাঞ্জনার মাইনে করা ড্রাইভার। কিন্তু একজন ড্রাইভারের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দৃষ্টি তার ভাল লাগল না। সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নীলাঞ্জনার দৃষ্টি পড়ল তার দিকে। নীলাঞ্জনা সহাস্যে হাত নাড়ল। প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল ইন্দ্রনীলও।

গাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ইন্দ্রনীল এগিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল।

'ক'টা বাজে ভাই?'

ইন্দ্রনীলের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন একজন ভদ্রলোক। তাঁর মুখে ধবধবে সাদা লম্বা দাড়ি। এক মাথা সাদা চুল। নাকের পাশে একটা মস্ত বড় আঁচিল। চোখে স্টিলের ফ্রেমের চশমা। পরনে ধুতি, গায়ে গলা বন্ধ লম্বা সুতির কোট। হাতে একটা লাঠি।

ইন্দ্রনীল ভদ্রলোককে একবার দেখেই ঘড়ির সময়টা বলে দিল।

ভদ্রলোক কিন্তু ঘড়ির সময় শুনেই চলে গেলেন না। ইন্দ্রনীলের উত্তরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বড় দুঃখ ভাই।'

কথাটা বলে কোটের পকেট থেকে একটা সিগার এবং দেশলাই বের করে বললেন, 'সিগারটায় একটু দেশলাই জ্বেলে দেবে? হাতটা বড় কাঁপে, তাই ঠিকভাবে জ্বালতে পারি না।'

ইন্দ্রনীল বাক্য ব্যয় না করে দেশলাই জ্বেলে সিগার ধরিয়ে দিল।

ইন্দ্রনীল সিগারটা ধরিয়ে সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'দুঃখ কিন্তু আমার জন্য না। দুঃখ নীলার জন্য।

নীলা, মানে নীলাঞ্জনা। আমার নাতনি। মেয়ের ঘরের। আমরা কেউ চাই না যে, নীলা প্রফেসনাল ডান্সার হোক।'

ইন্দ্রনীল এতক্ষণে বৃদ্ধের কথার অর্থ বুঝল। সে তাই বলল, 'আপনারা বারণ করলেই পারেন?'

'বারণ? কত বারণ করেছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? ওর এক জেদ। চির-কুমারী থেকে সুর-তাল-লয়ের সাধনা করবে।'

'সত্যি!' কথাটায় খুব অবাক হল ইন্দ্রনীল।

ভদ্রলোক এবার গাঢ় স্বরে বললেন, 'বড়লোকের মেয়ে তো, তাই জেদটা বেশি। কারো কথা শুনতে চায় না। কিন্তু আমার সব সময় ভয়, কোনো অসৎ সঙ্গে পড়ে যায় কিনা। আমি তাই ওকে ছায়ার মতন অনুসরণ করি।'

একটু থেমে ইন্দ্রনীলের দিকে করুণ চোখে তাকালেন। তারপর গোপন কিছু বলার ভঙ্গিতে নিম্নস্বরে বললেন, 'আপনি ওর বন্ধু। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন, ওর ভালো হোক। আপনিও ওকে বলুন না, প্রফেসনাল ডান্সার যেন না হয়। বলুন, এ-সব দল-টল করে কি হবে? তবে হ্যাঁ, আমার কথা যেন কক্ষনো বলবেন না। ঘুণাক্ষরেও না। তাহলে কিন্তু হিতে বিপরীত হবে। জেদী মেয়ে তো!'

ভদ্রলোক ইন্দ্রনীলের চোখে চোখ রাখলেন। একটু চুপ করে বললেন, 'কি, বলবেন তো?'

ইন্দ্রনীল কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'দেখি।'

'হ্যাঁ, দেখবেন। প্লিজ।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে বললেন, 'এখন তাহলে আসি, ভাই। পরে আবার দেখা হবে।'

ট্যাক্সিতে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ইন্দ্রনীল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ইন্দ্রনীলের সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বাড়ি ফিরেও

অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ। পর পর ঘটনাগুলোকে মনে মনে সাজাল সে।

সেদিন সন্ধ্যায় হরিসাধনবাবুর হঠাৎ আগমন এবং কলেজ সোশ্যালে অভিনয়ের প্রস্তাব। নীলাঞ্জনার সঙ্গে পরিচয় এবং তার আজকের প্রস্তাব। তাছাড়া প্রতাপগড়ে এমন একটা লোভনীয় চাকরি। ইন্দ্রনীলের মনে হল, কোনো অলৌকিক শক্তি যেন অযাচিতভাবে তাকে সব কিছু যুগিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু এতগুলো ঘটনা সত্ত্বেও আজকের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আচরণ তার কাছে খুবই অভিনব বলে মনে হয়েছে। ভদ্রলোক হয়তো তাঁর নাত্‌নিকে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক জায়গায় অনুসরণ করেন না। তবে মাঝে-মধ্যে নিশ্চয় করে থাকেন। গাড়ি অথবা ট্যাক্সি করে।

হয়তো আজো সেইভাবেই নীলাঞ্জনাকে অনুসরণ করেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু ভদ্রলোক ইন্দ্রনীলকেই বা হঠাৎ এসব কথা বলতে গেলেন কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে, ভাবল সে, নীলাঞ্জনা বাড়িতে 'ইন্দ্রনীলের কথা কিছু বলেছে। এমন কিছু, যা থেকে ঘনিষ্ঠতা বোঝায়।

ইন্দ্রনীলের ইচ্ছে হল, তখনই ছুটে গিয়ে নীলাঞ্জনাকে বলে, সে সর্বক্ষণের জন্য তাদের দলে থাকবে।

নীলাঞ্জনা তাকে যখন যেখানে যেতে বলবে তখনই সেখানে যাবে। এই মুহূর্তে প্রতাপগড়ের চাকরির কথাটা বেমালুম ভুলে যেতে চাইল সে।

কিন্তু চাকরির কথা ভুলে যেতে চাইলেই ভুলে যাওয়া যায় না। ইন্দ্রনীলের মা ছেলের চাকরির চিঠি আসার পর কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। বাবা দিন গুনছেন, ছেলে কবে নতুন চাকরিতে জয়েন করবে। ছেলে দূরে যাবে বলে মা-বাবার মনে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি একটা সুখের অনুভূতিও আছে।

এই অবস্থায় প্রতাপগড়ের চাকরির কথা ভুলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইন্দ্রনীল তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, প্রতাপগড়ে

চাকরিতে সে জয়েন করবে ঠিকই, তবে বেশীদিন সেখানে থাকবে না। কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবে কলকাতায়। তারপর নীলাঞ্জনার দলে যোগ দেবে। নীলাঞ্জনাকে সে কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। কিছুতেই না।

কলকাতায় ফিরে এসে একটা চাকরি কি জুটিয়ে নিতে পারবে না? যে-কোনো একটা চাকরি। যে কোনো মাইনের।

ইন্দ্রনীল নীলাঞ্জনার চোখ দুটো মনে করতে চেষ্টা করল। না, ওই চোখ দুটোতে কোথাও কোনো ফাঁকি নেই। বরং কি একটা ব্যথা যেন লুকিয়ে আছে।

ইন্দ্রনীল স্থির করল, প্রতাপগড়ে যাবার আগে নীলাঞ্জনার কাছ থেকে মাস দুয়েকের সময় চেয়ে নেবে সে। তারপর চুটিয়ে অভিনয়। দু'জনে এক দলে থেকে।

ইন্দ্রনীল একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যে অশান্ত চিন্তাটা এতক্ষণ তার মাথার মধ্যে উথালি-পাথালি করছিল, এইবার সেটা যেন অনেকটা থিতু হল।

## ॥ সাত ॥

নীলাঞ্জনাদের এণ্টালির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সত্যসিন্ধু মুন্সী। এই ক'দিন নীলাঞ্জনাকে অনুসরণ করে করে সে জেনে নিয়েছে নীলাঞ্জনা কখন বাড়িতে থাকে আর কখন থাকে না। কখন কোথায় যায় তা-ও সে জেনে গেছে। বাড়িতে কে-কে আছে তা-ও এখন তার অজানা নয়। নীলাঞ্জনা ছাড়া বাড়িতে থাকে একজন ঝি, একজন চাকর, এবং ড্রাইভার সূর্যকুমার। আর থাকে জানকীমাঈ। এই মহিলাই নীলাঞ্জনাকে মেয়ের মতো মানুষ করেছে! সত্যসিন্ধুর প্রয়োজন এই জানকীর কাছেই।

সত্যসিন্ধু এমন একটা সময় বেছে নিয়েছে যখন বাড়িতে জানকী-মাঈ ভিন্ন আর কেউ থাকে না। এই সময় নীলাঞ্জনা যায় নাচের

রিহার্সালে। ড্রাইভার সূর্যকুমার যায় নিজস্ব আড্ডায়। আর ঝি-চাকর বিকেলের হাওয়া খেতে বেরোয়।

সময়টা গোধূলি।

নীলাঞ্জনাদের বাড়িটা ছোট্ট হলেও দেখতে সুন্দর। বাড়িটাকে দেখলেই বোঝা যায়, পুরোনো বাড়িকে ভেঙে রি-মডেল করা হয়েছে। বাড়িটাকে যে যত্নে রাখা হয় তারও স্বাক্ষর রয়েছে সর্বত্র। দেওয়ালে শ্বেতপাথরের ওপর লেখা—'অরুণাভ-সুমিত্রা হাউস।'

সত্যসিন্ধু দরজায় কলিং বেল টিপতেই ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। সামান্য পরেই দরজায় এক মহিলার আবির্ভাব ঘটল।

মহিলার বয়েস পঞ্চাশের ওপারে। কালো রঙ। মুখশ্রী দেখলেই বোঝা যায়, বিহার-উত্তর প্রদেশের দেহাতী মহিলা। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে তার কোনো ছাপ নেই। যেন বাঙালী ঘরের বধূ। শাড়ি-ব্লাউজ থেকে শুরু করে চুল বাঁধার ঢঙ—সব কিছুই বাঙালী গৃহবধূর মতন।

মহিলাকে দেখে সত্যসিন্ধু আন্তরিকতার সঙ্গে হেসে দু'হাত তুলে বলল, 'নমস্কার। আপনি তো নীলাঞ্জনার জান্‌কীমাঈ ?'

জান্‌কীর ভুরু সূক্ষ্ম হল। সামান্য সময় সত্যসিন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক। নীলা আমাকে মাঈ বলে ডাকে। জান্‌কীমাঈ। কিন্তু আপনি ?'

মহিলার বাঙলা উচ্চারণেও কোনো ত্রুটি নেই!

সত্যসিন্ধু সামান্য মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে বলল, 'আমি ওর প্রফেসর। ওর কলেজের।'

জান্‌কী এবার বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, 'আপনি ওর প্রফেসর! কিন্তু নীলা তো এখন বাড়ি নেই। তাছাড়া ওর ফিরতেও দেরি হবে।'

সত্যসিন্ধু সহাস্যে বলল, 'নীলার সঙ্গে আমার রোজই দেখা হচ্ছে। আমি আসলে ওর কাছে আসিনি। আমি এসেছি আপনার কাছেই।'

'আমার কাছে ?' জান্কীর চোখে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

সত্যসিন্ধু বেশ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আপনাকে ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করব।'

একটু থেমে সে যোগ করল, 'মানে, আপনি তো নীলাকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছেন। এখন চারদিকে নীলার এত সুনাম। আমার তাই জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কি করে নীলাকে এমন করে গড়ে তুললেন। এত স্নেহ আপনি কোথায় পেলেন ? আপনার মাতৃত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

সত্যসিন্ধুর কথায় জান্কীর চোখে সামান্য জলের আভাস প্রকাশ পেল। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ভেতরে আসুন। এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয় ?'

সত্যসিন্ধু এই আমন্ত্রণের অপেক্ষাতেই ছিল। সে জান্কীর কথার পিঠে পিঠে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

একতলায় ড্রইংরুম। আকারে বেশ বড়ই।

ড্রইংরুমটা দামী সোফাসেট, টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্রে পরিপাটি করে সাজানো। দরজা দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়ে সামনের দেওয়ালে একটা বড় অয়েল-পেইন্টিং। ডান দিকের দেওয়ালে দুটো বড় সাইজের ফটো। দামী ফ্রেমে আঁটা। তাছাড়া সুদৃশ্য কর্ণার টেবিলের ওপর রাখা ফটো-স্ট্যাণ্ডে আরো একটা ফটো।

সত্যসিন্ধু ঘরে ঢুকে প্রথমে অয়েল পেইন্টিং-এর দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে বলল, ছবিটা অনেক দিনের পুরোনো, তাই না ? সম্ভবতঃ নীলাঞ্জনার ঠাকুর্দার বাবার ?'

সত্যসিন্ধুর অনুমানে খুশি হয়ে জান্কী হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। ছবিটা মিত্র-সাহেবের ঠাকুর্দার। মিত্র-সাহেব কে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ?'

উত্তরটা অবিশ্যি সে নিজেই দিল। বলল, 'মিত্র-সাহেব হলেন নীলাঞ্জনার বাবা অরুণাভ মিত্র।'

ফটো দুটোর একটির দিকে আঙুল দেখিয়ে সত্যসিন্ধু বলল, 'ইনিই

অরুণাভ মিত্র ? নীলাঞ্জনার বাবা ?'

—হ্যাঁ। আমরা বড় সাহেব বলি।

—আর ইনি নিশ্চয় নীলাঞ্জনার মা ?

অন্য ফটোর দিকে আঙুল তুলে বলল সত্যসিন্ধু।

জানকীমাঈ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? বসুন। আপনার জন্যে চা আনি।'

সত্যসিন্ধু এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে আগের কথার জের টেনেই বলল, 'মা-র মুখের সঙ্গে নীলাঞ্জনার মুখের তো খুব মিল।'

সত্যসিন্ধুর এই কথায় জানকীমাঈ বেশ কৌতুক বোধ করল। সামান্য হেসে কোণের টেবিলের ওপর রাখা ফটো স্ট্যাণ্ডের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এটা কার ফটো বলুন তো ?'

ফটোটা নৃত্যের ভঙ্গিতে দাঁড়ানো একটি মেয়ের। মেয়েটির বয়েস সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। এক চমক দেখলে ফটোটা নীলাঞ্জনার বলে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ভুলটা ধরা পড়ে। ফটোটা যে নীলাঞ্জনার মা সুমিত্রাদেবীর সেটা বুঝতে তখন অসুবিধে হয় না। সত্যসিন্ধুরও বুঝতে অসুবিধে হল না। তবে সে বুঝেও না বোঝার ভান করে জানকীমাঈর কৌতূহলে সামান্য ইন্ধন জোগাল। সহজ গলায় বলল, 'এটা তো নীলাঞ্জনার ফটো। ওর বয়েস তখন আরো কম ছিল।'

সত্যসিন্ধুর কথায় জানকী সামান্য শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর বলল, 'অনেকেই ভুল করে। ওটা আসলে বৌদিমনির ছবি।'

—সত্যি আশ্চর্য রকমের মিল তো।—সত্যসিন্ধু আবার তাকাল ফটোটার দিকে। ফটোর দিকে চোখ রেখেই বলল, 'ফটোটা দেখে মনে হচ্ছে, নীলাঞ্জনার মা-ও নাচ জানতেন ? সত্যি নাকি ?'

জানকী চোখ টান টান করে বলল, 'কেবল জানতেন বললে অল্প বলা হয়। উনি খুব ভালো নাচতেন। অনেক প্রাইজ আছে। কলকাতা—বেনারস এলাহাবাদ এসব জায়গায় অনেক নেচেছেন। তবে এসব বিয়ের আগে। বিয়ের পর উনি নাচ ছেড়ে দিয়েছিলেন।'

জান্‌কীর কথার মধ্যেই সত্যসিন্ধু একটা সোফায় বসে পড়ল এবং জান্‌কীকে চোখের ইশারায় বসতে বলল। জানকীও কথা বলতে বলতে বসে পড়ল।

জান্‌কীর কথা শেষ হতেই সত্যসিন্ধু প্রশ্ন করল, 'তার মানে ছেলেবেলায় মায়ের কাছ থেকেই নীলাঞ্জনা নাচ শিখেছিল ?'

—জি ?

প্রশ্নটা শুনে জান্‌কী একটু যেন থতিয়ে গেল। সামান্য সময় কি একটু ভাবল। তারপর বলল, 'নীলা বৌদিমনির কাছে নাচ শেখেনি, এ-কথা আমি বলতে পারি না। আবার শিখেছে সে-কথাও বলা যাবে না।'

—মানে ?

—তিন বছরের মেয়ে কতটুকু নাচ শিখতে পারে বলুন ? বৌদিমনি যখন মারা যায় তখন ওর বয়েস মাত্র তিন বছর।

সত্যসিন্ধু মুখে অস্ফুট শব্দ করে বলল, 'বলেন কি ? তিন বছর বয়েসে নীলা ওর মাকে হারিয়েছে ?'

সত্যসিন্ধুর কথাটা অজানা ছিল না। সঞ্জয়ের কাছ থেকে সে অনেক কিছুই জেনেছে। তবু সে এমন ভাব করল যেন কথাটা প্রথম শুনছে।

জান্‌কীর চোখ সজল হয়ে এলো। সে অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

সত্যসিন্ধু এক দরদী বন্ধুর মতো প্রশ্ন করল, 'কি অসুখ করেছিল ?'

জান্‌কীমাঈ সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইল কয়েক সেকেণ্ড। কয়েক সেকেণ্ড কাটবার পর নিজেই বলল, 'কোনো অসুখ-বিসুখ না। মানুষটা নিজের শাড়িতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল।'

এটাও সত্যসিন্ধুর জানা। সঞ্জয়ের কাছ থেকে পুলিশের রিপোর্টের কপি সে পড়েছে। কিন্তু এটাও সে না জানার ভান করল। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'আত্মহত্যা ? ইস্! এমন ফুলের মতো দেখতে।'

কথাটা বলে ফটো স্ট্যাণ্ডের দিকে আবার তাকাল সত্যসিন্ধু। সেই দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'কি এমন দুঃখ ছিল যে তাকে আত্মহত্যা করতে হল ?'

জান্‌কী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করল না।

সত্যসিন্ধু ফটোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না। কথায় কথায় এসে পড়ল তাই জিজ্ঞাসা করছি। আপনি বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, নীলাঞ্জনা আমার খুবই স্নেহের পাত্রী। আমি তার ভালো চাই।'

জান্‌কী একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কেন বুঝতে পারব না।'

একটু থেমে যোগ করল, 'এই এতটুকু বয়েস থেকে নীলাকে আমি মানুষ করেছি। নিজের মেয়ের মতো করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে জানতে চায়নি, এত স্নেহ আমি কোথায় পেলাম। কেউ আমার মাতৃত্বকে বড় করে দেখেনি। সবাই ভেবেছে, আমি কেবল টাকার জন্যেই এ-সব করেছি। কিন্তু আপনিই প্রথম মাতৃত্বের কথা তুললেন। বড় ভালো লাগল তাই।'

শেষের দিকে জান্‌কীর গলা ধরে এল।

সত্যসিন্ধু গলায় দরদের ছোঁয়া দিয়ে বলল, 'কিন্তু নীলা তো আপনাকে মায়ের মতোই ভালোবাসে! তাহলে দুঃখ থাকবে কেন ?'

জান্‌কীর চোখে-মুখে হাসির ছটা ছড়িয়ে পড়ল। সামান্য সময় চুপ করে থেকে অনুভব করল মাতৃত্বের সুখ। তারপর কেমন মমতা মাখা মুখে বলল, 'নীলার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। বাড়িতে তখন নীলার গভর্নেস ছিল। সে-ই তাকে পড়াতো। ভদ্রমহিলা নীলাকে ভালোওবাসত খুব। কিন্তু নীলার আমার কাছে না শুলে ঘুম হত না। দু'দণ্ড আমাকে না দেখলে কান্না পেত।'

একটু থেমে যোগ করল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ওর জন্যেই আমি আমার নিজের বাড়ির মায়া ছেড়েছি। বলতে পারেন, আমি অল্প বয়েসের বিধবা, নিজের ছেলে-মেয়েও নেই, তাই বাড়ির টান

থাকার কথা নয়। তবু তো নিজের বাড়ি। তার ওপর একটা আলাদা মায়া নেই? কিন্তু নীলার কথা ভেবে সে সব আমাকে তেমন টানে না।'

সত্যসিন্ধু নিঃশব্দে কৌতূহলী চোখ নিয়ে শুনতে লাগল জান্‌কীর কথা।

জানকী বলেই চলল, 'এই যে দেখছেন, আমি এমন বাঙলা বলছি, এ-ও কিন্তু নীলার জন্যেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি নীলার বাঙালি মা হব। ছোট সাহেবেরও ইচ্ছে ছিল, আমি নীলাকে পুরোপুরি বাঙালির মতো করে মানুষ করি। যেমন বৌদিমনি ছিলেন। তাই তিনি বাঙালি দিদিমনি রেখে আমাকে বাঙলা পড়িয়েছেন। তাদের আদব-কায়দা শেখার ব্যবস্থা করেছেন। তাছাড়া আমি নিজেও বাঙালিদের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক কিছু রপ্ত করেছি।

জান্‌কী হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি ছোট সাহেবের নাম বোধ হয় জানেন না?'

সত্যসিন্ধু স্মিত হেসে বলল, 'কেন জানব না? তিনিই তো নীলার গাজিয়ান। আপনি সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের কথা বলছেন তো?'

জান্‌কী দু'হাত কপালে তুলে ছোট সাহেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলল, 'বড় ভালো মানুষ। দেবতার মতো। নীলার কথা ভেবে উনি বিয়েই করলেন না। শুনেছি, উনি সন্ন্যাসী হতে হতে হননি। সন্ন্যাসী হননি যে তা-ও ওই নীলার মা-বাবার জন্যেই। ছোট সাহেব আর বড় সাহেব আপন ভাই না। তবু দুজনে আপন ভাই-এর চেয়েও বেশী ছিলেন। ছোট সাহেব সন্ন্যাসী হননি ঠিকই, তবে নিজে প্রায় সন্ন্যাসীর মতোই থাকেন।'

সত্যসিন্ধু সামান্য অবাক হয়ে বলল, 'সৌম্যেন্দুবাবু গেরুয়া পোশাক পরেন নাকি?'

—না, তা পরেন না। তবে সকালে উঠেই গীতা-চণ্ডী-পাঠ করেন। পুজো-টুজো করেন। সুযোগ পেলেই তীর্থে বেরিয়ে পড়েন। ভালো সাধু সন্ন্যাসীর খোঁজ পেলেই বাড়িতে ধরে আনেন,

সত্যসিন্ধুর চোখ সূক্ষ্ম হল। বলল, 'তার মানে সাধু-সন্ন্যাসীরা বাড়িতে থাকে ?'

—সব সময় না। তবে প্রায়ই কেউ না কেউ থাকে। তাদের সঙ্গে ছোট সাহেব শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন। মানুষের আত্মা নিয়ে আলোচনা করেন।

সত্যসিন্ধু হেসে বলল, 'মানুষের আত্মা ? মানুষ মরে যাবার পর কিছু থাকে বলে উনি বিশ্বাস করেন বুঝি ?'

জানকীমাঈ মাথা দুলিয়ে জোরের সঙ্গে বলল, 'কেন বিশ্বাস করবেন না ? জানেন উনি কি বলেন ? বলেন, মরার পরও মানুষ বেঁচে থাকে। এই যেমন আমরা বেঁচে আছি। তফাৎ কেবল, আমাদের তারা দেখতে পায় কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাই না।'

একটু থেমে বলল, 'এই তো কদিন আগে নীলাকে একটা চিঠি লিখেছেন। তাতেও এই ধরণের কত কি কথা লেখা আছে। দেখবেন চিঠিটা ? এই ঘরেই আছে। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি।'

সত্যসিন্ধু সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল। বলল, 'না থাক। অপরের চিঠি। অনুমতি না নিয়ে কারো চিঠি পড়া ঠিক হবে না।'

জানকী সামান্য হেসে বলল, 'অপরের চিঠি বলছেন কেন ? ওটা তো নীলার চিঠি। আর আমি ওর মা। মা কি মেয়ের পর ? তাছাড়া আপনি ওর গুরু। ওর ভালো চান। আপনাকে দেখানো কোন দোষের না।'

জানকী ছোট টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করল। তারপর খাম থেকে একটা কাগজ বের করে সত্যসিন্ধুর সামনে মেলে ধরল। খুব ছোট চিঠি নয়।

জানকী চিঠিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ছোট সাহেব পনেরো দিন অন্তর চিঠি লেখেন। তবে ছোট চিঠি। এই চিঠিটাও খুব একটা বড় নয়। এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন, নীলার নাচের প্রেরণা কোথায়।'

সত্যসিন্ধু চিঠিটা পড়তে লাগল, "নীলা তোমাকে নৃত্যে নাম

করতে হবে। অনেক অনেক নাম। সেই সঙ্গে লেখা-পড়াও চাই কিন্তু। এখানকার সব কিছু তো তোমাকেই সামলাতে হবে। তুমি জানো আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না। আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা তোমাকে ঘিরেই।

'আমি আগে অনেক বার বলেছি। আবার বলছি। আমি সংসারী হতে পারিনি, কিম্বা হতে চাইনি, নানা কারণে। তোমার মা-বাবার মৃত্যুর পর হয়তো সব কিছু ছেড়ে চলে যেতাম। কিন্তু সামনে এলে তুমি। তোমার ছোট দুটো হাত আমার পথ আটকে দিল। তোমার জন্যে আমার অন্য সব কিছু ভুলে যেতে হল। সংসারের কথা এবং সন্ন্যাস-ধর্মের কথা।

'তুমি জানো, সংসারে থেকেও আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর মতোই জীবনযাপন করি। কেন করি তা' কি জানো? তোমার মা অর্থাৎ মিতু-বৌঠানের কথা রাখার জন্যে।

"তুমি জানো, মিতু-বৌঠান আমাকে সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো বলে ডাকতেন। আমি তাঁর সেই ডাকের মর্যাদা রাখবার জন্যেই সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেছি। গৃহী-সন্ন্যাসী।

"জেনে রেখো, মৃত্যুর পরেও তোমার মা-র দৃষ্টি আমাদের ওপর আছে। আমি সেই দৃষ্টি অনুভব করতে পারি। আমি নিশ্চয় জানি, চেষ্টা করলে তুমিও অনুভব করতে পারবে। আমি তোমাকে বার বার বলেছি, মানুষ কেবল শারীরিক অস্তিত্বেই বাঁচে না। অশরীরী অস্তিত্বেও মানুষ বাঁচে।

"কায়াহীন মানুষের প্রভাব অনেক সময় আমাদের মনের ওপরে পড়ে। মৃত্যুতেই মানুষের সব শেষ হয় না। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের স্থূল শরীরটাই কেবল নষ্ট হয়।

"তুমি জেনে রেখো, তোমার মা আজো তোমার সুখে সুখী হয় তোমার দুঃখে দুঃখী হয়। তোমার গভীর দুঃখে তার আত্মা গভীর যন্ত্রনায় ছটফট করে।

"তোমার মা-র নামী নৃত্য-শিল্পী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।

কিন্তু তোমার বাবার জন্যে তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। তোমার বাবার এ-ব্যাপারে কোনো দোষ ছিল না, তা তুমি জানো। বহুবার আমি সে কথা বলেছি।

"বিয়ের পর নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই কতগুলো বাধা এসে পড়ে। তোমার মা-র সামনেও এ-রকম বাধা এসে পড়েছিল। নৃত্যশিল্পে বিয়েটাই বাধা। বিরাট বাধা।

"আমি জানি, তোমার মা মৃত্যুর পরেও চান, তার মেয়ে একজন নামী নৃত্যশিল্পী হোক। তোমার মধ্যে সেই গুণ, সেই ক্ষমতা আছেও। তাই তোমাকে বার বার, প্রত্যেক চিঠিতে, একই কথা বলি। একই কথা স্মরণ করিয়ে দি। তুমি থেমো না। তীব্র গতিতে এগিয়ে যাও। নৃত্যে তোমার খ্যাতি-মান-যশের মধ্যেই তোমার মা-র শান্তি নিহিত আছে।

"কাজেই চলার পথে তোমাকে খুবই সাবধানে পা ফেলতে হবে। জান্‌কীর কথামতো চলবে। জান্‌কীকে তোমার মা খুবই ভালো-বাসতেন। জান্‌কীই তোমাকে এত বড় করে তুলেছে।

আশীর্বাদ নিও।

সন্ন্যাসী-কাকা।

সত্যসিন্ধু চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকাল।

জান্‌কীর চোখে চোখ রেখে বলল, 'এই চিঠিটা না পড়লে অনেক কিছুই জানতে পেতাম না। সত্যি, একজনের বড় হওয়ার পেছনে কত মানুষের সহযোগিতাই না প্রয়োজন হয়।'

খুব আপন জনের মতো কথাটা বলল সত্যসিন্ধু।

জান্‌কী কোনো উত্তর দিল না। সে কেমন এক ভাবের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে রইল যেন।

সত্যসিন্ধু নিজেই আবার বলল, 'সবচেয়ে অবাক লাগছে আপনাদের ছোট সাহেবের কথা ভেবে। সত্যি অদ্ভুত মানুষ।'

জান্‌কী ভাবের জগত থেকে নেমে এল। সহজ গলায় বলল, 'হ্যাঁ, ছোট সাহেব সত্যিই অদ্ভুত মানুষ। এমন মানুষ আপনি লাখে

একটাও দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ।'

একটু থেমে জান্‌কী আবার বলল, 'তাহলে বুঝতে পারছেন নীলার নাচের প্রেরণা কে?'

সত্যসিন্ধু গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ বুঝতে পারছি। প্রথম প্রেরণা ওর মা। দ্বিতীয় প্রেরণা আপনি।'

—কিন্তু ছোট সাহেব না থাকলে কে ওর জন্যে এমন করে ভাবত বলুন তো? ছোট সাহেবের মতো মানুষ বলেই—।

—তা' ঠিক। একশো বার ঠিক।

সত্যসিন্ধু একটু চুপ করল। সে ভাবল, সুমিত্রার মৃত্যুর প্রসঙ্গটা আবার তোলা ঠিক হবে কিনা। মৃত্যুর প্রসঙ্গ আবার তুললে জান্‌কী হয়তো ব্যাপারটা ভালোভাবে না-ও নিতে পারে। তাই সে চিন্তা করতে লাগল, কি ভাবে এই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যায়।

কিন্তু জান্‌কীর হৃদয় তখন আবেগে টলমল করছে। স্বল্প পরিচয়ের বাধা তখন তার কাছে কোনো বাধাই নয়।

তাই সত্যসিন্ধুকে প্রসঙ্গটা তুলতে হল না। জান্‌কী নিজেই আবার বলল, 'বহুরাণীর জন্য খুব কষ্ট হয়। স্বামীকে সে কত ভালোই না বাসত। অথচ সেই মানুষটাকে বহুরাণী দু'দণ্ড কাছে পেত না। কাজ আর কাজ। তাই নিয়ে রোজ দুজনে লাগত খিটিমিটি। শেষটা একরাত্রে বড় সাহেব পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করলেন।'

সত্যসিন্ধু পুলিশ-রিপোর্টের কপি দেখেছে। তবু সে এমন একটা ভাব করল, যেন ঘটনাটা এই প্রথম শুনছে। কতকটা আঁতকে ওঠার ভান করে বলল, 'বলেন কি। নীলার বাবাও আত্মহত্যা করেছে? ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড।'

সত্যসিন্ধু একটু থেমে বলল, 'কিন্তু এটা তো আত্মহত্যা না-ও হতে পারে জান্‌কী দেবী? কেউ হয়তো ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। মানে, এটাও তো হতে পারে।'

জান্‌কী দেবীর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বড় হয়ে গেল। বড় বড়

চোখে সত্যসিন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তারপর বলল, ‘কিন্তু বড় সাহেবকে কে মারবে? মেরে তার কি লাভ?’

সত্যসিন্ধু কাঁধে একটা দোলা দিয়ে বলল, ‘কেউ যে তাকে মেরেছেই তা বলছি না। কথাটা এমনি বললাম আর কি! তবে লাভের কথা বলছেন? অনেক সময় লোকে স্রেফ রাগের বশেও একজন আর একজনকে খুন করে। কোনোরকম লাভের আশা না করেই। তাছাড়া সত্যি সত্যি যদি কেউ মেরে থাকে, তাহলে তার হয়তো কোনোরকম লাভ হয়েছে। মানে, হলেও হতে পারে। তবে এতদিন পর সে সব প্রশ্ন তুলে কি কোনো ফল হবে, বলুন?’

সত্যসিন্ধু সঙ্গে সঙ্গে তার কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। বলল, ‘আচ্ছা, আপনি তো নীলার জন্মের আগে থেকেই ওদের বাড়িতে আছেন, তাই না?’

জান্‌কী সামান্য হেসে উত্তর দিল, ‘ওর জন্মের আগে থেকে না। বরং জন্মের সময় থেকে বলতে পারেন। নীলার যেদিন জন্ম হল, তার সাতদিন বাদে আমি ওদের বাড়িতে যাই। সেই থেকে নীলা আমার কাছে।’

একটু থেমে যোগ করল, ‘নীলার জন্মের সাতদিন পরে আমি যখন ওদের বাড়িতে গেলাম, তখন বহুরাণী আমার কোলে মেয়েকে দিয়ে বললেন, ‘জান্‌কী, আজ থেকে তুই-ও ওর মা। তুই ওকে মেয়ের মতোই মানুষ করিস। তখন কি জানতাম, তিন বছর পর ওই বাড়ির সব উলট-পালট হয়ে যাবে। হায় রাম! জান্‌কী ফস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সত্যসিন্ধু হঠাৎ বলল, ‘নীলাঞ্জনা বলছিল, ওর নাকি এক মামা আছেন। তিনি নীলাকে দেখতে আসেন না?’

সত্যসিন্ধুর প্রশ্নে জান্‌কী মুখ তুলে তাকাল। সে কিছু বলবার আগেই সত্যসিন্ধু যোগ করল, ‘নীলার কাকা-টাকা নেই। নীলার দায়িত্ব তো মামারই নেবার কথা।’

জান্‌কী খুব সহজভাবে বলল, ‘মামার সঙ্গে ওদের কোনো

সম্পর্কই নেই। তিনি থাকেন বিলেতে। তবে নীলাদের বাড়ি কয়েকবার এসেছেন। অন্ততঃ দুবারের কথা আমি জানি। নীলার জন্ম হবার মাস কয়েক আগে শুনেছি একবার এসেছিলেন। আর ওর জন্মের বছর দুয়েক বাদে আর একবার এসেছিলেন। কিন্তু বড় সাহেব তাকে খুব একটা ভালোভাবে নিতেন না। বড় সাহেব তাকে খুবই অপছন্দ করতেন।'

সত্যসিন্ধু কোনো সাড়া দিল না। নিঃশব্দে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। যেন এসব শোনার তার তেমন আগ্রহ নেই। যেন শুনতে হয় তাই শোনা।

জানকী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হঠাৎ বলল, 'প্রথম আলাপে কেউ কাউকে এত কথা বলে না কিন্তু—।'

সত্যসিন্ধু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'সত্যিই তো। আমি নীলার প্রফেসর হতে পারি, তবু তো আপনার অপরিচিত। আমার খুব খারাপ লাগছে এখন। আমি বরং আজ উঠি। আর একদিন নীলাঞ্জনার সঙ্গেই না হয়—।'

জানকী হেসে বলল, 'ছিঃ, আপনি আমার এই কথার এই মানে করলেন? আমার পুরো কথাটাই তো শুনলেন না।'

একটু থেমে যোগ করল, 'আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, আপনি নীলার সত্যিকারের ভালো চান। নীলার ভালো হলে খুশি হন। ঈশ্বরের আশীর্বাদে মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আপনি বসুন। আপনার যে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই, সেটা আমি প্রথমেই বুঝেছিলাম। সেই জন্যেই এত সব বলেছি। চিঠি দেখিয়েছি। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে।'

কথাটা বলে অমলিন হাসি হাসল সে।

সত্যসিন্ধু চোখ দিয়ে হাসল। মুখে কিছু বলল না।

জানকী আগের কথার জের টেনে বলল, এই ব্যাপারটা নিয়ে বহুরাণীর খুব দুঃখ ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, তোদের বড় সাহেব নীলার মামাকে একেবারেই পছন্দ করে না। কেন যে পছন্দ করে না,

বুঝি না। আমার খুব দুঃখ হয়। বলতে বলতে এক এক সময় কেঁদেই ফেলতেন।'

সত্যসিন্ধু এবার খুব নিরীহ মুখ করে প্রশ্ন করল, 'তাহলে তো আপনাদের বড় সাহেবের ওপর নীলার মামারও বেশ রাগ ছিল।'

জান্‌কী সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'জানি না ঠিক। তবে থাকারই কথা।'

সত্যসিন্ধু সামান্য ইতস্ততঃ করে বলল, 'নীলাঞ্জনা তার মামাকে চেনে?'

জান্‌কী সামান্য হেসে উত্তর দিল, 'চিনবে কি করে? বলতে গেলে সে তো মামাকে কখনো দেখেইনি। অবিশ্যি আমিও চিনি না। আমিও তাকে দেখিনি কখনো। প্রথমবার যখন এসেছিলেন, তখন আমি ওদের বাড়িতে যাই-ই নি। আর দ্বিতীয়বার যখন এলেন, তখন আমি আমার গ্রামের বাড়িতে।'

সত্যসিন্ধু অস্ফুট স্বরে কেবল বলল, 'ও।'

জান্‌কী হঠাৎ নিম্নস্বরে বলল, 'নীলার মামার তো রাগ ছিল বড় সাহেবের ওপর, তিনি কাউকে দিয়ে কিছু করেন নি তো? মানে, আপনি ওই যে বললেন না, পাহাড় থেকে ধাক্কা দেবার কথা?'

সত্যসিন্ধুর চোখ সামান্য সূক্ষ্ম হয়েই আবার ধীরে ধীরে প্রসারিত হল। বেশ স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এটা আত্মহত্যা নয়, এ-রকম একটা সন্দেহ আপনার মনেও আছে নাকি?'

জান্‌কী একটুও ইতস্ততঃ না করে বলল, 'ঠিক সন্দেহ নয়। আমার খুব অবাক লেগেছিল। ব্যাপারটা আমার বিশ্বাসই হয়নি। যে মানুষটা দুদিন আগেও কলকাতার বাড়িটা কিনবার কথা ভাবছিলেন, তিনি হঠাৎ এমনি করে—।

জান্‌কী কথাটার পূর্ণচ্ছেদ না টেনেই থেমে গেল।

সত্যসিন্ধু সামান্য সময় চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, 'কলকাতার বাড়িটা মানে? কোন্ বাড়ি?'

—বাঃ আপনি জানেন না? তালতলায় নীলাদের একটা প্রকাণ্ড

বাড়ি ছিল যে। বাড়িটা অবিশ্যি এখনো আছে। তার মালিক একজন মাড়োয়ারী। একটা অসুবিধের মধ্যে পড়ে বড় সাহেবকে নাকি বাড়িটা বিক্রি করতে হয়েছিল। তারপর বাড়িটা আবার কিনে নেবার জন্যে বড় সাহেব অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পাননি।

—পাননি কেন?

—মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চার-পাঁচ গুণ বেশি দাম চেয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে অত টাকা দেবার মতো অবস্থা বড় সাহেবের ছিল না।

একটু থেমে জান্‌কী বলল, 'জানেন তো, তালতলার ওই বাড়িটাকে এখনো সবাই মিত্তির বাড়িই বলে?'

সত্যসিন্ধু প্রশ্ন করল, 'আপনাদের ছোট সাহেব নাকি ওই মিত্তির বাড়ির পাশেই থাকতেন। সত্যি নাকি?'

—তাই তো শুনেছি। মিত্তির বাড়ির পাশেই একটা গলি আছে তার ভেতর একটা বাড়িতে। তবে ওই শোনা পর্যন্তই। সঠিক জানি না। আসলে ছোট সাহেব কক্ষনো কলকাতায় আসেন না। কলকাতাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন। কলকাতায় থাকার কথা ভাবতেই পারেন না। তিনি স্পষ্ট করেই এ-কথা সবাইকে বলেন।

সত্যসিন্ধুর কাছে কথাটা একেবারে নতুন মনে হল। সে সামান্য সময় তাকিয়ে রইল জান্‌কীর দিকে। তারপর গলায় সামান্য বিস্ময়ের সুর মিশেল দিয়ে বলল, 'কলকাতাকে ঘেন্না করেন বলছেন। তাহলে নীলাঞ্জনাকে এখানে পড়াচ্ছেন কেন?'

জান্‌কী এবার হেসে বলল, 'সেটা তো অন্য ব্যাপার। উনি চান, নীলার মা যেখানে যেভাবে মানুষ হয়েছেন, নীলাও সেখানে সেইভাবে মানুষ হোক। উনি চান, নীলা সব রকমে নীলার মায়ের মতন হোক।'

—অর্থাৎ ছোট সাহেব নীলাকে তার মায়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখতে চান।

—আজ্ঞে?

সত্যসিন্ধুর কথার অর্থ জান্‌কী ঠিক যেন অনুধাবন করতে

পারল না।

সত্যসিন্ধু অর্থটা পরিষ্কার করার চেষ্টাও করল না। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আজ উঠি জানকীদেবী। আমার আর একটা কাজ আছে।

জানকী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'উঠবেন মানে? চা-টা খাবেন না? তাই কি হয়? প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন।'

সত্যসিন্ধু দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখে বিনয়ের হাসি নিয়ে বলল, 'আর একদিন এসে চা-টা খেয়ে যাব। নীলাঞ্জনার সঙ্গে বসে। আজ থাক।'

কথাটা বলে পকেট থেকে নিজের নামের কার্ড বের করে জানকীর হাতে দিয়ে বলল, 'এই কার্ডটা নীলাকে দেবেন।'

জানকী ভালোই বাংলা পড়তে জানে। কার্ডটা হাতে নিয়ে সে পড়ল, সত্যসিন্ধু মুন্সী, গবেষক।

জানকী কার্ডটা থেকে মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি যে বললেন, আপনি প্রফেসর?'

সত্যসিন্ধু সহাস্যে উত্তর দিল, 'প্রফেসররাও গবেষক হতে পারে জানকীদেবী। নীলাঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।'

কথাটা বলে সত্যসিন্ধু হাত তুলে নমস্কার করে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ। আজ আসি।'

সত্যসিন্ধু আর দাঁড়াল না।

নীলাঞ্জনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে তালতলার উদ্দেশ্যে রওনা হল সত্যসিন্ধু।

তালতলার মিত্র-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সামান্য সময় বাড়িটাকে দেখল। বাড়িটা আজ যদিও আর মিত্রদের নেই, লোকে তবু বড় বড় থামওয়ালা বাড়িটাকে আজো মিত্তির-বাড়িই বলে। নতুন নামে তারা তেমন অভ্যস্ত হতে পারেনি।

সত্যসিন্ধু রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে সামান্য চোখ বুলিয়েই বুঝল, বাড়িটার তেমন কোন বাহ্যিক পরিবর্তন করা হয়নি। আগে

যেমন ছিল এখনো তেমনি আছে। হয়তো সামান্য চাকচিক্য বেড়েছে। তবে মিত্রদের বাড়ি সম্বন্ধে সত্যসিন্ধুর তেমন কোনো কৌতূহল নেই। তার কৌতূহল সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের আত্মীয় সম্বন্ধে। সে জানতে চায়, সৌম্যেন্দুর কোনো আত্মীয়-স্বজন এই তল্লাটে আছে কিনা।

মিত্রদের বাড়ির গা ঘেঁষে একটা গলি। গলিটা খুবই সরু। একটা রিক্সাও যেতে পারে না। গলিটার দিকে তাকিয়ে সত্যসিন্ধুর মনে হল, সম্ভবতঃ এই গলিটাতেই সৌম্যেন্দুরা এক সময় বাস করত। তাদের কেউ হয়তো আজ আর এখানে নেই। তবু পুরোনো লোকজনের কাছে সৌম্যেন্দু সম্বন্ধে কোনো তথ্য পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

গলিটার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে সত্যসিন্ধু দেখল, গলিটার মুখে একটা পুরোনো স্টেশনারী দোকান। দোকানটা সেই শ্রেণীর জিনিষের মধ্যে পড়ে যাদের ওপর সময়ের স্রোত সহজে কোন দাগ ফেলতে পারে না। দোকানটার দিকে তাকিয়ে সত্যসিন্ধুর অন্ততঃ সেই কথাই মনে হল। তার অনুমান, তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেও দোকানটা একই রূপ ধরে একইভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

দোকানের মালিক একজন বৃদ্ধ। বৃদ্ধের মুখে সব সময় কেমন এক তৃপ্তির হাসি। তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই। এক অনাবিল আনন্দের সাগরে সে যেন সারাক্ষণ সাঁতার দিচ্ছে।

সত্যসিন্ধু দোকানের সামনে এসে বলল, 'এটা তো আপনার অনেক দিনের দোকান, না?'

ভদ্রলোক চোখ সূক্ষ্ম করে সত্যসিন্ধুর দিকে তাকাল। প্রশ্নের কারণটা ঠিক ধরতে পারল না। চোখ সূক্ষ্ম করেই উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেক দিনের। সাঁইত্রিশ বছর। কেন বলুন তো?'

সত্যসিন্ধু এক গাল হেসে বলল, 'তাহলে তো মিত্তিরদের আপনি চেনেন?'

—মিত্তিরদের মানে, অমিতাভ মিত্তির, অরুণাভ মিত্তির, এদের

কথা বলছেন তো ?

—হ্যাঁ, তা-ই।

—খুব চিনি। এক পাড়ার লোক। চিনব না? কিন্তু সে তো অনেক দিনের কথা। অরুণাভ বাড়ি-টাড়ি বিক্রী করে এলাহাবাদের কাছে কোথায় ব্যবসা করছিল। অবিশ্যি তার পরেও এখানে কয়েকবার এসেছে। বাড়িটা আবার কিনে নেবার জন্যে অনেক চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু তা-ই কি আর পায়? হাতের ঢিল ছুটে গেলে কি আর ফিরে আসে? বেচারা!

লোকটি করুণ মুখ করে ঠোঁট ওল্টাল। তারপর নিজেই বলল, 'বিয়ের ক'বছর পরই আত্মহত্যা করে মারা গেল। কপাল! বুঝলেন না? সবই কপাল।'

সত্যসিন্ধু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'আত্মহত্যার খবর আপনি জানলেন কি করে? কোত্থেকে শুনলেন?'

—সম্ভবতঃ কাগজে পড়েছি।

—হয়তো তা-ই পড়েছেন। কারণ, ঘটনাটা ছোট্ট করে কাগজে বেরিয়েছিল।

সত্যসিন্ধু একটু থেমে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, অরুণাভবাবুর একজন বন্ধু ছিলেন। একই পাড়ার মানুষ। সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। তাকে আপনি চেনেন?'

—চিনব না কেন? আমার দোকানে প্রায়ই আসত সে। শুনেছি, সে-ও অরুণাভ মিত্তিরের পাথরের ব্যবসায় কাজ করত।

সত্যসিন্ধু এবার সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, এই সৌম্যেন্দু মানুষটা ছেলেবেলায় কেমন ছিল বলুন তো?'

সত্যসিন্ধুর এই প্রশ্নে লোকটা একটু যেন নড়েচড়ে বসল। সামান্য সময় সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এতদিন পর এসব প্রশ্ন কেন উঠছে বলুন তো? এর মধ্যে কোনো পুলিশ-টুলিশের ব্যাপার আছে নাকি?'

সত্যসিন্ধু মোলায়েম ভাবে হেসে বলল, 'না-না, পুলিশ-টুলিশের

কোনো ব্যাপার নেই। এমনিই কৌতূহল। আসলে ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর পরিচিত ব্যক্তি। এই পাড়া দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই একটু। তা সৌম্যেন্দুবাবুর আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ থাকেন না ?

লোকটি এবার সহজভাবে হেসে বলল, 'না কেউ না। দাদারা অনেকদিন এখান থেকে চলে গেছে। তা' তাদের সঙ্গে দেখা করেও খুব একটা লাভ হত না। দাদা-বৌদিরা তার সম্বন্ধে কতটুকুই বা বলতে পারত ?

—কেন ! বলতে পারত না কেন ?

—কি করে বলতে পারবে ? ওর দাদারা সৌম্যেন্দুকে কখনো মানুষ বলে মনে করেছে ? বাড়িতে একটা কুকুর বেড়াল থাকলে যতটুকু আদর পায় সৌম্যেন্দু তার দাদা-বৌদিদের কাছে ততটুকুও পায় নি। কোনো দিন শুকনো রুটি জুটেছে। ভাতের সঙ্গে একটার বেশী ছুটো তরকারী পায়নি কখনো।

সত্যসিন্ধু বাহ্যত সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'অরুণাভবাবু এসব জানতেন ?'

লোকটি অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে বলল, 'বড়লোক বন্ধুর কাছে এসব কথা কেউ বলতে পারে ? আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না ? সৌম্যেন্দুও অরুণাভকে কিছু বলতে পারেনি। তবে আমার কাছে এসে প্রায়ই দুঃখ করত। এক-একদিন বলতো, কলকাতা ছেড়ে চলে যাব কোথাও। যেদিকে দু'চোখ যায়।

—সন্ন্যাসী হবার কথা বলতো ?

—হ্যাঁ, তা-ও বলতো।

কি একটা মনে পড়তেই লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল। সত্যসিন্ধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

লোকটি হাসিমুখেই বলল, 'সৌম্যেন্দুর জেদ ছিল খুব। একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তখন ও ক্লাস এইটে পড়ে। আমি দুটো বড় বড় মাছ ভাজা খেতে দিয়েছিলাম। একটা খেয়ে পরের দিনের

জন্য আর একটা রেখে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর। একটা বেড়াল সেটা খেয়ে নিয়েছিল। এর ফলে বেড়াল জাতটার ওপরই ওর প্রচণ্ড রাগ হয়। বেড়ালের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে কি করেছিল জানেন?'

—কি?

—এক একদিন এক একটা বেড়ালকে বস্তায় পুরে একটা পোড়ো বাড়ির ছাদে উঠেছিল। তারপর বস্তার মুখ বন্ধ করে ছাদ থেকে নিচে ছুঁড়ে ফেলে আছড়ে মেরেছিল। এমনি করে তিনটে বেড়ালকে মেরেছে। একটা অবিশ্যি নীচে পড়ে গিয়েও বেঁচে গিয়েছিল।

—আশ্চর্য প্রতিহিংসা তো।

—অথচ দেখুন, মনটা কি ভালো। কত লোকের কত উপকার করেছে। ছুটোছুটি করে কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করা, মড়া কাঁধে নিয়ে শ্মশান যাত্রী হওয়া, আরো কত কি! অসহায় অবস্থায় সৌম্যেন্দুকে কেউ ডাকলেই সে ছুটে গেছে। নিজের কথা ভাবেনি। আসলে কি জানেন. সৌম্যেন্দু ছেলেবেলা থেকেই ধার্মিক প্রকৃতির। কিন্তু বড্ড বিরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষ হয়েছে।

সত্যসিন্ধু আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলো।

## ॥ আট ॥

গবেষক সত্যসিন্ধু এবং ব্যক্তি মানুষ অনিন্দ্য সেন উভয়েই একটা থিওরি সামনে রেখে জীবনের পথে চলাফেরা করে। থিওরিটা হল, কোনো মানুষকেই ক্ষুদ্র মনে না করা এবং যত বেশি সম্ভব মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপন করা।

দেশে দেশে ঘর এবং ঘরে ঘরে ঠাঁই খুঁজে নেওয়াও তার এই থিওরির মধ্যে পড়ে। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আজ তার পরিচিত এবং বন্ধুর সংখ্যা অনেক। কেবল ভারত

না, ভারতের বাইরেও তার পরিচিত বন্ধুর সংখ্যা খুব একটা কম নয়।

সত্যসিন্ধুর এইসব পরিচিত বন্ধুর দল জীবিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যুক্ত। সে তাদের সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করে। এবং এই পত্রালাপের মাধ্যমে অনেক খবর সংগ্রহ করে। খবর সংগ্রহের এটা তার একটা মস্ত বড় মাধ্যম।

এই সব মানুষ জন সত্যসিন্ধুর কেবল পরিচিত বন্ধুই নয়, গবেষক হিসেবে তার গুণগ্রাহীও বটে। এলাহাবাদের নামী চিকিৎসক ডাঃ ত্রিভুবন ঠাকুর এমনই একজন গুণগ্রাহী মানুষ।

ডাঃ ত্রিভুবন ঠাকুর অবিশ্যি কেবল একজন নামী চিকিৎসকই নন, একজন সু-পরিচিত সবাজসেবীও।

সত্যসিন্ধু প্রতাপগড়ের কেসটা হাতে নিয়েই প্রথমে ডাঃ ঠাকুরকে একটা চিঠি লিখেছিল। চিঠিতে বলেছিল, "প্রতাপগড়ের এ্যাপোলো কোম্পানীতে একটি শিক্ষিত যুবকের মান অনুযায়ী চাকরি চাই। ধরে নাও, যুবকটি এম. এ. পাশ। এর জন্য যদি কিছু খরচ করতে হয় করা যাবে। চাকরিটা স্থায়ী না হলেও চলবে। আপাততঃ মাস দুয়েকের জন্য চাই-ই। বুঝতেই পারছো, আমার গবেষণার জন্য চাকরিটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

কয়েক দিনের মধ্যেই ডাঃ ঠাকুরের উত্তর এসে গিয়েছিল। তার চিঠিটা ছিল এই রকম, 'মুন্সীজী তোমার কপাল ভালো। তোমার এই চাকরিটার জন্য আমার তেমন কষ্ট করতে হয়নি। এ্যাপোলো কোম্পানীতে একটি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পোষ্ট খালিই আছে। ওখানকার ম্যানেজার শর্মাজীই এই ব্যাপারে সব। তবে লোকটা টাকা চেনে। কয়েক দিনের মধ্যেই নিউজ পেপারে বক্‌স্ নাম্বারে বিজ্ঞাপন করা হবে। লক্ষ্য রেখো। তুমি নির্দিষ্ট কাগজে ওই বিজ্ঞাপনের জায়গাতেই শর্মাজীকে সম্বোধন করে আর একটা বিজ্ঞাপন করে টাকার কথাটা বুঝিয়ে দিও। কথাটা কি ভাবে বলবে সেটা তোমার ব্যাপার।

'আর একটা কথা। যে ছেলেটিকে চাকরিতে পাঠাচ্ছ তার

প্ল্যানচেটের ব্যাপার জানা থাকলে ভালো হয়। এটা তার একটা এ্যাডিশনাল কোয়লিফিকেশন হবে। এখানকার মালিকের নাকি এই ব্যাপারে একটা দুর্বলতা আছে।”

ডাঃ ঠাকুরের চিঠিটা সত্যসিন্ধুকে একটু অস্বস্তিতে ফেলেছিল। ইংরেজী নাটক করা, শিক্ষিত, সুদর্শন যুবক পাওয়া খুব একটা অসুবিধে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সামান্য ভাবতেই মনে মনে সে এরকম একটা ছেলের খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। যদিও হরিসাধনকে সে তা' সোজাসুজি বলেনি। সামান্য ঘুরিয়ে বলেছিল কথাটা। কিন্তু সত্যসিন্ধু মনে মনে অস্বস্তিতে ছিল ওই প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা নিয়ে। এই গোলমালটা কি করে মিটবে সে তা' ভেবে পায়নি।

তবে গোলমালটার সমাধান করেছিল ইন্দ্রনীল স্বয়ং। অবশ্যই কিছু না জেনে।

ঘটনাটা কাকতালীয়।

সত্যসিন্ধু মনে মনে পরিকল্পনা করছিল, কি ভাবে ইন্দ্রনীলের মাথায় প্ল্যানচেটের আইডিয়া প্রবেশ করানো যায়। এমন সময় হঠাৎ একদিন হরিসাধন জানাল যে, ইন্দ্রনীলের প্ল্যানচেটের হবি আছে। এই হবিটা সঞ্চারিত হয়েছে তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মাধ্যমে।

কথাটা শোনার পর সত্যসিন্ধু সানন্দে ডাঃ ঠাকুরকে লিখেছিল, “ডাক্তার, তুমি শুনে খুশি হবে, যে-ছেলেটিকে পাঠাচ্ছি সে কেবল এম. এ. না, তার প্ল্যানচেটের হবিও আছে।”

এর পরের ধাপগুলো সত্যসিন্ধুর পরিকল্পনা মতোই উত্রে যাচ্ছিল খুব সহজভাবেই। তাই সঞ্জয়কে সে উপদেশ দিয়েছিল, কলকাতায় বসে না থেকে এলাহাবাদে গিয়ে নিজের কাজকর্ম দেখা-শোনা করতে। সেই উপদেশ অনুসারে সে চলেও গিয়েছিল।

ছক কাটা পথ ধরেই এত দিন চলছিল সব। সত্যসিন্ধু এত দিন খুশিই ছিল তাই। ভেবেছিল, নতুন কেসের রোগটা পুরোনো হলেও তেমন জটিল হয়নি এখনো।

কিন্তু তালতলা থেকে ফিরে সত্যসিন্ধুর সেই ধারণায় ফাটল ধরল।

সে বাড়ি ফিরে দেখল, ডাঃ ঠাকুরের একটা চিঠি তার জন্য অপেক্ষা করছে।

ডাঃ ঠাকুর চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, "সঞ্জয় বোস সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি। মানুষটা ভালো বলেই এখানকার অনেকের ধারণা। এখানে তার যে-বাড়িটার কথা তুমি লিখেছো সেটা এখনো আছে। সেই বাড়িতে যে-ফ্যামিলি থাকে তারাই বাড়িটা দেখাশোনা করে।

"তাদের কাছে শুনেছি, সঞ্জয়বাবু প্রথমে এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী এক ভারতীয় মহিলা। বিয়ে হয়েছে লণ্ডনেই। বর্তমান স্ত্রী লণ্ডনের এক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সঞ্জয় বোসের আগের পক্ষের একটি মেয়ে আছে, কিন্তু বর্তমান স্ত্রীর কোনো সন্তান হয়নি। ভদ্রলোক নাকি হালে ঠিক করেছেন, ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বাস করবেন।

"মুন্সীজী তুমি যা' লিখেছো তা' ঠিক। সঞ্জয় বোস এ্যাপোলো কোম্পানীর মৃত মালিকের আত্মীয়ই। তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে মৃত মালিকের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। কারণ, মালিকের এ্যাকসিডেন্টাল ডেথ-এর পর পুলিশ তার নিজের হাতে লেখা যে-ডায়েরিটা পায় তার এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা ছিল, এ-রকম লোকের সঙ্গে সম্পর্ক যত কম রাখা যায় ততই মঙ্গল।

"এখানকার পুলিশের বড় কর্তার কাছে এই খবরটা পেয়েছি। কর্তা-ব্যক্তিটি আমার বিশেষ বন্ধু।

"তার কাছেই শুনেছি, ভদ্রলোক এ্যাপোলো কোম্পানীর মালিকের মৃত্যুর মাসখানেক আগেও ভারতে এসেছিলেন। এবং যে-রাতে মালিকের মৃত্যু হয় সেই দিনই লণ্ডনের পথে যাত্রা করেন। সম্ভবত ঘটনাটা কাকতালীয়।"

চিঠি পড়া শেষ করে সত্যসিন্ধু সমস্ত অবস্থাটার বিশ্লেষণ করতে বসল। মনে মনে অনেক ছক কাটল। অনেক ঝাড়াই বাছাই, অনেক কাট-ছাট করার পর একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল।

সিদ্ধান্তে পৌঁছবার পর কাগজ-কলম নিয়ে ডাঃ ঠাকুরকে চিঠি লিখল, 'ডাক্তার, আপাতত অন্য কোনো কথা আর ভাবতে পারছি না। বর্তমানে তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-সাধনা সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল তৈরী হয়েছে। আমি কয়েক দিনের মধ্যেই এলাহাবাদ যাচ্ছি। কোনো তান্ত্রিকের খোঁজে।'

পর দিন সকালে হরিসাধনকে ফোনে বলল, 'অধ্যাপক, আমি ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা তোমার জিম্মায় রইল। খেয়াল রেখো। ইন্দ্রনীলের প্রতাপগড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নীলাঞ্জনা না জানলেই ভালো হয়। ট্রাই টু লুক টু দিস। তাছাড়া ইন্দ্রনীল কবে কখন কোন ট্রেনে প্রতাপগড় যাচ্ছে সেটা জেনে নেবে। বিকাশকে বলে রেখেছি, তোমার কাছ থেকে ট্রেনের টাইম জেনে নেবে। তারপর সে তার ডিউটি করবে।'

টেলিফোন রেখে দিয়ে সত্যসিন্ধু এলাহাবাদ যাওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হল।

॥ নয় ॥

এলাহাবাদে এসে সত্যসিন্ধু প্রথমেই ডাঃ ঠাকুরের বাড়িতে উঠতে পারত, কিন্তু তা' সে করল না। উঠল একটা হোটেলে। তারপর ঠিকানা মিলিয়ে গেল সঞ্জয় বোসের বাড়িতে।

তার উদ্দেশ্য, ডাঃ ঠাকুরের বিবরণটা মিলিয়ে নেওয়া।

সত্যসিন্ধু দেখল, সঞ্জয় বোসের বাড়িটা দোতলা এবং বেশ বড়ই। বাড়ির একটা অংশ খালিই থাকে। কিন্তু বর্তমানে সঞ্জয় নিজের একটা অফিস করেছে, তাছাড়া প্রয়োজনে অন্য দুটো ঘর ব্যবহার করে। তবে সত্যসিন্ধু যখন এল, সঞ্জয়ের অংশ তখন বন্ধ।

সঞ্জয়ের বাড়ির বাকি অংশে রবীন্দ্র মিশ্র নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন। তিনি এলাহাবাদের পুরোনো লোক। সঞ্জয়ের পিতার আমলের। সঞ্জয়দের সঙ্গে রবীন্দ্র মিশ্রের দীর্ঘদিনের

পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। ফলে সঞ্জয়ের জীবনের অনেক কিছুই তার পক্ষে জানা সম্ভব।

সত্যসিন্ধু রবীন্দ্র মিশ্রের কাছে নিজেকে সঞ্জয়ের এক পুরোনো বন্ধু বলে পরিচয় দিল। নিজের নাম বলল, অনিন্দ্য সেন। কলকাতার কলেজের এক অধ্যাপক। পুরোনো বন্ধুর বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। বিশেষ করে তার স্ত্রী এবং মেয়ের সঙ্গে। দীর্ঘদিন তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি।

শেষের কথায় বৃদ্ধ রবীন্দ্র মিশ্র অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সত্যসিন্ধুর মুখের দিকে। তারপর বললেন, 'আপনি যখন ওর বন্ধু তখন তো সনজুর অনেক কথাই আপনার জানার কথা।'

সত্যসিন্ধু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'অনেক কথা মানে? ওর সেকেণ্ড ম্যারেজের কথা বলছেন? তা জানি বৈকি। কিন্তু মেয়েকে ভদ্রলোক খুব ভালোবাসে।

—হ্যাঁ, তা' বাসে। আমরাও তা জানি। কিন্তু সে-তো এক তরফা। মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পর মেয়ে বাপের সঙ্গে দেখাই করে না। সনজু তো সেই দুঃখেই স্থায়ীভাবে ভারতে থাকতে চাইছে।

সত্যসিন্ধু মোলায়েম হেসে বলল, 'মেয়ের পরিবর্তে ভাগ্নীকে পেতে চাইছে বোধহয়?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভুরু-জোড়া সামান্য সূক্ষ্ম করে বলল, 'আপনি ধরেছেন ঠিক। তবে সনজু মুখে কিছু বলেনি। আপনার মতো আমিও কিন্তু একই কথা ভেবেছি। তবে ভাবা পর্যন্তই। জিজ্ঞাসা করিনি কিছু।'

সঞ্জয় সম্বন্ধে আরো দু'একটা খোঁজ-খবর নিল সত্যসিন্ধু।

হোটেলে ফিরবার পথে সত্যসিন্ধুর মাথার ভেতর একটা প্রশ্ন উঁকি দিল। সঞ্জয় নীলাঞ্জনাকে তার পরিচয় দিল না কেন? ভাগ্নীর সঙ্গে দেখা করাটা কোনো রকম অস্বাভাবিক ব্যাপার না। বিশেষ করে কলকাতার বাড়িতে। কলকাতার বাড়িটা তার অজানা ছিল না।

সঞ্জয়ের সঙ্গে সত্যসিন্ধুর যে আলোচনা হয়েছিল, মনে মনে সে

আবার তা' খতিয়ে দেখল।

সত্যসিন্ধু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করেছিল, 'নীলাঞ্জনার সঙ্গে আপনি দেখা করেছিলেন?'

সঞ্জয় স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল, 'না করিনি। আমাকে তার চেনার কথা না। এতদিন পর নতুন করে পরিচয় দিতে গেলে এ্যাডভারস রি-এ্যাকসন হতে পারে। এ্যাণ্ড ছ্যাট এ্যাডভারস রি-এ্যাকসন মে ক্রিয়েট ট্রাবল ইন ইওর প্রেজেন্ট রিসার্চ ওয়ার্ক।'

একটু থেমে সঞ্জয় যোগ করেছিল, 'পরিচয় নিশ্চয়ই দেব। ইন ফ্যাক্ট পরিচয় দিতেই আমি এসেছি। বাট নট নাউ। লেট প্রপার টাইম কাম।'

মনে মনে সঞ্জয়ের কথাবার্তা খতিয়ে দেখে সত্যসিন্ধু কোথাও কোনো গোলমাল খুঁজে পেল না। তবু তার মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা লেগে রইল।

অবিশ্যি তখনকার মত সত্যসিন্ধু এই ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি কিছু ভাবল না। কারণ তখন তার মাথার মধ্যে অন্য আর একটা ভাবনা দানা বেঁধে আছে। সে সেই ভাবনাকেই কার্যকর করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন সন্ধ্যে।

সত্যসিন্ধু একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে হাজির হল ডাঃ ঠাকুরের বাড়ি।

ডাঃ ঠাকুর তাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'আরে এসো গবেষক এসো। তারপর ক'দিন থাকবে বলে ঠিক করেছো?'

সত্যসিন্ধু সহাস্যে বলল, 'কিছুক্ষণের জন্য একটা ড্রেসিং রুম চাই। সামান্য ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হবে। পরে থাকাথাকির ব্যাপার।'

ডাঃ ঠাকুর দ্বিরুক্তি না করে একটা ড্রেসিং রুমের ব্যবস্থা করে দিলেন।

ঘরে ঢুকে সত্যসিন্ধু তার স্যুটকেস থেকে পোশাক টোশাক বের করল।

লাল রঙে ছোপানো, পুরোনো, ছেঁড়া-ফাটা, আধখানা ধুতি। বহু তাপ্পি দেওয়া লাল আলখাল্লা। নকল জটা, নকল দাড়ি। হাড়ের মালা। তাপ্পি দেওয়া কাঁধে ঝোলানো ঝোলা। সিঁদুর মাখানো একটা ত্রিশূল।

ত্রিশূল হাতে ছদ্মবেশ ধারী সত্যসিন্ধু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন ডাঃ ঠাকুরেরও যেন কেমন বিভ্রম ঘটল। তাঁর মনে হল বুঝি বা সত্যি সত্যিই কোনো তান্ত্রিক তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মনের ভাবটা তিনি মুখে প্রকাশ করেও ফেললেন। বললেন, 'মুন্সী, ইউ লুক রিয়্যাল তান্ত্রিক।' কথাটা বলেই হেসে ফেললেন।

সত্যসিন্ধু কিন্তু হাসল না। গম্ভীর মুখে ডাঃ ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। এমনভাবে যেন ডাঃ ঠাকুরকে সে হিপনোটাইজ করছে।

ডাঃ ঠাকুরের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'ইজ দেয়ার এনি রঙ, মুন্সী?'

সত্যসিন্ধু একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপ মুন্সীকো কিধর দেখ পায়ে ডকতর সাব? ম্যায় তো ভোলেবাবা হুঁ। জি হাঁ, 'ভোলেবাবা।'

পরক্ষণেই নিম্নস্বরে বলল, 'আমার জন্য ফিকির কোরো না, ডাক্তার। আমার সঙ্গে আইডেনটিটি কার্ড আছে।'

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না।

পরদিন সকালে মিত্র-ভিলার কাছাকাছি ভোলেবাবাকে দেখা গেল। ভোলেবাবা একটা গাছতলায় বসল কিছুক্ষণ। দু'একজন দেহাতী মানুষ তাকে প্রণাম করল। তাকে প্রণাম করে পয়সাও দিল কেউ কেউ। সে সবাইকে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, 'ডরো মৎ। ভোলেবাবা দেখে গা।'

এমনিভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে সোজা চলে গেল মিত্র-ভিলায়।

সৌম্যেন্দু তখন বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে পিঠ দিয়ে অন্য-মনস্কের মতো বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়াল ভোলেবাবা। সে তখন উদাত্ত কণ্ঠে গীতার বিশ্বরূপ দর্শন যোগ থেকে আবৃত্তি করছে।—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥

সৌমেন্দু লোকটির হঠাৎ আবির্ভাবে সামান্য চঞ্চল হল। সোজা হয়ে বসে বলল, 'আপনি কে?'

ভোলেবাবা তীক্ষ্ণ চোখে সামান্য সময় তাকিয়ে রইল সৌম্যেন্দুর চোখের দিকে। তারপর একই ভঙ্গিতে গমগমে গলায় বলল, 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো।' একটু থেমে খ্যাক খ্যাক করে খানিকটা হাসল। তারপর হাতের ত্রিশূলটা সামনে তুলে ধরে বলল, 'কুছ সমঝে বেটা?'

সৌম্যেন্দু অস্বস্তির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'নেহি।'

ভোলেবাবার চোখ দুটো হঠাৎ যেন ক্রোধে জ্বলে উঠল। সে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কেয়া বোলা? নেহি সমঝে?' পরক্ষণেই বাংলায় বলল, 'বেটা, তুমি তো সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলে? আউর গীতার অর্থ বুঝে না?'

সৌম্যেন্দু ইলেকট্রিক শক খেল যেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চোখ সূক্ষ্ম করে বলল, 'আমি সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলাম, আপনি তা' কি করে জানলেন?'

ভোলেবাবা আবার খানিকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসল। তারপর বলল, 'তোর কপাল বলে দিচ্ছে বেটা। সব কুছ কপালে লিখা থাকে। বিশ্বরূপ দর্শন যোগে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি বলছেন? বলছেন, 'আমি ভীষণ কালপুরুষ। লোকক্ষয়ের জন্য, লোক সংহারের জন্য ইহলোকে ব্যাপ্ত আছি। ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে, যেঽবস্থিতাঃ

প্রত্যনীকেষু যোধাঃ। তুমি যদি হত্যা না করো, তব্‌ভি প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধাদের মধ্যে যারা বর্তমান আছে তারা কেউ বেঁচে থাকবে না। কোই নেহি।'

একটু থেমে প্রসন্ন চোখে তাকিয়ে বলল, 'কেয়া সমঝে? তুম কোই নেহি। মারনা আউর জিয়ানা তুমহারা হাত মে নেহি হোতা। তুম নিমিত্ত হো। তোমার হাত দিয়ে তিনিই মারেন।'

সৌম্যেন্দু ততক্ষণে অভিভূত। সে প্রায় হাত জোড় করে বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন সাধুজী? বসুন।'

ভোলেবাবা টেবিলের ওপর ত্রিশূলটা রেখে একটা চেয়ারে বসল। বসে বলল, 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব, নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচিন। আমি পহ্‌লেই এ সবকো মেরে রেখেছি। তুমি নিমিত্ত হো যাও সব্যসাচী। কেয়া বেটা? সমঝে? নিমিত্ত?'

সৌম্যেন্দুর অভিভূত ভাবটা তখনো কাটেনি। সে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'আমাকে এসব কেন বলছেন সাধুজী? নিমিত্তের কথা?'

ভোলেবাবা মিটিমিটি হেসে বলল, 'তুম সোচো। কিঁউ বোলতা। লেকন্ আমাকে ভোলেবাবা বোলো বেটা। সবাই আমাকে ভোলেবাবা বোলে। সম্‌ঝে?'

সৌম্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ঠিক আছে তা-ই বলবো। ভোলেবাবা।'

'হাঁ। ভোলেবাবা।' বলেই উঠে পড়ল।

সৌম্যেন্দু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'একি উঠে পড়লেন যে? কিছু খানা-পিনা করবেন না?'

'কৌন কিস্‌কো খানাপিনা করায় বেটা? সব হ্যায় মা। মা জগজ্জননী। খানাপিনা সব উনকো। ফিরভি তুম কুছ খিলাতে চায় তো প্রয়াগে ত্রিবেণী চলে এসো। পরশু সকালে। আমি তোমাকে ঢুঁড়ে লিব।'

ভোলেবাবা আর দাঁড়াল না।

সৌম্যেন্দু নিজেই বলল, 'হ্যাঁ, ভোলেবাবা আমি নিশ্চয়ই যাব।

আমি তো মাঝেমধ্যে প্রয়াগে স্নান করতে যাই। পরশুই না হয় যাব।'

'ঠিক হ্যায় বেটা! আমি থাকব।'

ভোলেবাবা আর দাঁড়াল না। ত্রিশূল হাতে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিনে সকালে প্রয়াগে ত্রিবেণীর কাছাকাছি একটা উঁচু জায়গায় চুপচাপ বসেছিল ভোলেবাবা। মৌনী বাবা সেজে ধ্যানস্থ হয়ে। মনে মনে সামান্য সন্দেহ ছিল, সৌম্যেন্দু আসে কিনা। কিন্তু ভোলেবাবার সন্দেহ যে অমূলক ছিল তা' অল্পক্ষণ পরেই প্রমাণিত হল। সকাল সাতটার মধ্যে চলে এলে সৌম্যেন্দু। একা।

সৌম্যেন্দু এসে ভোলেবাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ভোলেবাবা বাধা দিল না। বরং আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলল।

সৌম্যেন্দু বিনীতভাবে বলল, 'আজ কিন্তু আপনাকে কিছু গ্রহণ করতেই হবে।'

ভোলেবাবা গম্ভীর মুখে বলল, 'দে-বেটা ফল মিঠাই দে। লেকন্ পয়সা কৌড়ি দিস্না।'

'হ্যাঁ, ভোলেবাবা, ফল মিষ্টিই এনেছি। বলে ব্যাগ থেকে ক'টা ফল এবং মিষ্টির প্যাকেট বের করে সামনে রাখল সে। তারপর অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আপনি তো অন্তর্যামী। বলতে পারেন আমি যার দেখা পেতে চাইছি তার দেখা পাব কিনা?'

'জিন্দা আউর মুর্দা? জীবিত না মৃত?' স্থির চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ভোলেবাবা।

প্রশ্নটায় সামান্য শিউরে উঠল সৌম্যেন্দু। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যাকে ভালোবাসা যায় তার প্রেতাত্মার দেখা কি পাওয়া যায় না?'

ভোলেবাবা সূক্ষ্ম চোখে তাকাল সৌম্যেন্দুর দিকে। তারপর বলল, 'হাঁ মিলেগা। থোরা দিন বাদ। লেকন্ বীচমে একঠো লেড়কা হ্যায়। উ-ও সব গড়বড় কর দেতা।'

সৌম্যেন্দু এবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'আপনি সাহায্য করতে পারেন না?'

ভোলেবাবা রাগতভাবে বলল 'ম্যায়? ম্যায় কেয়া করেগা? হাম তুম কৌই নেহি। সব মা জগজ্জননী।'

সৌম্যেন্দু করুণস্বরে বলল, 'ভোলেবাবা একবার। অন্ততঃ একবার তাকে দেখিয়ে দিন। আপনারা সব পারেন।'

ভোলেবাবা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক হ্যায় আমি কোশিস করব।'

'চেষ্টা না। আপনাকে করতেই হবে।' ভোলেবাবার পায়ে হাত রাখল সৌম্যেন্দু।

ভোলেবাবা বলল, 'ঠিক আছে, ক'রোজ বাদ আমি তুমার ঘর যাব। আভি তুম শান্ত্ মনে ঘর যাও। সমঝে?'

সৌমেন্দু উঠে পড়ল। মন কিন্তু বিষণ্ণ হয়েই রইল। মন তার শান্ত হল না।

কিছুক্ষণ পর ভোলেবাবাও উঠে পড়ল সেখান থেকে। তখনকার মতো তার কাজ শেষ।

## ॥ দশ ॥

ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু অনিন্দ্য সেন তথা গবেষক সত্যসিন্ধুর কথা কখনোই অমান্য করতে পারে না অধ্যাপক হরিসাধন নন্দী। সত্যসিন্ধুর কাজের প্রতি তার কেমন এক শ্রদ্ধা মেশানো সহানুভূতি থাকে সব সময়। সেই শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির জন্যই হরিসাধন তার অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাকে সামান্য পাশে সরিয়ে রেখে নীলাঞ্জনা এবং ইন্দ্রনীল সম্বন্ধে যত্নবান হতে বাধ্য হয়েছে।

সে কলেজের একটি ছেলেকে দিয়ে ইন্দ্রনীলকে ডেকে পাঠিয়েছে। আজ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে হরিসাধনের পড়ার ঘরে দেখা করতে বলেছে। একই সঙ্গে নীলাঞ্জনাকেও আসতে

বলেছে। তাকে আসতে বলেছে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায়।

ইন্দ্রনীল সাড়ে ছ'টার সামান্য পরেই অধ্যাপক নন্দীর ঘরে এসে হাজির হল। অবিশ্যি অধ্যাপক নন্দী ডেকে না পাঠালেও সে আসতই। নীলাঞ্জনার চিঠিটা নিতে।

সে অধ্যাপক নন্দীর ঘরে ঢুকে সপ্রতিভভাবে বলল, 'স্যার আমি নিজেই আপনার কাছে আসতাম। নীলাঞ্জনা মিত্রের সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়েছিল। চিঠির কথা বলেছে।'

হরিসাধন হাসি মুখে বলল, 'আগে বসো। বলছি সব।'

ইন্দ্রনীল সামনের চেয়ারটায় বসল।

হরিসাধন সঙ্গে সঙ্গে কিছু না বলে সামান্য সময় তাকিয়ে রইল ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আজ তোমাকে একটু অন্যরকম লাগছে। ইউ লুক ডিফারেণ্ট।'

হরিসাধনের কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে পারল না ইন্দ্রনীল। তাই সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'কেন স্যার?'

হরিসাধন ঠোঁটের কোণে একই রকম হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'কিছু মনে কোরো না। ষোলো বছর পূর্ণ হলেই বাপ-ছেলে বন্ধু। সেই সুবাদে গুরু-শিষ্যও। তাই তোমাকে কথাটা বলা যায়।'

হরিসাধন একটু সময় ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে থেকে যোগ করল, 'তোমাকে কি রকম লাগছে জানো? ধরো একটি মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। অনেক দেখাদেখি করেও না। সবাই বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। এমন সময় একটি সুপাত্র এসে যেচে বলল, আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব। তখন মেয়েটির মুখ-চোখের অবস্থা কি রকম হতে পারে একবার ভেবে দ্যাখো।'

ইন্দ্রনীল কেমন অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল।

হরিসাধন নিজেই আবার বলল, 'কিন্তু তুমি মেয়ে নও। একটি যুবক। শিক্ষিত এবং বেকার। কাজেই তোমার ক্ষেত্রে অন্য কথা ভাবছি। তোমার নিশ্চয়ই চাকরির কোনো যোগাযোগ ঘটে থাকবে। অপ্রত্যাশিত কোনো চাকরি। আই ডোণ্ট গেস হোয়াট ইট ইজ

এ্যাণ্ড হোয়াই ইউ লুক সো ডিফারেণ্ট।'

হরিসাধন তার ঠোঁটের হাসি দীর্ঘায়িত করে বলল, 'তবে তোমার আপত্তি থাকলে বোলো না। আই ডোণ্ট প্রেস ফর ইট।'

ইন্দ্রনীল লাজুক হেসে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি একটা চাকরির এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পেয়েছি। জানিনা এর কোনো ইম্প্রেসন আমার মুখের ওপর পড়েছে কিনা। তবে ব্যাপারটা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। আপনাকে সবই খুলে বলছি।'

হরিসাধন মুখে কিছু না বলে চোখ দিয়ে বলতে ইঙ্গিত করল ইন্দ্রনীলকে।

ইন্দ্রনীল সমস্ত ব্যাপারটা বলল।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে সে যোগ করল, 'ভাবা যায়, এ-রকম ভাবে কারো চাকরি হতে পারে? বিশেষ করে আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে? ইণ্টারভ্যু পর্যন্ত হয়নি। ব্যাপারটা কেমন ফিসি না?'

একটু থেমে সে আবার বলল, 'তাই ভেবেছিলাম, চাকরিতে জয়েন না করে কাউকেই কিছু বলব না। আপনাকেও বলতাম না। আপনি ধরে ফেললেন তাই—।'

হরিসাধন গম্ভীর মুখ করে বলল, 'এ্যাপলিকেশনের সঙ্গে তোমার সার্টিফিকেটের কপি-টপি সবই তো ছিল। ফটোও ছিল নিশ্চয়। ছিল না?'

—হ্যাঁ, তা ছিল। কিন্তু ইণ্টারভ্যু হল না, এটাই অদ্ভুত লাগছে।

হরিসাধন এবার সহজভাবে হাসল। মুখে হাসির রেখা বজায় রেখেই বলল, 'এই পয়েণ্ট নিয়ে এত ভাবছোই বা কেন? কে বলতে পারে, হয়তো তোমার ইণ্টারভ্যু হয়েই গেছে। চায়ের দোকানে তুমি যাকে মিট করেছো হয়তো তিনিই কোম্পানীর কোনো হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা মিয়ার কোয়েন্সিডেন্স। সমস্ত অবস্থাটাকে এ-ভাবেও তো ভাবতে পারা যায়। যায় না?'

ইন্দ্রনীলও হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এখন সেভাবে ভাবা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।'

হরিসাধন সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার যুক্তিটাও অবিশ্যি ফেলে দেবার মতো নয়। দেয়ারস ফোর্স ইন ইট। সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা অসঙ্গতি থেকেই যাচ্ছে। তবে চাকরির স্থলে গেলেই তোমার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

হরিসাধন কি একটু ভেবে বলল, 'আমিও ভেবে দেখলাম তোমার ডিসিসনই ঠিক। এখন চাকরির ব্যাপারটা কাউকে না বলাই ভালো। আই মিন নীলাঞ্জনাকেও না। আগে জয়েন করেই গ্যাখোনা রেজাল্টটা কি হয়। তারপর সব খোলাখুলিভাবে বললেই হবে।'

ইন্দ্রনীল হরিসাধনের কথার পিঠে-পিঠে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার আমিও তাই ভেবেছি। এক্ষুনি নীলাঞ্জনা মিত্রকেও কিছু বলব না। পরে একদিন পরিষ্কার করে সব বলব।'

হরিসাধন মনে মনে খুশি হল। কিন্তু মুখের ভাবে তা' প্রকাশ করল না। খুব স্বাভাবিক মুখ করে টেবিলের ড্রয়ার খুলতে খুলতে বলল, 'আর হ্যাঁ, নীলাঞ্জনার চিঠিটা।'

নীলাঞ্জনা চিঠিটা খামেই দিয়েছে। খামের মুখটা অবশ্য আঠা দিয়ে লাগানো নয়। খোলাই। খামের ওপর সুন্দর করে ইন্দ্রনীলের নাম লেখা।

ইন্দ্রনীল চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগল,—

হ্যামলেট ( ইন্দ্রনীল রায় ),

প্রীতিভাজনেষু,

আমার চিঠিটা পেয়ে হয়তো একটু অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। কারণ, এ-ভাবে চিঠি লেখার কথা না। কেউ হয়তো লেখেও না। হয়তো আপনি অনুভব করেছেন, অধ্যাপক নন্দী আমাদের দুজনকেই খুব স্নেহ করেন। স্নেহের সেই জোর নিয়েই স্যারের মাধ্যমে আপনাকে চিঠি লিখছি।

আপনি হয়তো শুনে থাকবেন 'শিল্পাঙ্গন' নামে আমার একটি দল আছে। নৃত্য প্রদর্শনই এই দলের প্রধান বিষয়। তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নৃত্যের সঙ্গে আরো কয়েকটি বাড়তি 'আইটেম' যোগ করা হবে। ক্লাসিকাল ড্রামার কিছু কিছু নির্ধারিত দৃশ্য। আপাতত শেকস্‌পীয়ারের ড্রামার কিছু কিছু অংশ। প্রথমে হ্যামলেট দিয়েই শুরু হবে। সেই জন্যেই আমার আন্তরিক অনুরোধ, আপনি আমাদের দলে যোগ দিন। এই দল নিয়ে বিদেশে যাওয়ার কথাও ভাবছি। অবশ্য সেটা ভবিষ্যতের ব্যাপার। এরপর থেকে আমাদের দলের ইনট্রোডাকশনের দায়িত্বও থাকবে আপনার ওপর। মোট কথা, আমরা আপনাকে আমাদের দলে পুরোপুরি পেতে চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি আমাদের বিমুখ করবেন না। স্যারের সঙ্গেও আপনার বিষয়ে আলোচনা করেছি।

আশায় রইলাম।

শুভেচ্ছান্তে—

নীলাঞ্জনা মিত্র।

চিঠি শেষ করে হরিসাধনের দিকে তাকাল ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল চোখ তুলে তাকাতেই হরিসাধন প্রশ্ন করল, 'কি করবে ?'

ইন্দ্রনীল এতটুকু দেরি না করে উত্তর দিল, 'আমার তো অনিচ্ছে থাকার কথাই না। কিন্তু চাকরিটা হঠাৎ এসে পড়ল।'

—তাহলে নীলাঞ্জনাকে 'না'-ই বলে দেবে ?

—না, তা নয়। 'না' বলব না। ভাবছি, মাস দুয়েকের সময় চেয়ে নেব।

—চাকরির কথা বলবে না, অথচ মাস দুয়েকের সময় চেয়ে নেবে। এর পেছনে যুক্তি দেবে কি ? কেবল বাইরে যাওয়ার কথা বললেই কি বিশ্বাসযোগ্য হবে ?

এর কি উত্তর হতে পারে ইন্দ্রনীল তা' ভেবে পেল না। তবে উত্তর দেবার সময়ও পেল না সে। তার আগেই ঘরে প্রবেশ করল নীলাঞ্জনা।

নীলাঞ্জনার পরনে সাদা চুড়িদার পাজামা এবং হালকা কমলা রঙের লম্বা কামিজ। হাতে ছোট লেডিস ব্যাগ। ঘরে ঢুকে ইন্দ্রনীলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার সেই উদ্ভাসিত চোখ-মুখ হরিসাধনের দৃষ্টি এড়াল না। সে মনে মনে হাসল।

হরিসাধন নীলাঞ্জনাকে বলল, 'এসো নীলাঞ্জনা। বোসো।'

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের পাশের চেয়ারটাতেই বসল। ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। নীলাঞ্জনার হাসির জবাবে ইন্দ্রনীলও হাসল কেবল। তার হাতে তখনো নীলাঞ্জনার চিঠিটা ধরা।

'আমার চিঠিটা পড়লেন?' লাজুক চোখে প্রশ্ন করল নীলাঞ্জনা।

হরিসাধন ইন্দ্রনীলকে উত্তর দেবার সুযোগ দিল না। সে বলল, 'হ্যাঁ, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে এতক্ষণ এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল। কি জানো, সাময়িকভাবে একটা অসুবিধে হয়েছে। তোমার গ্রুপে জয়েন করার ওর খুবই ইচ্ছে। জয়েন করবেও। কিন্তু চাকরির ব্যাপারে ওকে এলাহাবাদে আমার এক বন্ধুর কাছে পাঠাচ্ছি। চাকরিটা হয়ে যাবে। মাত্র কয়েক মাসের জন্য। তারপর কলকাতায় ফিরে আসবে, তখন—তোমার সঙ্গে যোগ দেবে।'

হরিসাধন এ-ভাবে কথাটা বলবে ইন্দ্রনীল তা' ভাবতে পারেনি। তাই সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হরিসাধনের দিকে।

নীলাঞ্জনা কিছু না ভেবেই বলল, 'এলাহাবাদে আপনার বন্ধু?'

হরিসাধন সামান্য থতিয়ে গিয়ে বলল, 'আমার ডাইরেক্ট বন্ধু না। আমার সেই গবেষক বন্ধু সত্যসিন্ধু মুন্সী, তার ডাইরেক্ট বন্ধু। ইন ফ্যাক্ট সত্যসিন্ধুই যোগাযোগটা করেছে।'

সত্যসিন্ধুর নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল। নীলাঞ্জনা সোজা হয়ে বসে টান টান চোখে তাকিয়ে বলল, 'স্যার সেদিন এক মজার ব্যাপার ঘটেছে। আপনার বন্ধু, গবেষক সত্যসিন্ধু মুন্সী আমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। আমি তখন বাড়িতে

ছিলাম না। উনি বাড়িতে গিয়ে আমার জান্‌কী-মাঈ-এর সঙ্গে অনেক গল্প করেছেন। অথচ এক কাপ চা-ও খাননি।'

হরিসাধন স্মিত হেসে বলল, 'গবেষক আমাকে সে কথা বলেছে। তোমার নাচ দেখার পর তোমার সম্বন্ধে ওর খুব কৌতূহল হয়েছিল। কেন তুমি অন্য কিছু না হয়ে নৃত্যশিল্পীই হলে। নৃত্যশিল্পীই হতে চাও। আসলে ওর গবেষণার বিষয়বস্তুই তো এইটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং সামাজিক পরিবেশ। কি পরিবেশে একজন মানুষ কি ভাবে বেড়ে ওঠে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেন তিক্ত হয়, আবার কেনই বা মধুর হয়—এই সব নিয়েই তার গবেষণা। ফলে কোনো মানুষ সম্বন্ধে সত্যসিন্ধুর যখন কৌতূহল হয় তখন সে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে অত্যন্ত ছোটখাট জিনিসও খুঁটিয়ে দেখে। ওটাই ওর বিশেষত্ব। সে বুঝতে চায়, একজন মানুষ যা' হয়েছে তা' কেন হল।'

একটু থেমে আবার যোগ করল, 'এর ফলে অনেকে ওকে ভুল বোঝে।'

নীলাঙ্গনা হেসে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমারও প্রথমটা কেমন খারাপ লেগেছিল। জান্‌কী-মাঈ অবিশ্যি ভদ্রলোকের খুব প্রশংসা করছিল।'

—জান্‌কী মাঈ কে?—হরিসাধন প্রশ্নটা না করে পারল না।

নীলাঞ্জনা মাথায় সামান্য দোলা দিয়ে একটু নড়েচড়ে বসে বলল, 'এই দেখুন আপনি নিজেও আমার জান্‌কী-মাঈ-এর কথা জানেন না। অথচ আপনার গবেষক বন্ধু সব জানেন!'

নীলাঞ্জনা হাতের এক বিশেষ মুদ্রা করে যোগ করল, 'ছেলেবেলা থেকে জান্‌কী মাঈ আমাকে মানুষ করেছে। আমার মায়ের মতো। বাঙালী নয় কিন্তু। উত্তর প্রদেশের দেহাতী মানুষ। অবিশ্যি তার কথাবার্তা থেকে আপনি ধরতেই পারবেন না যে, সে বাঙালী নয়!'

হরিসাধন সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'গবেষক কিন্তু আমাকে এসব বলেনি। ইন ফ্যাক্ট তোমাদের ওখানে কি কথাবার্তা হয়েছে

তার বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না। ওর গবেষণার ব্যাপারেও কাউকেই কিছু বলে না। তা তুমি ওর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হওনি তো ?'

'ওমা, সে কি ! অসন্তুষ্ট হতে যাব কেন ?' নালাঞ্জনা দু'হাত তুলে নিজের অজ্ঞাতেই নাচের একটা মুদ্রা করল।

ইন্দ্রনীল বলল, 'সত্যিই তো উনি অসন্তুষ্ট হতে যাবেন কেন ?'

ইন্দ্রনীলের কথায় নীলাঞ্জনা চোখের কোণ দিয়ে তাকে দেখল। ইন্দ্রনাল একটুও অপ্রতিভ না হয়ে যোগ করল, 'এটা তো গর্বের বিষয়। কারো শিল্প যদি কোনো মানুষকে বিশেষভাবে কৌতূহলী করে তোলে, তাহলে বুঝতে হবে সে সেখানে সার্থক। তার শিল্পী-জীবন সার্থক। আমার মনে হয় এ-ক্ষেত্রে অসন্তুষ্ট হবার প্রশ্ন ওঠে না। তাই না ?'

ইন্দ্রনীল হরিসাধনের মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নীলাঞ্জনার চোখের ওপর রাখল।

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিতে পারল না। ইন্দ্রনালের চোখে এমন কিছু ছিল যা তাকে স্পর্শ করল। কিছুক্ষণের জন্য যা তাকে অভিভূত করে রাখল। অবিশ্যি কয়েকটা সেকেণ্ড পরেই নিজেকে সহজ করে নিল সে। তারপর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসির ঝিলিক নিয়ে ইন্দ্রনীলের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

হরিসাধনের চোখ তখনো নীলঞ্জনার মুখের ওপরই নিবদ্ধ। নিবিষ্ট মনে সে তার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিল।

নীলাঞ্জনা বেশ সহজভাবে বলল, 'হ্যামলেট ঠিকই বলেছে।'

নীলাঞ্জনার 'হ্যামলেট' ডাকটায় শব্দ করে হেসে উঠল হরিসাধন। বলল, 'আরে ইন্দ্রনীলের নামটাই হ্যামলেট করে দিলে নাকি ? তুমি তো আচ্ছা মেয়ে।'

হরিসাধনের হাসির সঙ্গে ইন্দ্রনীলও নিঃশব্দে হাসল।

নীলাঞ্জনার চোখ মুখ সামান্য আরক্ত হল। সে লাজুক চোখে

ইন্দ্রনীলের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমিই কেবল হ্যামলেট বলি না। ইন্দ্রনীলদা-ও আমাকে শকুন্তলা বলে।'

'ইজ ইট ?' হরিসাধন আবার শব্দ করে হাসল।

হরিসাধনের হাসির ফাঁকে ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদের দুজনের চোখেই লজ্জা জড়ানো আনন্দ। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তারা নিঃশব্দে যেন অনেক কথা বলে ফেলল। অনেকদিন ধরে অনর্গল কথা বলেও বোধহয় তারা এত কথা বলতে পারত না। নিঃশব্দ কথার মাধ্যমে তারা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি চলে এলো।

হরিসাধন কৌতুকের সঙ্গে আবার বলল, 'তোমরা একটা চমৎকার ব্যাপার করে ফেলেছো। যে কোনো ক্লাসিক্স্ যে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে, তোমরা যেন সহজভাবে সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছ। হ্যামলেট শকুন্তলাকে ডাকছে, আবার, শকুন্তলা হ্যামলেটকে। যেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের-মেল-বন্ধন ঘটছে। যেন শেক্সপীয়ার কালিদাস পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে। চমৎকার !'

অধ্যাপক নন্দীর প্রশংসায় ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা দুজনেই কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল।

হরিসাধন এবার ইচ্ছে করেই বলল, 'ইন্দ্রনীল, তুমি তাহলে এবার এসো। তুমি আমার সঙ্গে আবার পরে দেখা করো।'

এরপর ইন্দ্রনীলের বসে থাকার প্রশ্ন ওঠে না। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল তাই। যাবার সময় নীলাঞ্জনাকে বলল, 'এলাহাবাদে যাবার আগে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনি না করলেও আমি করব। আমার নিজের গরজেই।' হেসে উত্তর দিল নীলাঞ্জনা।

ইন্দ্রনীলও হাসল। হাসি মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ইন্দ্রনীল চলে যেতেই হরিসাধন বলল, 'ভারি সুন্দর ছেলে। আই লাইক হিম। আই লাভ হিম।'. কথাটা শেষ করে একটু

থেমে আবার যোগ করল, 'তবে মধ্যবিত্তসুলভ কিছু কমপ্লেক্স আছে। এটাকে সমাজের ওপর এক ধরনের অভিমানও বলতে পারো। তবে চাকরি পাবার পর এই কমপ্লেক্স হয়তো থাকবে না।'

কথাটা শেষ করে হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়েছে এ-রকম একটা ভাব করে বলল, 'তোমাদের কিসের একটা বিজনেস আছে না?'

নীলাঞ্জনা ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। স্টোনের বিজনেস। তবে এখানে না। প্রতাপগড়ে। এলাহাবাদের কাছেই।'

হরিসাধন সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাদের এই বিজনেসের কথা ইন্দ্রনীল জানে?'

নীলাঞ্জনা চুলে একটা ঝটকা মেরে বলল, 'না।'

—না জানাই ভালো—বলল হরিসাধন।

—জানলে কি হবে?—নীলাঞ্জনার চোখে কৌতূহল।

হরিসাধন হেসে বলল, 'কি আর হবে? কিছুই না। তবে ওই যে বললাম কমপ্লেক্স। ওর ওই মধ্যবিত্তসুলভ কমপ্লেক্স-এ ধাক্কা লাগতে পারে। তখন তোমার সঙ্গে মেলামেশায় অত সহজ হতে পারবে কি?' একটু থেমে যোগ করল, 'অবিশ্যি কিছুই বলা যায় না।'

নীলাঞ্জনা হেসে দুটো হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠল, 'আমি ইন্দ্রনীলদা-কে বিজনেস-টিজনেসের কথা বলবোই না। তাছাড়া এসব বলতে আমার ভালোও লাগে না। এনি হাউ ওকে আমাদের গ্রুপে আনতে পারলেই আমি খুশি।'

'দ্যাটস বেটার।' হরিসাধন খুশি হল।

নীলাঞ্জনা যখন বাড়ি ফিরল তখন তার মন অকারণেই তাথৈ-তাথৈ করে নাচছে। সে জানকী-মাঈ এর সামনে ছেলেমানুষের মতো পাক খেতে খেতে নাচের বোল আওড়াতে লাগল—

'তিগ্ ধা দিগ্ দিগ্ থেই
ক্রাম-থেই ক্রাম-থেই
তিগ্ ধা দিগ্ দিগ্ থেই।'

জান্‌কী চোখ তীক্ষ্ণ করে নীলাঞ্জনাকে সামান্য সময় দেখল। তারপর বলল, 'খুকি, এত আনন্দ কেন রে? প্রেম-টেম করছিস নাকি?'

নীলাঞ্জনা মিটি মিটি হেসে বলল, 'ধেৎ, কি-যে বলিস জানকী মাঈ, প্রেম করতে যাব কেন?'

জান্‌কী ঠোঁট উল্টে বলল, 'দেখিস বাবা। আমার খুব ভয় করে। ছোটসাহেবকে তো জানিস? প্রেম-টেম একেবারে পছন্দ করে না।'

কি একটু ভেবে যোগ করল, 'আর বিয়ের কথা বললে তো বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদতে থাকে।'

শেষের কথায় নীলাঞ্জনা থম মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মুখটা হঠাৎ যেন কেমন কালো হয়ে গেল। তার মনে হল, তার জীবনের কোথায় যেন একটা ছন্দ পতন ঘটতে যাচ্ছে।

## ॥ এগার ॥

ট্রেনে উঠেও নীলাঞ্জনার কথাটা ভুলতে পারল না ইন্দ্রনীল। কি এক অপরাধ বোধ তাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। এমন এক সুর-পাগল মেয়েকে সত্যি কথাটাই বলা উচিত ছিল। বার বার ভাবতে লাগল সে। এমন এক সুর-পাগল মেয়ের কাছে সত্য গোপন করা কেবল অন্যায় নয়, অপরাধ।

ইন্দ্রনীল মনে মনে স্থির করল, প্রতাপগড়ে গিয়েই নীলাঞ্জনাকে একটা চিঠি লিখবে সে। নিজের অন্যায়টা স্বীকার করে নেবে।

'বাবুজী আপ কিধর্ যায়েঙ্গে?'

সামনের সিটে কখন যে লোকটি এসে বসেছে তা' খেয়াল করেনি ইন্দ্রনীল। প্রশ্নটা শুনে সে সামান্য অবাক চোখে তাকাল। লোক-টিকে দেখে ভালো লাগল না ইন্দ্রনীলের। কতগুলো লোক থাকে যাদের দেখলেই মনটা এক অকারণ বিরক্তিতে ভরে ওঠে,

সামনের লোকটির চেহারাও কতকটা তাই। লোকটির মুখের দিকে তাকিয়েই ইন্দ্রনীলের মুখটা বিরক্তিতে ভরে উঠল।

লোকটির মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি। ইয়া বড় পাকানো গোঁফ। বাঁ গালে একটা কাটা দাগ। হাতে চওড়া ষ্টিলের বালা। পরনে দু'ভাজ করা ময়লা ধুতি। হাঁটু অব্দি ঝুল-ওয়ালা পাঞ্জাবী গায়ে। তাছাড়া বিচ্ছিরি রকমের খ্যারখেরে গলার স্বর।

ইন্দ্রনীল বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলল, 'মুঝে পুছতা হ্যায়?'

—তো আউর কিসকো জি?

গুলি গুলি চোখ করে তাকাল লোকটি। তারপর আবার বলল 'কিধর্ যায়েঙ্গ? ইলাহাবাদ?'

'না, প্রতাপগড় যাব।' মুখে বিরক্তি নিয়েই উত্তর দিল ইন্দ্রনীল।

'পরতাপগড়?' জিভ দিয়ে এক রকম চুক চুক শব্দ করে বলল, 'বাবুজা, পরতাপগড় বহুৎ খতরনক জায়গা আছে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকোলো ইন্দ্রনীল।

লোকটি এবার পকেট থেকে চুন আর খৈনি বের করে হাতে ডলতে শুরু করল। সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'পরতা-পগড়মে একঠো বড় কোম্পানা আছে। স্টোন কা কোম্পানী। কোম্পানাকা মালিক থা এক বাঙালী বাবু অরুণাভ। মিত্র বাবু। বহুৎ শরীফ আদমী। তো এক রোজ উনহোনে খুন হো গিয়া।'

'খুন?' টান টান চোখে তাকাল ইন্দ্রনীল।

'হাঁ, বাবুজা খুন।' লোকটির গলা অবিকৃত।

ইন্দ্রনীল কি একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, ওই কোম্পানার নাম কি এ্যাপোলো কোম্পানা?'

'হাঁ হাঁ, আপ ঠিক বলিয়েছেন। ওহি নাম। অপোলো।'

ইন্দ্রনীল এবার সোজা হয়ে বসল। প্রশ্ন করল, 'তাহলে এখন ওই কোম্পানার মালিক কে?'

'কোই দুসরা আদমী হোগা।' লোকটি ঠোঁটের ফাঁকে খৈনি

ঢেলে উদাসীন গলায় কথাটা বলল।

ইন্দ্রনীল চঞ্চল হল। মনে মনে বলল, কি মুস্কিল আমি যে ওই কোম্পানীতেই জয়েন করতে যাচ্ছি। মুখে অবশ্য কিছু প্রকাশ করল না। আরো কিছু শুনবার আশায় শান্তভাবে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তা আপনি ওখানে ছিলেন বুঝি?'

'হাঁ জি।' বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বলল লোকটি।

'কতদিন ছিলেন?' প্রশ্ন করল ইন্দ্রনীল।

লোকটি উত্তর দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেনটা। লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বাবুজী, আমার টিশন আসিয়ে গেল। এখোন হামাকে উতরাতে হোবে। নমস্তে।'

লোকটি দ্রুত পায়ে নেমে গেল। ওকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা গেল না বলে ইন্দ্রনীলের আপসোস হতে লাগল।

কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল সে। যে কোম্পানীতে সে চাকরী করতে যাচ্ছে সেই কোম্পানীরই পূর্বেকার মালিক খুন হয়েছে। এই কথাটা শোনবার পর থেকেই তার মাথায় কতগুলো বিজবিজে পোকা বাঁই বাঁই করে পাক খেতে লাগল। কিসের একটা আশঙ্কা তাকে পেয়ে বসল যেন। ঠিক ভয় বা আতঙ্ক নয়। তবু একটা অচেনা অনুভূতি তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। যেন সে ওখানে যাবার পর যে কোনো মুহূর্তে একটা কিছু ঘটে যেতে পারে।

শেষে কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকেই নিজে ধমক দিল, সত্যি, বাঙালী কাজকে ভয়ই পায়। বাঙালী দূরে কোথাও যেতে চায় না। নিজের চেনা জানা চৌহদ্দির বাইরে পা বাড়াতে ভয়। নইলে কত মানুষই তো এদিক ওদিক খুন হচ্ছে। কিন্তু তাতে তার কি এসে যাচ্ছে? অথচ এই ব্যাপারটা নিয়ে সে কেন এত মাথা ঘামাচ্ছে? পুরোনো মালিক খুন হলই-বা, অন্য যে-কোনো একজন মালিক তো আছেই। চাকরিটাই তার আসল ব্যাপার, মালিক নয়।

বাকি পথ ইন্দ্রনীল আর এই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। বরং তার মন জুড়ে রইল নীলাঞ্জনার ভাবনা।

ইন্দ্রনীলের কপাল মন্দ। ট্রেনটা ঘণ্টা দুই লেটে রান করে প্রতাপগড়ে যখন পৌঁছল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। এদিকে আকাশও মেঘাচ্ছন্ন। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছে।

স্টেশনে নেমে ইন্দ্রনীল খোঁজ নিয়ে জানল, স্টেশন থেকে এ্যাপোলো কোম্পানীর দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। বাসরুট নেই। শেয়ারের ট্যাক্সি অথবা লরিতে যেতে হয়। কিন্তু অত রাতে ট্যাক্সি বা লরি কোনো কিছুই পাওয়া যাবে না।

সব শুনে ইন্দ্রনীল খুব ভাবনায় পড়ে গেল।

আসবার আগে ম্যানেজার শর্মাজীকে চিঠি লিখে ইন্দ্রনীল তার আসার তারিখ এবং সময় জানিয়ে দিয়েছে। তার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারে এই শর্মারই সই ছিল। সে মনে মনে ভাবল, চিঠিতে জানিয়ে দেওয়ার পর আজ রাতে না যাওয়াটা অশোভন হবে। তার আসার খবর পেয়ে ভদ্রলোক হয়তো কোনো ব্যবস্থা করে থাকবেন। তাছাড়া স্টেশনে থাকবেই বা কোথায়।

এই রকম সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সামনে একজন বুকিং ক্লার্ককে দেখতে পেয়ে সে হিন্দী বাঙলা মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, কোনো ভাবেই কি আজ রাতে এ্যাপোলো কোম্পানীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় না?'

লোকটি এই কথার উত্তর না দিয়ে সামান্য সময় ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বেশ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'ওখানে কি করতে যাচ্ছেন? চাকরি?'

ভদ্রলোকের মুখে বাঙলা কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল বলল, 'আপনিও বাঙালী দেখছি।'

ভদ্রলোক গম্ভীর মুখেই উত্তর দিল, 'হুঁ। তা' আপনি কি নতুন চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু দেখুন না, এসেই কি বিপদে পড়ে গেলাম : ট্রেনটা লেট করল।

ইন্দ্রনীলের কথার পিঠে পিঠে লোকটি ঠোঁট উল্টে বলল, 'কি ব্যবস্থা করব বলুন? এই রকম বিচ্ছিরি ওয়েদার। কে আর ওদিকে যাবে?'

ঠিক এই সময় ওদের সামনে হাজির হল সঞ্জয় বোস। তার মুখে জ্বলন্ত চুরুট। সে ইন্দ্রনীলকে লক্ষ্যই করল না। তাকে লক্ষ্য না করে বুকিং ক্লার্ক ভদ্রলোককে বলল, 'হ্যালো, কষ্টহরণ বাবু, কেমন আছেন?'

ইন্দ্রনীল বুঝল, লোকটির নাম কষ্টহরণ।

কষ্টহরণের মুখ থেকে গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ল। সে কতকটা কৃতার্থের হাসি হেসে বলল, 'স্যার আপনি এমন সময় এখানে? কোথাও গিয়েছিলেন? এই ট্রেন থেকে নামলেন?'

সঞ্জয় বোস দাঁতে চুরুট-টা চেপে রেখেই বলল, 'স্টেশনের কাছাকাছি একটা কাজে এসেছিলাম। কিন্তু গাড়িটা হঠাৎ বিগড়ে গেল। গাড়ি সারাতে সারাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

সঞ্জয় এমনভাবে কথা বলতে লাগল, যেন কষ্টহরণ ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। যদিও সে সত্যসিন্ধুর মাধ্যমে ইন্দ্রনীলের আসার সমস্ত খবরই পেয়ে গিয়েছিল। বস্তুত ইন্দ্রনীলকে নিতেই এই সময় তার স্টেশনে আসা। ইন্দ্রনীলকে চিনতেও তার কোনো অসুবিধে হয়নি। কারণ, ইন্দ্রনীলের ফটোটা সে আগেই দেখেছে। সেই ফটোটাও পেয়েছিল সত্যসিন্ধুর কাছ থেকেই। তবে প্ল্যাটফরমে এসে ইন্দ্রনালকে একটু খোঁজাখুঁজি করতে হয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতেই সঞ্জয়ের কষ্টহরণের সামনে আসা।

কিন্তু সঞ্জয়ের কথা-বার্তায়, ভাব-ভঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও তার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেল না।

ইন্দ্রনীল নিবিষ্ট মনে আগন্তুক ভদ্রলোক অর্থাৎ সঞ্জয়কে লক্ষ্য

করতে লাগল। ভদ্রলোকের ভাব-ভঙ্গি দেখে অনুভব করল, ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের একজন কেউকেটা ব্যক্তি। চেহারায় আচরণে বনেদীয়ানার ছাপ স্পষ্ট।

সঞ্জয়ের কথায় কষ্টহরণ বিগলিত হয়ে বলল, 'সত্যিই স্যার আপনি আমাকে ভালোবাসেন।'

সঞ্জয় দাঁতের ফাঁকে চুরুট চেপে রেখে ঠোঁটের কোণে মিহি হাসল। উত্তর দিল না কিছু।

কষ্টহরণ নিজেই আবার বলল, 'প্রায়ই আমি ভাবি, আপনার মতো এমন একজন বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনায়ার কেন যে এমন একটা জায়গায় কন্ট্রাক্টরি করতে এলেন! বিলেতে তো দিব্যি ছিলেন।'

সঞ্জয় সহাস্যে জবাব দিল, 'আপনি একি কথা বলছেন? দেশের ছেলে দেশে ফিরব না?'

কষ্টহরণ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'সে-কথা ঠিক স্যার। আপনারা আছেন বলেই তো আরো পাঁচজনের অন্নের সংস্থান হচ্ছে। আমরাও কিছু কিছু ছিটে ফোঁটা পাচ্ছি।'

ইন্দ্রনাল আর অপেক্ষা করতে না পেরে কুণ্ঠিত ভাবে বলল, 'আজ্ঞে যাওয়ার কোনো রকম ব্যবস্থাই কি করা যায় না?'

সঞ্জয় যেন এতক্ষণে ইন্দ্রনীলকে দেখতে পেল। সে ভুরু কুঁচকে তাকাল ইন্দ্রনালের দিকে।

ইন্দ্রনীলের কথায় কষ্টহরণ কি একটু ভেবে বিনীতভাবে সঞ্জয়কে বলল, 'স্যার এই ভদ্রলোকও বাঙালী। এ্যাপোলো কোম্পানীতে নতুন চাকরি করতে যাচ্ছেন। ট্রেনটা লেট করায় একটু অসুবিধেয় পড়েছেন। আপনি যদি একটা লিফ্‌ট্ দিতেন। অবশ্য লিফ্‌ট্ দিতে হলে আপনাকে অনেকটা পথ বাড়তি ঘুরতে হবে।'

সঞ্জয় কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'দ্যাটস নো ম্যাটার। ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন।' আই শুড হেলপ্। দ্যাটস্ অল।'

সঞ্জয় ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে বলল, 'চলে আসুন তাহলে। মিছিমিছি রাত করে লাভ কি?'

ইন্দ্রনীলের চোখে কৃতজ্ঞতা উছলে পড়ল। কিন্তু তার মুখে কৃতজ্ঞতার কোন ভাষা জোগাল না।

স্টেশনের বাইরে একটা জিপ দাঁড়িয়েছিল। জিপটার কাছে এসে সঞ্জয় ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে বলল, 'এইটে আমার বাহন। চলার সময় একটু বেশি ঝাঁকুনি দেয়। আদার ওয়াইজ ভেরি স্টেডি।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে গেল তার। ভুরু কুঁচকে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আই শুড হ্যাভ রিকগ্‌নাইজড ইউ আরলিয়ার। এতক্ষণ কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। এবার মনে পড়েছে। ইউ আর ইন্দ্রনীল রায় অব ক্যালকাটা। রাইট?'

একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের মুখে নিজের নামটা শুনে প্রথমটা কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনীল: পরক্ষণেই যোগাযোগের সূত্রটা অনুভব করল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এ্যাপোলো কোম্পানীর অফিসে আমার এ্যাপলিকেশন এবং ফটোটা নিশ্চয়ই দেখেছেন।'

ইন্দ্রনীলের উত্তরে খুশি হল সঞ্জয়। সামান্য শব্দ করে হেসে সে বলল, 'ইউ আর ভেরি ইনটেলিজেণ্ট।'

কথা বলতে বলতে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে বসে সে যোগ করল, 'আসুন, আমার পাশে বসুন।'

ইন্দ্রনীল আর কোনো কথা না বলে সঞ্জয়ের পাশে গিয়ে বসল।

সঞ্জয় গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বলল, 'আমার নাম সঞ্জয় বোস। এখানকার লোক অবিশ্যি সন্‌জু বাসু বলে। কণ্ট্রাকটরি করি।'

গাড়ি এবার ছুটতে লাগল। রাস্তা খারাপ না। পিচ-ঢালা পরিষ্কার পথ। তবে বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ। একটা ঝোড়ো হাওয়া সাঁই সাঁই করে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায়

চারদিক বেশ অন্ধকার। রাস্তায় আলোও নেই। জিপের হেড লাইটের আলোটাই সম্বল। মাঝে মাঝে বজ্র বিদ্যুতের স্বল্প আলোও আছে।

সামান্য সময় নিঃশব্দেই কাটল ওদের।

সঞ্জয় চুরুটটা দাঁতে চেপে রেখেই এক সময় বলল, 'দেখুন, আপনার এই চাকরিটা পাওয়ার ব্যাপারে ইনডাইরেক্টলি আমার একটু হাত আছে। কথাটা হয়তো খুবই ইররেলিভেন্ট' শোনাচ্ছে। তবু কথাটা সত্যি।'

ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সদ্য পরিচিত ভদ্রলোকের দিকে। ভদ্রলোকের মুখে এমন একটা কথা শুনবে বলে সে আশাই করেনি। অবশ্য মুখে সে কিছুই বলল না। নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল আরো কিছু শোনার অপেক্ষায়।

সঞ্জয় আবার বলল, 'যার সূত্র ধরে আপনার এই চাকরির ব্যবস্থা করেছি, সম্পর্কে আমি তার মামা। তার বয়েস আপনার বয়েসেরই কাছাকাছি। না, বরং আপনার চেয়ে সামান্য ছোটই হবে।'

ইন্দ্রনীল এসব কথার মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝল না। কাজেই তাকে চুপ করেই থাকতে হল।

সঞ্জয় ঘাড় ঘুরিয়ে আবার বলল,' 'দেখুন আপনি আমার চেয়ে বয়েসে অনেক জুনিয়র। তার ওপর এখানে চাকরি করতে এসেছেন। মানে, এখানেই থাকবেন। ফলে, এক রকম প্রত্যেক দিনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এক রকম নিজের লোকের মতোই। ইন দ্যাট কেস ইফ ইউ এ্যালাউ মি, আপনাকে আমি তুমিই বলবো। এবং আপনিও আমাকে ম্যাটারনাল আঙ্কল্ বলেই মনে করতে পারেন।'

প্রথম আলাপেই ভদ্রলোক এমন একটা প্রস্তাব করবেন ইন্দ্রনীল তা ভাবতে পারেনি। তবে পরিবেশটা এই রকম একটা প্রস্তাবের পক্ষে যে যথেষ্ট অনুকূল, তা' সে মনে মনে অস্বীকার করতে পারল না। ভদ্রলোক এই দুর্যোগের মধ্যে এক রকম ঈশ্বর প্রেরিত হয়েই

স্টেশনে পৌঁছেছিলেন। ভদ্রলোককে না পেলে আজ তাকে রীতিমতো দুর্ভোগে পড়তে হত।

তা'ছাড়া মামা-ভাগ্নের কি একটা সূত্রের কথা বলছেন। ইন্দ্রনীল মনে মনে ভাবল, এই সূত্রের কথাটা সত্যিও হতে পারে। কারণ, তার চাকরি পাওয়ার ঘটনাটা যে অভূতপূর্ব এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। কার মাধ্যমে কতটুকু হয়েছে কে জানে।

ইন্দ্রনীল ভদ্রতার হাসি হেসে বলল, 'বেশ তো তুমিই বলবেন। বিদেশে একজন আত্মীয় পাওয়া গেল। এটাও কম কথা নয়। তাছাড়া আজ আপনাকে না পেলে খুবই বিপদে পড়তাম। আপনি একরকম গড্-সেণ্ট।'

ইন্দ্রনীলের কথার উত্তরে সঞ্জয় নিঃশব্দে হাসল।

সামান্য সময় চুপ করে ইন্দ্রনীল আবার বলতে যাচ্ছিল, 'আপনি তো বললেন আমার চাকরির ব্যাপারে আপনার ইনডাইরেক্ট কনট্রিবিউশন আছে। তাহলে আপনি নিশ্চয় জানতেন যে, আমি আজই এই ট্রেনে আসছি। কারণ আপনার কথা মতো খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার কাজে জয়েন করার ব্যাপারে আপনার কৌতূহল থাকা উচিত। এবং আমি আগেই ম্যানেজার হীরালাল শর্মাকে আমার এ্যারাইভালের কথা জানিয়েছিলাম।'

কিন্তু ইন্দ্রনীল কিছু বলার সুযোগ পেল না। তার আগেই সঞ্জয় গাঢ় স্বরে বলল, 'ইন্দ্রনীল, তুমি কি জানো, প্রোপ্রাইটর অব এ্যাপোলো কোম্পানি ওয়াজ মার্ডারড্? মার্ডারড্ ব্রুটালি। ডু ইউ নো দ্যাট?'

সঞ্জয়ের কথায় ইন্দ্রনীল টান টান হয়ে বসল। তার চোখে কৌতূহল খেলা করে গেল। সে ভাবল, ট্রেনের সেই হিন্দী ভাষী লোকটির মুখে যে কথা শুনেছিল এই বাঙালী ভদ্রলোকের মুখেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি। সে অনুভব করল, এই হত্যার ঘটনাটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের আলোচনার বিষয়। অন্তত এই অঞ্চলে।

ইন্দ্রনীল তাই সঞ্জয়ের কথার জবাবে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি নিশ্চয় অরুণাভ মিত্রের কথা বলছেন ?'

সঞ্জয়ের চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে তীক্ষ্ণ চোখে ইন্দ্রনীলকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'হাউ ডু ইউ কাম টু নো ছ্যাট ? এটা তোমার তো জানার কথা নয়।'

ইন্দ্রনীল সপ্রতিভভাবে বলল, 'না জানার কথা নয়। তবু জেনেছি। প্রতাপগড়ের নাম শুনে ট্রেনের এক অপরিচিত লোক বলেছেন। আমার ধারণা, এই হত্যার ব্যাপারটা এই অঞ্চলকে খুব নাড়া দিয়েছে।'

সঞ্জয় কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার গাঢ় স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক। এই দুর্ঘটনা, র‍্যাদার এই হত্যাকাণ্ড, লোকাল পিপল্‌কে খুবই রি-এ্যাক্ট্ করেছে। অন্তত সেই সময় অনেকেই বিচলিত হয়েছিলেন। তবে ঘটনা তো আজকের না। কুড়ি বছর আগের।'

কুড়ি বছর আগের ঘটনা শুনে ইন্দ্রনীলের কৌতূহল অনেকটা প্রশমিত হল। বাইবের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। কতকটা নিরুৎসাহে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার কৌতূহল এবং উৎসাহ উদ্দীপিত হল সঞ্জয়ের কথায়।

সঞ্জয় সামনে রাস্তার ওপর দৃষ্টি রেখেই বলল, 'কিন্তু মার্ডার তো একটা হয়নি। হয়েছিল দুটো। সামান্য সময়ের ব্যবধানে। এবং এবার মার্ডারড্ হল অরুণাভ মিত্রের স্ত্রী।'

'বলেন কি।' ইন্দ্রনীলের চোখে বিস্ময়। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করল 'খুনি ধরা পড়েছিল ?'

সঞ্জয় খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'না। খুনি কে ধরার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। কারণ, পুলিশের চোখে দুটো মৃত্যুই ছিল আত্মহত্যা, হত্যা নয়। বোথ সুইসাইড এ্যাণ্ড নট মার্ডার।'

'স্ট্রেঞ্জ।' ইন্দ্রনীলকে সামান্য চিন্তিত দেখাল।

সে কয়েক সেকেণ্ড কি ভেবে বলল, 'কিন্তু এই দুটোই যে হত্যা, আই মিন মার্ডার, আপনারা সেটাই বা মনে করছেন কেন? কোনো মোটিভ দেখতে পেয়েছেন কি?'

ওদের জিপটা তখন একটা বাঁকের মুখে এসে পড়েছিল। সঞ্জয় নিঃশব্দে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাঁকটা পেরোল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'না, এ্যাপারেণ্টলি কোনো মোটিভ খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে?' ইন্দ্রনীল প্রশ্নটা না করে পারল না।

সঞ্জয় মৃদু হেসে বলল, 'দ্যাটস এ পারটিন্যাণ্ট কোশ্চেন। তাহলে? এই তাহলের উত্তরের ওপরই নির্ভর করছে অনেক কিছু। একজন অপরাধীর অপরাধ দিনের আলোয় প্রকাশ পাওয়া না পাওয়া।'

সঞ্জয় আবার নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে লাগাল।

বাইরে তখন ছিপ ছিপ বৃষ্টির সঙ্গে সাঁই সাঁই হাওয়া। বৃষ্টির ছাঁট সামান্য সামান্য গায়ে এসে লাগছে। গাড়ির হেড লাইটের আলোয় রাস্তার পাশের গাছগুলোকে দেখাচ্ছে কতকটা ভূতের মতন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাহাড় এবং টিলা। দু'এক খানা লরি মাঝে-মধ্যে ছুটে যাচ্ছে। তাছাড়া পথ প্রায় জন-মানব শূন্য।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে সামান্য সময় ভাবল ইন্দ্রনীল। মনে মনে সে তখন এই খুনের ঘটনার সঙ্গে নিজেকে বেশ জড়িয়ে ফেলেছে। এত বড় একটা ব্যাপারকে সে কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছে না।

সঞ্জয় ঘাড় ঘুরিয়ে ইন্দ্রনীলকে একবার দেখল। ইন্দ্রনীল তখন চিন্তিত মুখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখে সে অনুভবে বুঝল, ইন্দ্রনীল এই ব্যাপারটার সঙ্গে মনে মনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা তার চিন্তার জগতে একটা ছাপ ফেলে গেছে। সঞ্জয় এটাই চেয়েছিল। এর জন্যেই তার এত কিছু বলা। ইন্দ্রনীলের মুখের ওপর চিন্তার ছাপ দেখে সঞ্জয় মনে মনে খুশি হল তাই।

সঞ্জয় বেশ গম্ভীর মুখেই বলল, 'তুমি এই ঘটনা দুটোর সঙ্গে মেনটালি খুব ইনভলভ্ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

ইন্দ্রনীল মৃদু স্বরে বলল, 'ন্যাচারালি।' পরক্ষণেই যোগ করল, 'কোম্পানির বর্তমান প্রোপ্রাইটর কে? ছেলে?'

সঞ্জয় বাইরে দৃষ্টি রেখে খুব সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল, 'না, অরুণাভ মিত্রের কোনো ছেলে ছিল না। একটি মাত্র মেয়ে। তার এখনো বিয়ে হয়নি। লিগ্যালি সেই প্রোপ্রাইটর। তবে সে এখানে বেশি থাকে না। এখনো নেই। কার্যত মালিক সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। অরুণাভর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভাই এর মতন। প্রথম থেকেই সে কোম্পানির টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অংশের মালিক। অরুণাভবাবু মৃত্যুর আগে তাকেই মেয়ের গার্জিয়ান করে গিয়েছিলেন। মেয়ে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তিনিই ছিলেন ট্রাস্টি। স্ত্রীকে কিছুই দেননি। যেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মেয়েকে নাবালিকা রেখে মারা যাবেন।'

কথাটা শেষ করে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল সঞ্জয়।

ইন্দ্রনীল ভুরু কুঁচকে বলল, 'এখানেই তো একটা গোলমাল থেকে গেছে। অরুণাভ মিত্রের দলিলের মধ্যেই। অরুণাভবাবু নিজের আত্মহত্যার কথা ভেবে দলিল করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর আত্মহত্যার কথা আগাম ভাববেন কি করে? একসঙ্গে হলেও বা কথা ছিল।'

সঞ্জয় হাসি মুখেই উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমাদেরও এখানেই খটকা লেগেছে। কোন অবস্থায় অরুণাভ মিত্র এ-রকম একটা দলিল করেছিল সেটা জানতে পারলেই সম্ভবত অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ইন্দ্রনীল আর কিছু বলল না।

সঞ্জয় আর একটা বাঁকের মুখে এসে বলল, 'আমরা কিন্তু এসে গেছি। ওই যে দুটো টিলা দেখা যাচ্ছে, ওরই কাছাকাছি হীরালাল শর্মার বাড়ি। এক সময় এই অঞ্চলটা খুবই নির্জন ছিল, তবে এখন

কিছু বসতি হয়েছে।'

একটু থেমে যোগ করল, 'লক্ষ্য করো, দুটো টিলার একটা আকৃতিতে বড় কিন্তু অনেক নিচু। ওই নিচু টিলার ওপরই অরুণাভ মিত্রের বাড়ি। বাড়ির নাম মিত্র-ভিলা। সৌম্যেন্দুবাবু ওখানেই থাকেন। প্রথম থেকেই। তিনি অবিশ্যি বিয়ে-টিয়ে করেন নি। ব্যাচিলর মানুষ। সম্পূর্ণ একা। আর এই বড় টিলার সামনে কোণাকুণিভাবে দাঁড়িয়ে ওই যে টিলাটা, ওটা আকৃতিতে ছোট, কিন্তু অনেক উঁচু। এখান থেকেই তা' নিশ্চয় বুঝতে পারছো। ওর ওপরেও ছোট্ট একটা বাড়ি আছে। সেটা খালিই থাকে। তবে পরিষ্কার-টরিষ্কার করা হয়। ওটাও এ্যাপোলো কোম্পানির মালিকের বাড়ি। ওর নাম ওয়াচ-টাওয়ার।'

দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সঞ্জয় আবার বলল, 'দূরে দূরে আরো ছোট-বড় টিলা দেখতে পাচ্ছ। এদের অনেকগুলোকেই ডিনামাইট চার্জ করে ফাটিয়ে ফাটিয়ে পাথর বের করা হবে।'

ইন্দ্রনীল সঞ্জয়ের শেষের কথায় তেমন কান দিল না। সে নিচু টিলার ওপর যে বাড়িটা তার দিকে তাকিয়ে রইল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে এবং ক্ষণিক বিদ্যুৎ-প্রভায় মিত্র-ভিলাকে পুরোনো দুর্গের মতো কেমন রহস্যময় বলে তার মনে হল।

সঞ্জয় আবার বলল, 'ওয়াচ-টাওয়ারের নিচে এক দিকে পাথরের বড় বড় চাঁই ছড়ানো থাকে। জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। চার দিকে এবরোখেবরো গর্ত। অরুণাভবাবুর রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত দেহটা ওখানেই পাওয়া গিয়েছিল। সন্দেহ করা হয়েছে, অরুণাভবাবু ওয়াচ-টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।'

'আর ওঁর স্ত্রী? তার মৃত্যু হয়েছিল কিভাবে?' প্রশ্ন করল ইন্দ্রনীল।

সঞ্জয়ের মুখটা কেমন থমথম করতে লাগল। সামান্য সময় চুপ করে থেকে সে বলল, মিসেস মিত্রের ডেড বডি তাঁর বেড-রুমের সিলিং-এর আংটায় ঝুলতে দেখা যায়। তাঁর পরনের শাড়ির ফাঁসই

ছিল তার গলায়। তাঁর পায়ের কাছে একটা টুলও পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। টু পুলিশ ইট ওয়াজ এ ক্লিন কেস অব সুইসাইড।'

'কিন্তু পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ?' ইন্দ্রনীলের কৌতূহলী প্রশ্ন।

সঞ্জয় গম্ভীর মুখেই বলল, 'দুটো রিপোর্টেই সন্দেহের অবকাশ ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, ডেথ ডিউ টু হেড ইনজুরি। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্বাসরোধের কথা বলা ছিল। কিন্তু এই দুটো ব্যাপার থেকে কোনো কিছুই স্পষ্ট হয় না। আর এই অস্পষ্টতার জন্যেই দুটো মৃত্যুকেই পুলিশ আত্মহত্যা বলে ধরে নিয়েছিল।'

কথা বলতে বলতে সঞ্জয় হঠাৎ ব্রেক কষল। ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'এবার তোমাকে নামতে হবে। রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িটাই হীরালাল শর্মার। হ্যাঁ, একটা কথা, কাজের জন্যে প্রায়ই আমাকে এদিকে আসতে হয়। কখনো কোনো প্রয়োজন হলে আমাকে বোলো। আমার নিজের বাড়ি এলাহাবাদ। তবে কাজের জন্য প্রতাপগড়েও একটা শেলটার আছে। প্রায়ই এখানে থাকি। একাই। আজো থাকব। আর একটা কথা। পথে যে-সব আলোচনা হল, তা' কাউকে বোলো না। তোমাকে তো এখানে চাকরি করতে হবে। তাই বললাম।'

সঞ্জয়ই প্রথম গাড়ি থেকে নামল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনীলও।

ইন্দ্রনীল সঞ্জয়কে নমস্কার করে রাস্তাটা পার হবার মুহূর্তে একটা বাধা পেয়ে চমকে উঠল। একটা লোক অন্ধকার থেকে মাটি ফুঁড়ে যেন হঠাৎ তার সামনে হাজির হল। ইন্দ্রনীল সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল।

লোকটি সামনে এসেই চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'মা তারা। লীলাময়ী জগজ্জননী মা।'

ইন্দ্রনীল এবার ভালো করে লক্ষ্য করল। লোকটির পরনে লাল কাপড়। কপালে রক্ত তিলক। গলায় হাড়ের মালা। মাথায় জটা। মুখে দাড়ি। হাতে ত্রিশূল। কাঁধে ঝোলানো তাপ্পি দেওয়া ঝুলি। লোকটি অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, 'যা বেটা যা, আপনা ঘর

যা। ইধর কিঁউ আয়া?'

কিন্তু ইন্দ্রনীলের উত্তরের জন্য সে অপেক্ষা করল না। যেমন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিল তেমনি অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল।

সঞ্জয় আবার গাড়িতে উঠল। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করে বলল, 'যাও এগিয়ে যাও। দরজায় নক করো।'

দরজায় নক করতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এল দোহারা চেহারার একটি মানুষ। বয়েস পঞ্চাশের মধ্যে। মানুষটি দরজা খুলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল।

ইন্দ্রনীল কুণ্ঠিত ভাবে বলল, 'আজ্ঞে এটা তো হীরালাল শর্মার বাড়ি?'

লোকটি আর একবার ভালো করে ইন্দ্রনীলকে দেখল। তারপর মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমিই হীরালাল শর্মা। তা আপনি নিশ্চয় ইন্দ্রনীল রায়।'

হীরালাল শর্মা ইন্দ্রনীলের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই আবার বলল, 'আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। তবে দেরি দেখে ভাবলাম, আজ বুঝি আর এলেন না। তা আসুন, ভেতরে আসুন। পথে নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে?'

ইন্দ্রনীল বিনয়ের হাসি হেসে বলল, 'না কষ্ট কি? তবে ট্রেন লেট ছিল, তাই একটু দেরি হল। স্টেশনে এক ভদ্রলোকের গাড়ি না পেলে হয়তো আসতেই পারতাম না আজ।'

কথাটা বলে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সঞ্জয়ের গাড়ি অনেকটা দূর চলে গেছে। সে তাই ভদ্রলোকের নাম-ধাম আর বলল না।

হীরালাল বাড়ির একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইন্দ্রনীল বাবু, আপনার জন্য এই ঘরটা রেডি করে রেখেছি। কটা দিন এখানেই থাকুন। তারপর আপনি আপনার কোয়ার্টারে চলে যাবেন।'

ইন্দ্রনীল পরিপাটি ঘরটার দিকে তাকিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলল।

## ॥ বারো ॥

ইন্দ্রনীল ভেবেছিল, নতুন জায়গায় ঘুমটা ভালো হবে না। বিশেষ করে এত ঝামেলা করে আসার পর। তাই রাত জাগতে হবে ভেবে বেশী কিছু খায়নি। কোনো রকমে মুখে ত্নটো গুঁজেই শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু কার্যত ইন্দ্রনীলের আশঙ্কা মিথ্যে প্রতিপন্ন হল। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

সকালে জল-খাবারের পাট চুকলে শর্মাজী কিছুক্ষণের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ফিরে এসে তাকে ছোট সাহেবের কাছে নিয়ে যাবে। ছোট সাহেবের কাছ থেকে ফিরে সে সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারবে। কারণ, সেটা ছুটির দিন।

বাড়ির বাইরের দিককার বারন্দায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখছিল সে। দূরে দূরে অনেকগুলো ছোট-বড় টিলা দেখা যাচ্ছে। সকালের রোদ পড়েছে তাদের মাথায়। সকলের মাথাতেই সবুজের ছোঁয়া। ইন্দ্রনীল দূর থেকে দৃষ্টিটা একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে এলো।

সামনেই পিচ ঢালা চওড়া রাস্তা। গতকাল স্টেশন থেকে এই রাস্তা ধরেই এসেছিল সে সঞ্জয় বোসের সঙ্গে।

ইন্দ্রনীল মনে মনে গতকালের আলোচনা রোমন্থন করতে লাগল। খুঁটিয়ে ভাবতে লাগল ত্নটো অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।

কিন্তু তার চিন্তায় বাধা পড়ল। সামনের ক্ষেতে একঝাঁক টিয়া পাখি এসে বসল। সে এর আগে এতগুলো বন্য টিয়া একসঙ্গে দেখেনি। সে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল ওদের। সবুজ ক্ষেতের সঙ্গে সবুজ টিয়ার মেশামেশি দেখতে দেখতে কতকটা অকারণেই নীলাঞ্জনার কথাটা মনে পড়ল। নীলাঞ্জনার কথা ভাবতে গিয়ে যেমন তার আনন্দ হল, তেমনি তাকে ছেড়ে আসায় একটা ত্নঃখও অনুভূত হল সঙ্গে সঙ্গে। প্রতাপগড়ে আসার পর এই প্রথম সে ত্নঃখের অনুভূতিটা টের পেল। গতকাল থেকে যেন একটা ঘোরের মধ্যেই কাটছিল

তার। বিশেষ করে সঞ্জয় বোসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই।

গত রাতেও ঘুমোবার আগে সঞ্জয় বোসের কথাগুলো তার মাথার মধ্যে চক্কর মেরেছে। এবং এইজন্যই নীলাঞ্জনার কথা ভাববার অবকাশ পায়নি।

কিন্তু এই মুহূর্তে বন্য টিয়ার সবুজ রঙটা যেন নীলাঞ্জনাকে আবার বড় কাছাকাছি এনে দিল। ইন্দ্রনীল ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে নীলাঞ্জনার নামটা উচ্চারণ করল তাই।

আর ঠিক তক্ষুণি একটা উৎকট চিৎকার, না ঠিক চিৎকার না, যেন একটা চাপা হুঙ্কার তার কানের পর্দার ওপর আছড়ে পড়ল।

'জয় মা জগজ্জননী।'

আচমকা চাপা হুঙ্কারটা কানের ওপর আছড়ে পড়তেই ইন্দ্রনীল চমকে উঠল। দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখল, গত রাতের সেই ভোলে-বাবা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটের ফাঁকে, চোখের কোণে অদ্ভুত এক হাসি লেগে আছে।

ভোলেবাবার চোখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গিয়ে কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে স্থির চোখে সামান্য সময় ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুম কৌন?'

ইন্দ্রনীল প্রথমটা ভেবেছিল, কোনো উত্তর দেবে না। পরে কি ভেবে বলল, 'আমি এখানে নতুন এসেছি।'

ভোলেবাবা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকেই পরিষ্কার বাংলাতে বলল, 'সে-তো জানি। কিন্তু কেন এসেছিস?'

এ-রকম অভদ্রোচিত প্রশ্নে ইন্দ্রনীলের বিরক্ত হওয়ার কথা। অন্য সময় হলে বিরক্ত হতও। কিন্তু ভোলেবাবার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে, সে বিরক্ত হতে গিয়েও হতে পারল না। বরং কতকটা সমীহ করেই উত্তর দিল, 'এ্যাপোলো কোম্পানিতে নতুন চাকরি নিয়ে এসেছি।'

ভোলেবাবা ইন্দ্রনীলের কপালের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সে তো কপালের রেখা দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু বিয়ে করিসনি কেন?'

এই প্রশ্নে ইন্দ্রনীল মনে মনে হাসল। ভাবল, লোকটি সস্তায় বাজীমাৎ করতে চাইছে। অতীত বলে দেবার ক্ষমতা দেখাতে চাইছে। কিন্তু এ-রকম অতীত সবাই বলতে পারে। এর জন্যে কোনো বাড়তি ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। চাকুরিজীবী বাঙালীর ক'জন বেকার অবস্থায় বিয়ে করে? সে তাই সামান্য হেসে উত্তর দিল, 'বেকার অবস্থায় কি করে বিয়ে করি বলুন?'

ভোলেবাবার চোখের কোণে আবার একটা হাসির ঝিলিক দেখা দিল। বেশ শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু তোর মনের পর্দায় একটি মেয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছি যে। সুন্দরী মেয়ে। ঠিক কথা তার সঙ্গে তোর বেশি দিনের পরিচয় নয়। তবে অল্প দিনেই মনের মধ্যে স্পষ্ট ছবি উঠে গেছে।'

ভোলেবাবা এমন ভাব-ভঙ্গি করে কথা বলল, যেন সে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছে।

ইন্দ্রনীল কৌতূহলী চোখে ভোলেবাবার দিকে তাকাল এবার। এবং ইন্দ্রনীলের সেই কৌতূহলী চোখ ভোলেবাবার দৃষ্টি এড়াল না। ইন্দ্রনীলের কৌতূহলে আর একটু ইন্ধন জোগাবার জন্যে খুব গোপন কথা বলার মতো করে অত্যন্ত নিম্ন স্বরে সে বলল, 'আরে মেয়েটি তো নাচ-গান খুব ভালবাসে দেখছি। আর তোকেও খুব ভালবাসে। হ্যাঁ, খুবই ভালবাসে। কিন্তু ।'

কি একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল ভোলেবাবা।

ভোলেবাবা থেমে যেতেই ইন্দ্রনীল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কি কিন্তু?'

ভোলেবাবা চোখ তীক্ষ্ণ করে গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, 'একটু গোলমাল আছে।'

'গোলমাল? কিসের গোলমাল?' ইন্দ্রনীল যে এর মধ্যে ভোলেবাবাকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে নিজেই তা' বুঝতে পারেনি। তাই উদ্বেগের সঙ্গেই প্রশ্নটা করে ফেলল সে।

ইন্দ্রনীলের মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখে ভোলেবাবার ছদ্মবেশে

সত্যসিন্ধু মনে মনে খুশি হল। ভেতরে ভেতরে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, যাক, ইন্দ্রনীল তাহলে সত্যি সত্যি নীলাঞ্জনাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। কিন্তু বাইরে চোখে-মুখে খুশির বা স্বস্তির প্রকাশ ঘটল না। খুশির পরিবর্তে বরং চিন্তার রেখা তার কপালে ফুটে উঠল।

ভোলেবাবা চিন্তিত মুখে বলল, 'মেয়েটির মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। সে ভালো। খুবই ভালো। কিন্তু ওর জীবনে একটি বাজে লোক আছে। দুষ্ট গ্রহের মতো। খুব খারাপ লোক সে। তাই হুঁশিয়ার থাকবি।'

ইন্দ্রনীল কেমন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগল।

ভোলেবাবা চলে যাবার জন্যে সামনে পা বাড়িয়েও থেমে গেল। ইন্দ্রনীলের দিকে করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সামান্য হাসল। তারপর বলল, 'বুঝলি বেটা, যত ভয় করবি, ভয় তত পেয়ে বসবে। আর ভয় পেলেই দুষ্টু মানুষ মাথায় চেপে বসে। মন থেকে ভয়কে তাড়াতে পারলেই কিন্তু জয় হাতের মুঠোয় চলে আসে। ভয়কে জয় করতে পারলেই জীবনে জয়ী হতে পারবি। ভয়কে জয় কর। মা ভৈ।'

ইন্দ্রনীলের মুখে কি প্রতিক্রিয়া ঘটল তা' দেখার জন্যেও ভোলেবাবা আর দাঁড়াল না। কথাটা বলেই সে সামনে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল।

ইন্দ্রনীল নিঃশব্দে অপসৃয়মান মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনের মধ্যে তখন গুটিকয়েক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়েছে।

কিন্তু ইন্দ্রনীল তার মনের গভীরে সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখার মতো সময় পেল না। তার আগেই ইন্দ্রনীলের পাশে এসে দাঁড়াল হীরালাল। সে সহাস্যে বলল, 'কি মশাই, ভোলেবাবা আপনার ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ বলে গেল বুঝি?'

হীরালালের কথায় ইন্দ্রনীলও হাসল। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বলল, 'লোকটি কিন্তু সুন্দর বাঙলা বলে।'

হীরালাল কাঁধ দুটো নাচিয়ে বলল, 'বাঙালীও হতে পারে। সাধু-

সন্ন্যাসীরা আবার পূর্বাশ্রমের কথা কিছু বলে না।' একটু থেমে বলল, 'ছোট সাহেব আবার ভোলেবাবার খুব ভক্ত। তাঁর মতে, ভোলেবাবা একজন উঁচু দরের সাধক।'

ইন্দ্রনীল কৌতূহলী চোখ তুলে প্রশ্ন করল, 'সত্যি নাকি?'

হীরালাল সহাস্যে উত্তর দিল, 'সত্যি-মিথ্যে জানি না মশাই। উনি বলেন তাই শুনি। আসলে ছোট সাহেবের তো ভূত-প্রেতের বাতিক আছে। ওই জন্যেই তান্ত্রিক-টান্ত্রিকের পেছনে একটু ছোটাছুটি করেন।'

ইন্দ্রনীল বেশ অবাক হয়ে বলল, 'ভূত-প্রেতের বাতিক মানে?'

হীরালাল শর্মা সহাস্যে বলল, 'ওই প্ল্যানচেট করা আর কি। প্রায়ই নাকি প্ল্যানচেট করে আত্মা আনেন। এখন আবার জুটেছে ওই ভোলেবাবা।'

ইন্দ্রনীল হালকা ভাবে হেসে বলল, 'তা-ই বলুন, প্ল্যানচেট!' তারপর মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে যোগ করল, 'প্ল্যানচেট আর এমন কি ব্যাপার? আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমিও তো বার কয়েক চেষ্টা করেছি।'

'রিয়্যালি?' হীরালাল শর্মা ভুরু সূক্ষ্ম করে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। তারপরে ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি টেনে নিয়ে বলল, 'আপনি তাহলে বিশ্বাস-সাহেবের গুড বুকে পড়ে গেলেন।' একটু থেমে যোগ করল, বিশ্বাস-সাহেব কে তা বুঝতে পারছেন তো? আমাদের ছোট সাহেব।'

ইন্দ্রনীল চোখের ইঙ্গিতে বোঝাল যে, সে বুঝতে পেরেছে।

হীরালাল এবার কথা বলতে বলতে 'মিত্র-ভিলার' দিকে অগ্রসর হল। ইন্দ্রনীলও নিঃশব্দে অনুসরণ করল তাকে।

হীরালাল হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আমাদের যিনি বড় সাহেব তিনি মিঃ মিত্র। অনেক আগেই মারা গেছেন। এখন তার এক-মাত্র মেয়ে আছেন। কোম্পানির প্রধান অংশীদার তিনিই।'

ইন্দ্রনীলের কাছে এ-সব কথা নতুন মনে হল না। কারণ সঞ্জয়

বোসের কাছে আগেই সে এ-সব কথা শুনেছে।

হীরালাল আরো বলতে লাগল, 'তবে মিস মিত্র-কে কোনো কিছুই দেখতে হয় না। ছোট সাহেব বাবার মতো তাকে সব সময় আগলে রাখেন। কোনো রকম ঝুট-ঝামেলার আঁচ তার গায়ে লাগতে দেন না। এদের ব্যবসা তো খুব একটা ছোট নয়। পাথরের কারবার ছাড়াও রোড-ট্রান্সপোর্টের কারবার আছে। চুনারেও পাথরের ইজারা নেওয়া আছে। এই সব ক'টার ওভার-অল চার্জে আছি আমিই। আপনাকে নিয়ে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার চারজন। আপনি কেবল প্রতাপগড়ের পাথরের কারবারের জন্যেই এ্যাপয়েণ্টেড। এখানকার অফিসে কেবল অফিস-স্টাফই আছে কুড়িজন। তাছাড়া অন্যান্য কাজে আরো অনেক লোক আছে। সেলস্‌-এও কম লোক নেই। এত সব দেখাশোনার ব্যাপারে ঝুট-ঝামেলাও আছে। মিস মিত্র কোনো কিছুর মধ্যেই থাকেন না। যা কিছু ছোট সাহেব।'

মিত্র-ভিলার টিলাটাকে বেড় দিয়ে উঠে গেছে মোটর গাড়ি চলার মতো পাকা রাস্তা। হীরালাল কথা বলতে বলতে ততক্ষণে সেই রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় এসে গেছে। রাস্তার দু'পাশের সাজানো গাছ এবং তার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি-নন্দন মিত্র-ভিলার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনীল বলে উঠল, 'বাঃ চমৎকার জায়গাতো!'

হীরালাল প্রত্যুত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, সুন্দর জায়গা। আসলে বড় সাহেব খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন তো। আর ছোট সাহেব বড়-সাহেবের সবকিছু খুব ভালোভাবে মেইনটেইন করেন।' একটু থেমে যোগ করল, 'সত্যি কথা বলতে কি, এ-রকম সেকেণ্ড ম্যান হয় না মশাই। আমি অন্তত দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। বন্ধুর মেয়ের জন্য এত ভাবনা কেউ ভাবে না। বন্ধু এবং বন্ধু-পত্নী অকালে মারা গেছেন বলে, ভদ্রলোক তাদের মেয়ের কথা ভেবে নিজে বিয়েই করলেন না। এ-রকম ব্যাপার কোথাও দেখেছেন? ওর মন খুবই উদার। তবে একটু রাগী, এই যা।'

ওরা তখন মিত্র-ভিলার একেবারে সামনে এসে গেছে। হীরালাল

বলল, 'ভেতরে চলুন। সম্ভবত ছোট সাহেব ড্রইংরুমেই আছেন।'

ইন্দ্রনীল হীরালালের পেছনে পেছনে ড্রইংরুমে ঢুকে দেখল, একজন বয়স্ক মানুষ সোফায় কতকটা গা এলিয়ে বসে আছে। যার আর কেউ নেই। একেবারে একা। মানুষটি বয়স্ক হলেও স্বাস্থ্য অটুট। টান টান চেহারা। তবে খুবই অন্যমনস্কভাবে বসে ছিল সে।

ইন্দ্রনীল এবং হীরালাল ঘরে ঢুকল, কিন্তু মানুষটি তাদের লক্ষ্যই করল না। যেন একেবারে ধ্যানস্থ।

অনুচ্চ কণ্ঠে হীরালাল বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু, ইনিই ছোট সাহেব।'

ইন্দ্রনীল ভালো করে মানুষটিকে দেখল। মনে মনে বলল, ইনিই তাহলে সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। কোম্পানির লোকে যাকে ছোট সাহেব বলে। প্রথম দর্শনে ইন্দ্রনীলের কিন্তু মানুষটিকে খারাপ লাগল না।

হীরালাল এবার সৌম্যেন্দুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সামান্য জোরেই বলল, 'নমস্কার স্যার।'

সৌম্যেন্দু এমনভাবে তাকাল যেন তার ধ্যান ভঙ্গ হল। সে চোখ ফিরিয়ে তাকালই কেবল। কিন্তু মুখে কোনো শব্দ করল না।

সৌম্যেন্দু তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনীলও হাত তুলে নমস্কার করল। মুখে অবশ্য কোনো শব্দ উচ্চারণ করল না।

হীরালাল মুখে সামান্য হাসি নিয়ে ইন্দ্রনীলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'স্যার ইনিই আমাদের নতুন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার। ইন্দ্রনীল রায়। গত রাতে এসেছেন। আমার বাড়িতেই ছিলেন। খুব ভালো ছেলে স্যার। খুবই এ্যাকোমোডেটিং।'

সৌম্যেন্দু বিশ্বাস সোজা হয়ে বসে বলল, 'দেখুন শর্মাজী, এসব আপনার ব্যাপার। আপনি এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন, আপনিই ওনাদের সবাইকে নিয়ে কাজ করবেন। ভালো হলে আপনার কাজের সুবিধে, ভালো না হলে আপনি ট্রাবলে পড়বেন।'

হীরালাল কোনো উত্তর দিল না। বিগলিতভাবে হাসল কেবল।

সৌমোন্দু আবার বলল, 'আপনারা দাঁড়িয়ে কেন? বসুন। বসুন ইন্দ্রনীল বাবু।'

হীরালাল একটা সোফায় বসল। আর একটা সোফায় ইন্দ্রনীল।

সৌমোন্দু ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে অদ্ভুত এবং রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কাল রাতে ইচ্ছে করলেই কষ্টহরণ আপনাকে শর্মাজীর বাড়ি পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। তবে সঞ্জয় বোসের গাড়ির ব্যবস্থা সে-ই করেছে।

একটু থেমে যোগ করল, 'এই সঞ্জয় বোস লোকটাকে কিন্তু আমি পছন্দ করি না। একেবারেই না। কারণ, ভদ্রলোক এ্যাপোলো কোম্পানির ক্ষতি চায়। সে চায়, এ্যাপোলো কোম্পানির সর্বনাশ হোক। অবশ্য এর পেছনে পুরোনো একটা ইতিহাস আছে। আমি সেই ইতিহাস আপনাদের বলছি না, কারণ, আজ সেই ইতিহাস বলতে যাওয়া অনর্থক। আপনারা কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, ভদ্রলোক এ্যাপোলো কোম্পানির পয়লা নম্বর শত্রু। সুতরাং আপনাদেরও শত্রু।'

হীরালাল কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সৌম্যেন্দু তাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনীলের মুখের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করে, বলল, 'আপনার পৌঁছবার খবরটা আমি গতকালই পেয়ে গেছি। ব্যাপারটা কি জানেন, আমি ইচ্ছে না করলেও কেমন করে যেন আমার কাছে সব খবর পৌঁছে যায়।' বলে আবার সেই রহস্যময় হাসি হাসল সৌম্যেন্দু।

এই সময় হীরালাল আবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দরজায় কার ছায়া পড়ল। তিনজন একই সঙ্গে দরজার দিকে ফিরে দেখল, দরজায় দাঁড়িয়ে ভোলেবাবা।

ভোলেবাবাকে দেখেই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল সৌম্যেন্দু। বিনীতভাবে বলল, 'আসুন, ভোলেবাবা আসুন। আপনি ঠিক কথাই বলেছিলেন, খবর পেয়েছি, মেয়েটি একটু বিপাকেই পড়েছে। তা'

আমিও তাকে এখানে তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিয়েছি।'

ভোলেবাবা অমায়িকভাবে হাসল। তারপর বলল, 'লেকিন, বেটা, সবকো সামনা সব কুছ বাতানা ঠিক নেহি। ঘরকা বাত্ ঘরমে রাখনা চাহিয়ে। সমঝে?'

সৌম্যেন্দু ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হীরালালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা তাহলে এখন আসুন শর্মাজী। ইন্দ্রনীলবাবু, আপনার সঙ্গে আবার পরে কথাবার্তা হবে।'

হীরালাল শর্মা এবং ইন্দ্রনীল উঠে পড়ল।

## ॥ তেরো ॥

ইন্দ্রনীলের কাজ মোটামুটি অফিসের সুপারভিশন সংক্রান্ত। বলা যায়, অফিসের কে কোন কাজ করছে এবং কে কোন কাজ করবে, শর্মাজীর উপদেশ অনুসারে তার একটা ছক রাখাই ইন্দ্রনীলের প্রধান কর্তব্য। তাছাড়া অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট-সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদানের ব্যাপারটাও তাকেই করতে হয়। এ-ব্যাপারেও শর্মাজী তাকে উপদেশ দেয়।

এই সব কাজ-টাজ ইন্দ্রনীলের খুব একটা খারাপ লাগল না। কিন্তু কাজ খারাপ না লাগলেও প্রতাপগড়ে সে ঠিকঠাক মন বসাতে পারছিল না। মনটা বড়ই উড়ো-উড়ো লাগছিল। এমনি উড়ো-উড়ো মন নিয়েই প্রায় দিন পনেরো কেটে গেল প্রতাপগড়ে।

ইতিমধ্যে ইন্দ্রনীল তার নিজস্ব কোয়ার্টার পেয়ে গেছে। দু'খানা ঘরের ছোট্ট কোয়ার্টার। মোটামুটি একটা ছোট পরিবারের উপযোগী। ইন্দ্রনীলের ক্ষেত্রে এই কোয়ার্টারও যথেষ্ট বড়। কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়েছে একটি চৌকি, একটি টেবিল, গোটাকয়েক চেয়ার এবং কাপড়চোপড় রাখার জন্য একটি আলনা। তাছাড়া শর্মাজী একটি কাজের লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সব সময়ের কাজের লোক। রান্নার কাজও করে সে-ই। এসব বিচার করলে নতুন

জায়গায় ইন্দ্রনীলের বেশ আরামেই থাকার কথা। শারীরিক দিক দিয়ে সে আরামে আছেও। কিন্তু তার মানসিক আরাম নেই। মনের মধ্যে কেমন এক অস্থিরতা। কেবলই উড়ো-উড়ো ভাব।

ইন্দ্রনীল যে-অফিসে বসে সে-ই অফিসে সৌম্যেন্দু বিশ্বাস খুব কমই আসে। অফিসে তার জন্য একটি চেম্বার নির্দিষ্ট করা আছে ঠিকই, তবে সেই চেম্বারে এসে খুব কমই কাজ-কর্ম করেন তিনি। অফিসের প্রায় সব কাজ-কর্মই বাড়িতে বসে শেষ করেন তিনি। অফিসিয়াল কাগজ-পত্র সই-এর জন্য সাধারণত হীরালাল শর্মাই তার বাড়িতে যায়। অন্য কর্মচারীদের এই ব্যাপারে বড় একটা যেতে হয় না। তবে এই পনেরো দিনের মধ্যে হীরালালের সঙ্গে ইন্দ্রনীলও দু'বার গেছে।

প্রথম বার ইন্দ্রনীলের সঙ্গে কাজের কথা ভিন্ন অন্য কথা হয়নি। দ্বিতীয় বার হীরালাল কথায় কথায় বলেছিল, 'স্যার আমাদের ইন্দ্রনীলবাবুর একটা গুণের খবর পেয়েছি। এই খবরটা শুনলে আপনি হয়তো খুশিই হবেন।'

হীরালালের হঠাৎ এ-রকম একটা উক্তিতে সৌম্যেন্দু একটু অবাকই হয়েছিল। তবে বেশি অবাক হয়েছিল ইন্দ্রনীল। সে ভেবে পায়নি. হীরালালের এই ভূমিকা করার উদ্দেশ্য কি. তার সম্বন্ধে সে কি বলতে চাইছে।

ইন্দ্রনীল এবং সৌম্যেন্দু এই দুজনের কেউই অবশ্য কোনো কথা উচ্চারণ করেনি। সাগ্রহে হীরালালের দিকে তাকিয়েছিল কেবল।

হীরালাল একই ভঙ্গিতে বলেছিল, 'ইন্দ্রনীলবাবু মৃত ব্যক্তির আত্মা সম্বন্ধে খুবই কৌতূহলী। কলকাতায় থাকতে প্রায়ই প্ল্যানচেট করতেন।'

হীরালাল হঠাৎ প্ল্যানচেটের কথা উত্থাপন করবে, ইন্দ্রনীল তা' ভাবতেই পারেনি। হীরালালের কথায় ইন্দ্রনীল কেমন থতিয়ে গেল।

হীরালালের কথায় সৌম্যেন্দুর চোখও কেমন চকচক করে উঠল। সে খুশি হয়ে বলল, 'তাহলে আসুন না ইন্দ্রনীলবাবু, যে-কোনো

রবিবার। সন্ধ্যেবেলাই অবিশ্যি প্ল্যানচেট করার ভালো সময়।' একটু থেমে যোগ করেছিল, বুঝতেই পারছেন, আমারো এই ব্যাপারে খুব ইনটারেস্ট।'

সৌম্যেন্দুর প্রস্তাবে ইন্দ্রনীল অসম্মত হতে পারেনি। কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে বলেছিল, 'আমার আর কতটুকু অভিজ্ঞতা।'

সৌম্যেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, 'অভিজ্ঞতার চেয়েও বড় কথা হল বিশ্বাস। আপনার তো বিশ্বাস আছে, তাহলেই হবে। আপনি চলে আসুন একদিন। আচ্ছা, আমিই বরং আপনাকে ডেকে পাঠাব।'

এরপর ইন্দ্রনীল আর কোনোভাবেই অসম্মতি জানাতে পারেনি।

এই ঘটনার ক'দিন পর। ইন্দ্রনীল তার অফিসে কতগুলো ফাইল গুছিয়ে রাখছিল, ছোট সাহেবের সই-এর জন্য। কারণ, হীরালাল বলে রেখেছিল, এবার থেকে ইন্দ্রনীলবাবু নিজেই যেন ছোট সাহেবের সই করিয়ে আনে। ইন্দ্রনীল ফাইল-টাইল গুছিয়ে 'মিত্র-ভিলা'য় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় হীরালাল তাকে ডেকে বলল, 'এবারের কাগজের লট-টা 'মিত্র-ভিলা'য় নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ছোট সাহেবের পরিবর্তে কাগজগুলো মিস মিত্র সই করবেন। মিস মিত্র প্রতাপগড়ে থাকলে সমস্ত কাগজ-পত্র তিনিই সই করেন। এটাই নিয়ম।'

ইন্দ্রনীল সামান্য অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু মিস মিত্র তো এখন প্রতাপগড়ে নেই। তাহলে কি তিনি না-আসা পর্যন্ত এগুলো সই হবে না?'

হীরালাল হেসে বলল, 'মিস মিত্র আজ সকালেই প্রতাপগড়ে এসেছেন। লাঞ্চের পরে নিজেই অফিসে আসবেন। তখনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে। ভদ্রমহিলা মালিক হিসেবে খুবই ভালো।'

হীরালালের কথায় ইন্দ্রনীলের মন কৌতূহলী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল সঞ্জয় বোসের বিবৃতি। ইন্দ্রনীল এই মুহূর্তে মিস মিত্রকে তার কোম্পানীর মালিক হিসেবে যত না ভাবল, তার চেয়ে অনেক বেশি করে ভাবল অরুণাভ মিত্রের মেয়ে হিসেবে।

সেই মেয়ে যে ছেলেবেলায় বাবা এবং মা উভয়কেই হারিয়েছে, সে হয়তো নিজেও জানে না, তার বাবা মা আসলে আত্মহত্যা করেননি, তাঁরা খুন হয়েছেন।

ইন্দ্রনীল অ-দেখা মেয়েটির জন্য মনে মনে কেমন কষ্ট অনুভব করল। সেই সঙ্গে ভাবল, কে জানে, মেয়েটি হয়তো এ-সব কথা ভাবেও না। কে জানে, এত বড় কোম্পানির মালিক হিসেবে অগাধ টাকার উত্তরাধিকারী হয়ে সে হয়তো তার জীবনের রথ ভোগ-বিলাসের পথ দিয়েই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এবং এ-সব ক্ষেত্রে এটা হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষ করে এখনো যখন মিস।

ইন্দ্রনীলের মনটা অকারণেই কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। অফিসের কাজে তেমন মন দিতে পারল না। ভেতরে ভেতরে অকারণেই কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

এদিকে নীলাঞ্জনা তার কাকার হঠাৎ জরুরি তলব পেয়ে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও প্রতাপগড়ে না এসে পারল না। অবশ্য মাত্র কয়েক দিন থাকবে বলে সঙ্গে জানকী ভিন্ন আর কাউকেই নিল না। সে ভেবেছিল প্রতাপগড়ে এসে হয়তো দেখবে, কাকার সামান্য অসুখ-বিসুখ করেছে, কিংবা কোম্পানির ব্যাপারে তার কোথাও সই-এর প্রয়োজন। কিন্তু সে দেখল, সে-সব কোনো ব্যাপারই না, সবই ঠিক-ঠাক চলছে। এক রকম অকারণেই তাকে কলকাতা থেকে টেনে আনা হয়েছে। অবশ্য কারণ যে একেবারে দেখানো হয়নি তা' নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, নীলাঞ্জনাকে দেখার জন্য সৌম্যেন্দুর মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। নীলার সম্বন্ধে সে নাকি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিল, তাই অন্তত একবারের জন্য না দেখে থাকতে পারছিল না।

কারণটা সবই গৌণ, নীলাঞ্জনা মনে মনে সেটা উপলব্ধি করলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করল না। সমস্ত ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজভাবে নিল সে। হাসিমুখে সকলের কুশল-সংবাদ নিল। অফিস এবং ব্যবসা-সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিল। অন্যান্য বারের মতোই হীরালাল

শর্মাকে বাড়িতে ডেকে রুটিন মাফিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করল। মোটের ওপর প্রতাপগড়ে এলে নীলাঞ্জনা যা-যা করে এবারো তার ব্যতিক্রম হল না।

হীরালালের সঙ্গে রুটিন মাফিক আলোচনা করতে করতেই একটা জায়গায় হঠাৎ হোঁচট খেল নীলাঞ্জনা। হীরালাল তখন বলছিল, 'ম্যাডাম, অফিসের ব্যাপারে সব একই রকম চলছে। নতুন কোনো খবর নেই। একেবারেই যে নতুন কিছু নেই, তা' নয়। একটা নতুন খবর আছে। একজন নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার জয়েন করেছেন। ভদ্রলোক আবার কলকাতার মানুষ। বয়স বেশি নয়।

এইটুকু শোনার পরও নীলাঞ্জনার কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি, কোনো কৌতূহলও না। শুনতে হয় বলেই হাসিমুখে শুনে যাচ্ছিল সে। এক রকম নির্বিকার ভাবেই।

হীরালাল আরো বলেছিল, 'ভদ্রলোক ইংরাজীর এম. এ.। খুব ইম্প্রেসিভ চেহারা। কাজ-কর্মেও খুব ভালো। নাম ইন্দ্রনীল রায়।'

নামটা শুনেই হোঁচট খেল নীলাঞ্জনা। তার স্নায়ু হঠাৎ যেন টান-টান হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবল, এ কোন্ ইন্দ্রনীল রায়? তার হ্যামলেট নয় তো? কলকাতার ছেলে, ইম্প্রেসিভ চেহারা, ইংরেজির এম. এ. এবং নামও ইন্দ্রনীল রায়। এক সঙ্গে এতগুলো বিষয়ে মিল। তার হ্যামলেট ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারে বলে সে মনে করতে পারল না। বিশেষ করে তার হ্যামলেটের যখন এই একই সময়ে চাকরির জন্য এলাহাবাদ আসার কথা। এলাহাবাদ থেকে প্রতাপগড় আর কতটুকু পথ? সে প্রায় ধরেই নিল, এই নতুন ব্যক্তি সে-ই ইন্দ্রনীল রায়, তার হ্যামলেট।

নীলাঞ্জনা নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মনে মনে উতলা হয়ে উঠল। তার এই উতলা-ভাবটা চোখে-মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ল।

হীরালাল কিন্তু মিস মিত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যই করল না। সে

একই ভঙ্গিতে বিনয়ের সঙ্গে বলে চলল, 'ভদ্রলোককে এক রকম আমিই সিলেক্‌ট করেছি। আমার এলাহাবাদের এক বন্ধুর রিকমেনডেশনে। তবে ইন্দ্রনীলবাবুকে কিছুই বলিনি। ভদ্রলোককে আপনার আঙ্কলও পছন্দ করেন। আশা করছি আপনারও খুব খারাপ লাগবে না।'

উত্তরে নীলাঞ্জনা মৃদু হেসে বলল, 'আজ লাঞ্চের পর অফিসে মিট করব। তখনই দেখা যাবে।'

ইন্দ্রনীল ফাইলের ওপর চোখ রেখে বসে ছিল। ফাইলে চোখ রেখে বসে থাকলেও আসলে ফাইলে তার মন ছিল না। সে তখন মিস মিত্রকে ঘিরে সঞ্জয় বোসের বিবৃতি অনুসরণ করে, আকাশ-পাতাল ভাবছিল।

এদিকে নীলাঞ্জনা খবর-টবর না দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল অফিসের ভেতর। সে অফিসে ঢুকেই জানালার কাছ-ঘেঁষা চেয়ারে উপবিষ্ট ইন্দ্রনীলকে লক্ষ্য করল। ইন্দ্রনীলকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ-মুখ আনন্দে রক্তাভ হয়ে উঠল।

ইন্দ্রনীল কিন্তু নীলাঞ্জনাকে লক্ষ্যই করল না। সে তখনো তন্ময় হয়ে আছে মিস মিত্রের ভাবনায়।

মিস মিত্রের আগমনে অন্যান্য স্টাফের মধ্যে ততক্ষণে গুঞ্জন উঠেছে। হীরালাল শর্মারও চোখ পড়েছে মিস মিত্রের ওপর। হীরালাল তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে সহাস্যে নীলাঞ্জনাকে অভ্যর্থনা জানাল। সামান্য উচ্চ কণ্ঠেই বলে উঠল, 'আসুন মিস মিত্র, আসুন।'

'মিস মিত্র'-শব্দটা কানে যেতেই ইন্দ্রনীলের তন্ময়তা ছুটে গেল। ফাইল থেকে চোখ তুলে সামনে তাকাল সে। কিন্তু সামনে তাকিয়ে নীলাঞ্জনাকে দেখেই সে ইলেকট্রিক-শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল। মিস মিত্র যে নীলাঞ্জনা মিত্র হতে পারে সে স্বপ্নেও এ-কথা ভাবতে পারেনি। নীলাঞ্জনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে আনন্দ-

লজ্জা-ভয় যুগপৎ খেলা করতে লাগল। সে ভেবে পেল না, এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত। বলতে গেলে কিছু না ভেবেই সে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং কেমন এক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নীলাঞ্জনার দিকে।

ইন্দ্রনীলের এই অস্থিরতা নীলাঞ্জনার দৃষ্টি এড়াল না। তার এই অস্থিরতা দেখে মনে মনে সে এক রকম তৃপ্তি পেল। তবে বাইরে কিছুই প্রকাশ করল না। বরং মুখে একটা ভদ্রতার আবরণ রেখে ইন্দ্রনীলের দিকে ইঙ্গিত করে হীরালালকে প্রশ্ন করল, 'ইনিই নিশ্চয় নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ ইন্দ্রনীল রায়?'

হীরালাল উত্তর দিতে না দিতেই নীলাঞ্জনা সপ্রতিভ ভাবে ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে গেল। ইন্দ্রনীলকে কোনো কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই মিষ্টি হেসে বলল, 'নমস্কার মিঃ রায়। শুনলাম, আপনি কলকাতার মানুষ?'

ইন্দ্রনীল কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করল। সে স্পষ্ট অনুভব করল, যে-কোনো কারণেই হোক, নীলাঞ্জনা এখানে তাদের পূর্ব-পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছে না। সে তাই নিজের আচরণেও অপরিচয়ের দূরত্ব বজায় রাখল। মুখে একটা সলজ্জভাব আনার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

হীরালাল সেই মুহূর্তে ইন্দ্রনীলকে বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই ইনি আমাদের মিস মিত্র?'

হীরালালের এই কথার উত্তরে ইন্দ্রনীল হাসল কেবল, মুখে কিছু উচ্চারণ করল না।

নীলাঞ্জনা পরক্ষণেই বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিঃ রায়, বসুন না।' কথাটা বলে ইন্দ্রনীলের চোখে চোখ রেখে অর্থপূর্ণভাবে হাসল নীলাঞ্জনা।

সেই হাসি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে বসে পড়ল ইন্দ্রনীল।

নীলাঞ্জনা বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি করে রেখে বলল,

'জানেন তো আমিও বেশির ভাগ সময় কলকাতায় থাকি। আই লাইক ক্যালকাটা ভেরি মাচ। কলকাতা ছেড়ে আসতে আমারো খুব একটা ভালো লাগে না। তা' আপনার এখানে থাকতে অসুবিধে হবে না? কলকাতা থেকে এতদূরে থাকতে কষ্ট হবে নিশ্চয়ই।'

ইন্দ্রনীল নীলাঞ্জনার দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে হাসল। তারপর বলল, 'প্রথমে কষ্ট হচ্ছিল খুবই। তবে এখন আর হচ্ছে না। আশাকরি, আর হবেও না।' তার হাসিটা কেমন অর্থপূর্ণ মনে হল।

নীলাঞ্জনা তার অফিসের কাজ শেষ করে চলে যাবার সময় বলল, 'পরে ভালো করে আলাপ হবে, মিঃ রায়।'

ইন্দ্রনীল অফিস থেকে ফিরে মুখ-টুখ ধুয়ে একটা চেয়ার নিয়ে বাইরের বারান্দায় বসল। নতুন কোয়ার্টারে আসার পর থেকে এটাই তার নিয়ম হয়ে গেছে। অফিস থেকে ফিরে একা-একা বারান্দায় বসে থাকে অনেকক্ষণ। বসে বসে সিগারেট খায় এবং চারদিক দেখতে দেখতে নানা কথা ভাবে। বেশির ভাগ ভাবনাই অবশ্য কলকাতাকে ঘিরে। কলকাতার বাড়ি, মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব এবং নীলাঞ্জনা। মাঝে-মধ্যে মিত্র-দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ভাবনাও তাকে নাড়া দেয়। এর মধ্যে সঞ্জয় বোসের সঙ্গে বার কয়েক দেখা হয়েছে। অল্পক্ষণের জন্যেই। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেও ভদ্রলোক মিত্র-দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা কয়েক বার উচ্চারণ করেছেন। ইন্দ্রনীল অনুভব করেছে, মিত্র-দম্পতির মৃত্যুর ব্যাপারটা ভদ্রলোক কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি কথাটা বার বার না বলে পারেন না।

ইন্দ্রনীল এই ক'দিন মিত্র-দম্পতির ব্যাপারটা নিয়ে যে-ভাবে ভেবেছে সে-ভাবে অনেকেই ভাবে। সেই ভাবনার মধ্যে কোনো রকম গভীরতা ছিল না। আত্মীয়-বিচ্ছেদের জ্বালাও ছিল না তার মধ্যে। ভাবনাটা ছিল কতকটা সময় কাটানোর মতন। কিন্তু আজ নীলাঞ্জনাকে দেখার পর থেকে এই ভাবনাটা তার মাথার মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে।

আজ সে ভেতরে ভেতরে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুতেই যেন হিসেব মিলছিল না তার।

ইন্দ্রনীল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল দুটো কারণে। প্রথমত, যাকে সে ভালোবাসে, যাকে সে আপন করে পাওয়ার কথা ভেবে আনন্দ পায়, তার জীবনের পশ্চাৎপটে যে এত বড় দুর্ঘটনার ক্ষত-চিহ্ন রয়েছে তা' সে ভাবতেই পারেনি। এমন একটা সুখী জীবনের অন্তরালে যে, এমন একটা দুঃসহ ব্যথার অস্তিত্ব থাকতে পারে তা' তার ভাবনার অতীত ছিল। ইন্দ্রনীল নিজের মন দিয়ে নীলাঞ্জনার নিঃসঙ্গতা গভীরভাবে অনুভব করেছিল।

ইন্দ্রনীলের বিপর্যস্ত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, তার এখানকার চাকরি। নীলাঞ্জনা মালিক আর ইন্দ্রনীল তার কর্মচারী, এই ব্যাপারটা তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তাছাড়া এই চাকরিকে কেন্দ্র করে তার মনের মধ্যে আরো একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। তার বার বার মনে হচ্ছিল, প্রফেসর নন্দীর কথাটা নীলাঞ্জনার কাছে এখন আর বোধহয় তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না। নীলাঞ্জনা হয়তো ভাববে, ইন্দ্রনীল সব জেনেশুনেই প্রফেসর নন্দীকে দিয়ে বানানো কথাটা বলেছে।

অথচ ইন্দ্রনীলের কোনো ব্যাপারেই হাত ছিল না। এখানকার চাকরিটা পাওয়ার ব্যাপারেও না, প্রফেসর নন্দীর মন-গড়া কথাতেও না।

ইন্দ্রনীল ভাবনার সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভেসে চলল যেন। বাহ্য-জ্ঞান প্রায় লোপ পেল। জ্বলন্ত সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে পুড়ে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে কখন যে নীলাঞ্জনা গাড়ি নিয়ে তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি। নীলাঞ্জনার দু'বারের অস্ফুট ডাকও খেয়াল করেনি সে। তখনই তার খেয়াল হল, যখন নীলাঞ্জনা গাড়ি থেকে নেমে তার একেবারে পাশে এসে বলল, 'হ্যামলেট, কি এত আকাশ-পাতাল ভাবছেন ?'

নীলাঞ্জনাকে হঠাৎ তার পাশে দেখে ইন্দ্রনীল কেমন চমকে উঠল। আচমকা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'একি, শকুন্তলা!'

'শকুন্তলা' ডাকটায় নীলাঞ্জনার চোখ হাসিতে ভরে গেল। সে বলল, 'যাক, বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়নি তাহলে। দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে ভাবলাম, আপনি ধ্যানস্থ।'

ইন্দ্রনীল লজ্জিত হল। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ভেরি সরি। বসুন, বসুন!'

নীলাঞ্জনা হাসিমুখে বলল, 'না বসব না। আমি গাড়িতেই বসছি আপনি বরং প্রস্তুত হয়ে আসুন। গাড়ি করে একটু বেরিয়ে আসি।'

ইন্দ্রনীল দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন না করে জামা-কাপড় বদলাতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

নীলাঞ্জনার গাড়িটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। প্রতাপগড়ের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে এসেছিল ওরা। দুজনের কারো মুখেই কোনো কথা ছিল না। ইন্দ্রনীল যে দু'একবার কথা বলার চেষ্টা করেনি তা নয়, কিন্তু নীলাঞ্জনা হাত তুলে থামিয়ে দিয়েছে তাকে। কিন্তু এত দূরে চলে আসার পর ইন্দ্রনীল যেন আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। সে এক সময় বলে উঠল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এ-রকম ঝড়ের বেগে আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

নীলাঞ্জনা সামনে দৃষ্টি রেখে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কোথাও যাচ্ছি না। ঝড়ের বেগে ছুটছি এটাই বড় কথা।' কথাটা বলে ঠোঁট টিপে হাসল সে।

নীলাঞ্জনার হাসিটা ইন্দ্রনীলের কাছে কেমন দুর্বোধ্য মনে হল। দুর্বোধ্য বলেই হয়তো মনে মনে সে কেমন ভয় পেল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, তার এই দুরন্ত গতির মধ্যে একটা অবরুদ্ধ ক্রোধের প্রকাশ ঘটছে। আর এই অবরুদ্ধ ক্রোধটা যে-কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে নীলাঞ্জনা হয়তো বলতে পারে,

ইন্দ্রনীলবাবু, আমাদের কোম্পানিতে চাকরি পেলেন, অথচ আমাকেই তা' লুকিয়ে গেলেন ? কি প্রয়োজন ছিল, প্রফেসর নন্দীর মাধ্যমে এত বড় একটা মিথ্যের আশ্রয় নেবার ? এর দ্বারা একজন শ্রদ্ধেয় মানুষকে ছোট তো করলেনই, আপনি নিজেও ছোট হলেন।'

নীলাঞ্জনা এক সময় এই বিষয়েই কথা বলল। কিন্তু একেবারে অন্য সুরে। যে-সুরের সঙ্গে ইন্দ্রনীলের ভাবনার সুরের কোনো মিলই হল না। একই জিনিসকে নীলাঞ্জনা যেন একেবারে ভিন্ন কোণ থেকে দেখল। তার কাছে একই জিনিস ভিন্ন আলোয় প্রতিভাত হয়ে ভিন্ন রূপ নিল।

নীলাঞ্জনা সামনে দৃষ্টি রেখেই বলল, 'ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগছে। প্রফেসর নন্দীর বন্ধু শেষ পর্যন্ত আমাদের কোম্পানিতেই আপনার চাকরি করে দিলেন। অন্য কোথাও না। এই এ্যাপেলো কোম্পানিতেই। কথাটা যত ভাবছি ততই অবাক হচ্ছি, হ্যামলেট।'

কথাটা বলে চোখের কোণ দিয়ে ইন্দ্রনীলকে একবার দেখল সে। তারপর যোগ করল, 'আমার কেবলই মনে হচ্ছে, এর পেছনে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোনো ইচ্ছে খেলা করছে। দেয়ার ইজ সাম মিনিং বিহাইণ্ড ইট। সাম স্পেশ্যাল মিনিং।'

ইন্দ্রনীলের বুক থেকে একটা ভার যেন সরে গেল। ভারমুক্ত হয়ে তার মনটা প্রজাপতির মতো ডানা মেলে দিল যেন। সে আনন্দের আতিশয্যে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এল। বলল, 'শকুন্তলা, তুমি হয়তো সত্যি কথাই বলেছো।'

কথাটা বলে ফেলেই সে কেমন লজ্জিত হল। নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'সরি, আপনি হয়তো—।'

ইন্দ্রনীলকে বাধা দিয়ে নীলাঞ্জনা গাঢ় স্বরে বলল, 'তুমি-ই থাক হ্যামলেট। ওটাই সহজ। অন্তত দুজনের মধ্যে।'

ইন্দ্রনীল উত্তর না দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কেবল।

নীলাঞ্জনা কথা বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। সে

সাইড-মিররের দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। সেই দিকে চোখ রেখেই বলল, 'উই আর ফলোড বাই সামওয়ান। মনে হচ্ছে, অনেকক্ষণ থেকেই। লেট মি সি।'

বলতে বলতে রাস্তার একধারে গাড়িটাকে দাঁড় করাল।

নীলাঞ্জনার অনুমান মিথ্যে হল না। সে গাড়িটা দাঁড় করাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে একটা মোটর বাইক এসে ওদের গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল। মোটর বাইকের চালককে চিনতে অসুবিধে হল না ইন্দ্রনীলের। লোকটি স্টেশনের বুকিং-ক্লার্ক কষ্টহরণ। নীলাঞ্জনাও তাকে চিনতে পারল। লোকটি একজন রেলওয়ে কর্মচারী ঠিকই, তবে এইসব লোক একটা বিশেষ ধাতুতে তৈরী হয়। এরা বিশেষ ধাতুতে তৈরী এবং বিশেষ জাতের। এরা যেখানেই থাক, যে-কাজই করুক, এদের বিশেষত্ব সব সময়ই বজায় থাকে। এদের কোনো কিছুতেই কখনো তৃপ্তি নেই, তাই নানা কৌশলে এরা অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। চাটুকার বৃত্তিতে এদের জুড়ি নেই। আবার নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে অনেক কিছুই করতে পারে।

নীলাঞ্জনা কষ্টহরণের চরিত্র বিলক্ষণ জানতো। তাছাড়া লোকটি যে সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের উচ্ছিষ্ট ভোজী, নীলাঞ্জনার তাও অজানা ছিল না। লোকটিকে সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে।

কষ্টহরণ মোটর বাইক থেকে নেমে হেসে বিগলিতভাবে বলল, 'নমস্কার ম্যাডাম। ভালো আছেন? কলকাতা থেকে কবে এলেন? স্টেশনে আপনাকে লক্ষ্য করিনি তো।'

নীলাঞ্জনা এ-সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চোখ-মুখের ভাব কঠিন করে বলল, 'আপনি আমার গাড়ি ফলো করছিলেন?'

কষ্টহরণ নির্লজ্জের মতো হেসে বলল, 'করছিলাম, ম্যাডাম। কারণ, ফলো না করে উপায় ছিল না।'

নীলাঞ্জনা উত্তেজিতভাবে বলল, 'ফলো না করে উপায় ছিল না, তার মানে?'

কষ্টহরণ আবার নির্লজ্জের মতো হেসে বলল, 'আপনার

নিরাপত্তার জন্যে, ম্যাডাম। আপনি তো জানেন, আপনার আঙ্কলের কাছে আমি কত ভাবে ঋণী। আপনার আঙ্কল আপনার নিরাপত্তার জন্যে সব সময় কত চিন্তিত থাকেন আপনি তাও জানেন। কাজেই এই নির্জন পথে সন্ধ্যের অন্ধকারে আপনাকে একা দেখে আমাকে ফলো করতেই হল। এ-ব্যাপারে আমি হেল্প্-লেস।'

নীলাঞ্জনা মুখের ভাব একই রকম কঠিন রেখে বলল, 'আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন, আমি একা নই। সঙ্গে আরো একজন আছেন।'

কষ্টহরণ যেন আরো উৎসাহিত হল। বলল, 'এটা আরো ভয়ের ব্যাপার, ম্যাডাম। উনি তো এই তল্লাটে একেবারেই নতুন। এই তো সেদিন আপনাদের কোম্পানিতে জয়েন করেছেন। এই নতুন জায়গায় ওঁর নিজেরই নিরাপত্তার অভাব, উনি আবার আপনার নিরাপত্তা দেবেন কি? জিজ্ঞেস করে দেখুন না, প্রথমদিনই স্টেশনে কি রকম অসুবিধেয় পড়েছিলেন।'

এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি পেল ইন্দ্রনীল। সে হাসিমুখেই বলল, 'সেইজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কষ্টহরণ-বাবু। সেদিন আপনি হেলপ্ না করলে খুব অসুবিধেয় পড়তে হত।'

কষ্টহরণ মুখে হাসি রেখেই বলল, 'ধন্যবাদ আমাকে দেবেন না। ধন্যবাদ পাওনা মিঃ বাসুর। আসলে তিনিই আপনাকে গাড়িতে লিফট্ দিয়েছেন। যাকগে সে-কথা, আপনারা এবার ফিরে যান। তাছাড়া এ-ভাবে আর কোনো দিন বেরোবেন না।'

কষ্টহরণের গলার স্বরটা শেষের দিকে একটু যেন কঠিন শোনাল। যেন সেই স্বরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আদেশ রয়েছে।

ইন্দ্রনীল সেই আদেশের সুরকে অগ্রাহ্য করে বলল, 'উনি ভয় পাচ্ছেন না, অথচ আপনি জোর করে ভয় পাওয়াচ্ছেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত না? তাছাড়া উনিও তো এই অঞ্চলেরই মেয়ে।'

কষ্টহরণের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। বেশ গম্ভীরভাবে

বলল, 'আপনার মালিক মিঃ বিশ্বাসের অবাধ্য হতে যাচ্ছেন কোন্ সাহসে? তিনি যা চান না তা করা কি ঠিক হচ্ছে? যান শিগ্ গির ফিরে যান।'

ইন্দ্রনীলের রক্ত চনমন করে উঠল। সে চোখ সূক্ষ্ম করে তাকাল কষ্টহরণের দিকে। সামান্য সময় নিয়ে বলল, 'আপনি কিন্তু ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।'

কষ্টহরণ এবার অত্যন্ত রূঢ় গলায় কতকটা ধমকের সুরে বলল, 'আসলে সীমা আপনিই অতিক্রম করেছেন। আপনি জানেন না, একজন অবিবাহিতা মহিলার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।'

নীলাঞ্জনা এবার ঝাঁজাল গলায় বলল, 'এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার কষ্টহরণবাবু।'

নীলাঞ্জনার কথার উত্তর না দিয়ে কষ্টহরণ সহাস্যে বলল, 'আপনি ফিরে যান, ম্যাডাম। আপনাকে ফিরিয়ে না দিয়ে আমি কোথাও যেতে পারছি না! আমি ডিউটি বাউণ্ড।'

নীলাঞ্জনার আর বেশি দূর এগোবার ইচ্ছা ছিল না। এ-রকম একটা ব্যাপার না ঘটলে সে হয়তো আর সামান্য অগ্রসর হয়েই ফিরে যেত। কারণ, কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান তার ছিল না। কিন্তু এই ঘটনার পর তার জেদ চেপে গেল। সে কষ্টহরণের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আরো এগোচ্ছি। আপনি কাকাকে নালিশ করে আপনার ডিউটি পালন করুন।'

নীলাঞ্জনা যখন গাড়িতে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে ঠিক তখনই দেখতে পেল, পেছন দিক থেকে একটা জিপ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে। এমন ভাবে আসছে যেন তারাই জিপটার টার্গেট। নীলাঞ্জনা কি ভেবে গাড়িতে স্টার্ট দিল না। জিপটা তাদের অতিক্রম করে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা মনস্থ করল।

জিপটা কিন্তু ওদের অতিক্রম করে গেল না। কষ্টহরণের মোটর-বাইকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিপটা থামতেই ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে দেখল, জিপের আরোহী দু'জন এবং দুজনই তার পরিচিত।

যার হাতে স্টিয়ারিং হুইল সে সঞ্জয় বোস, আর পেছনের সিটে যে-ব্যক্তি কতকটা ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছে সে ভোলে বাবা।

গাড়িটা থামতেই ভোলেবাবা যেন ধ্যান ভেঙে বলে উঠল, 'জয় মা জগজ্জননী।' পরক্ষণেই বড় বড় চোখ করে বলল, 'আরে বেটা, গাড়ি কিঁউ রোখা? আমাকে প্রয়াগে পৌঁছতে হবে না? এত দেরি করলে চলবে? জল্‌দি করো।'

ভোলেবাবার কথায় সঞ্জয় বোস গলায় বেশ ঝাঁজ মিশিয়ে বলল, 'আপনি আচ্ছা লোক তো। দেখছেন, আমি একটা কাজ করতে থেমেছি। অতই যদি তাড়া, তাহলে যান না, হেঁটেই চলে যান। সবাই আপনার বিশ্বাস সাহেব নন, বুঝলেন?'

ঝাঁজাল গলায় উত্তর পেয়ে ভোলেবাবা যেন গুটিয়ে গেল। কতকটা সেই জন্যেই যেন শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক হ্যায় বেটা, ঠিক হ্যায়। তুমি তোমার কাম করো।' কথাটা বলেই আবার ধ্যানস্থ হল যেন।

ইন্দ্রনীল, নীলাঞ্জনা এবং কষ্টহরণ তিনজনেই সঞ্জয় বোস ও ভোলেবাবার ব্যাপার-স্যাপার দেখছিল। তবে কথা বলেনি কেউ। কষ্টহরণ কথা না বললেও তার চোখ-মুখ কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। স্কুল-পালানো ছেলে হঠাৎ মাস্টারমশাই-এর সামনে পড়লে যেমন হয় তেমনি।

সঞ্জয় গাড়ি থেকে নেমে হাসি মুখে কষ্টহরণের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর পকেট থেকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট বের করে বলল, 'কষ্টহরণবাবু এই নিন আপনার টাকা।'

'টাকা? টাকা কিসের স্যার?' হাত পেতে টাকাটা নিতে নিতে প্রশ্নটা করল সে।

সঞ্জয় কষ্টহরণের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে গলায় আন্তরিকতার সুর মিশিয়ে বলল, 'বল-বেয়ারিং সাপ্লাইয়ের খবরটা আপনিই প্রথম দিয়েছিলেন। এটা তার আগাম কমিশন। এরপর আরো পাবেন।'

কষ্টহরণ গদ গদ ভাব করে বলল, 'স্যার, আর একটা ভালো খবর আছে।' কথাটা বলে সঞ্জয়ের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু টানা মাল আছে। লোহা এবং সিমেন্ট। আপনার কোনো ভয় নেই। সেদিক থেকে পুরো গ্যারান্টি। নেবেন স্যার?'

সঞ্জয় সহাস্যে বলল, 'বেশ তো পাকা খবর নিয়ে আসুন, ব্যবস্থা হবে।'

ইন্দ্রনীল নিঃশব্দে লক্ষ্য করছিল সঞ্জয় এবং কষ্টহরণকে। সঞ্জয়ের ভাবভঙ্গি তার চোখে কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকছিল। সেদিন মানুষটিকে ঠিক এ-রকম হালকা ধরনের মনে হয়নি! বরং অনেক রাশভারি মনে হয়েছিল।

সঞ্জয় বোসকে নীলাঞ্জনা এর আগে কখনো দেখেনি। ভদ্রলোককে এই প্রথম সে দেখছে। সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক যে একজন ব্যবসায়ী, এটা সে ওই বল-বেয়ারিং সাপ্লাইয়ের কথাতেই বুঝে নিয়েছিল। কষ্টহরণের সঙ্গে ভদ্রলোকের মাখামাখিটা পছন্দ না হলেও ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু যথেষ্ট রুচিশীল বলেই মনে হল তার। ভদ্রলোক এতক্ষণের মধ্যে একবারও তাকাননি নীলাঞ্জনা এবং ইন্দ্রনীলের দিকে। ভদ্রলোকের কথাবার্তা শুনে বাঙালি বলেই মনে হল। এর আগে তাকে এই অঞ্চলে কোনোদিন দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না। অবিশ্যি এই অঞ্চলের কতটুকু খবরই বা সে রাখে। মনে মনে এই কথাটাও ভাবল।

নীলাঞ্জনা ইতস্ততঃ করছিল, এই মুহূর্তে গাড়িটা ঘুরিয়ে নেওয়া উচিত হবে কিনা। ভাবতে ভাবতে ইঞ্জিনের চাবিতে হাত দিল। আর ঠিক তখনই সঞ্জয়ের হঠাৎ যেন নজর পড়ল ইন্দ্রনীলের দিকে। তাকে দেখেই মৃদু হেসে বলল, 'কি খবর? বেড়াতে বেরিয়েছো বুঝি?' প্রশ্নটা করে নিজেই আবার তার উত্তর দিয়ে বলল, 'বেশ বেশ বেড়াও। ঘুরে-টুরে জায়গাটা ভাখো। ভালো লাগবে। মনও ভালো থাকবে।'

কথাটা বলে নীলাঞ্জনাকেও এক পলক দেখে নিল সে। তারপর

কণ্ঠহরণের দিকে ফিরে বলল, 'তা আপনি এদের আটকে রেখেছেন কেন? এদের সঙ্গে কি কথা বলছেন?'

কণ্ঠহরণ একটু অস্বস্তিতে পড়ল। অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'আজ্ঞে বলছিলাম, এরকম নির্জন রাস্তা, তার ওপর রাত, এই অবস্থায় একা-একা বেশি দূর যাওয়া ঠিক না। বিপদ হতে পারে।'

কথাটা শুনে সঞ্জয় শব্দ করে হেসে উঠল। যেন খুব একটা হাসির কথা বলা হয়েছে। হাসতে হাসতেই বলল, 'দু'জন আবার একা-একা হয় নাকি মশাই? আপনি সত্যিই অদ্ভুত। এই কথাটা বলার জন্যেই আপান এদের পেছনে ছুটে এসেছেন? কেবল আপনি নিজেই ছোটেননি, আমাকেও ছুটিয়েছেন। আই হ্যাড টু চেজ ইউ। কুডন্ট হেলপ্। না ছুটে এলে আপনাকে টাকাটা দিতাম কি করে? এনি ওয়ে—।'

সঞ্জয় ইন্দ্রনীলের দিকে ফিরে হাসিমুখে বলল, 'যাও ইন্দ্রনীল, যেখানে খুশি বেড়াতে যাও।' নীলাঞ্জনার দিকে তাকিয়ে স্নেহ-মাখা গলায় বলল, 'যান মা, নির্ভয়ে যান।' একটু থেমে যোগ করল, 'আপনি আমাকে চেনেন না, তবে আমি আপনাকে চিনি। এই অঞ্চলের সবাই আপনাকে চেনে। আপনি অরুনাভ মিত্রের মেয়ে। আমার পরিচয় অবিশ্যি সামান্যই। আমি বাস করি এলাহাবাদে। সামান্য একজন কণ্ট্রাক্টর।'

নীলাঞ্জনা ভদ্রতার হাসি মুখে নিয়ে ছোট একটা নমস্কার করেই গাড়িতে স্টার্ট দিল। কথা বাড়াল না আর।

নীলাঞ্জনা গাড়িতে স্টার্ট দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জিপের ভেতর থেকে ভোলেবাবা বলে উঠল কতকটা স্বগতোক্তির মত, 'তিনি এক ছিলেন। - একম:অদ্বিতীয়ম। কিন্তু তারপর তিনি দুই হলেন, পুরুষ এবং প্রকৃতি।'. শান্ত কণ্ঠে কথাটা বলেই হঠাৎ আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আরে এ বেটা, তুম জায়গা কি নেই? আমার সময় বয়ে যাচ্ছে যে।'

এদিকে ততক্ষণে নীলাঞ্জনা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। কেবল ঘুরিয়েই নেয়নি, চালাতেও শুরু করেছে বেশ জোরেই।

ওদের গাড়িটা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সঞ্জয় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। অস্বস্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইল কষ্টহরণও।

ফিরবার পথে নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলকে প্রশ্ন করল, 'এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে?'

ইন্দ্রনীল বিস্তৃতভাবে সেই রাত্রির বিবরণ দিল। সেই সঙ্গে যোগ করল, 'আমার চাকরির ব্যাপারে ভদ্রলোকের নাকি ইনডাইরেক্ট কনট্রিবিউশন আছে। খোলাখুলিভাবে অবিশ্যি আর কিছু বলেন নি।'

ইন্দ্রনীলের কথায় নীলাঞ্জনা চোখের কোণ দিয়ে তাকে একবার দেখল, তবে কিছু বলল না।

ইন্দ্রনীল নিজেই আবার বলল, 'ভদ্রলোক নাকি এমন একজনের সূত্র ধরে আমার এই চাকরির ব্যবস্থা করেছেন যার বয়েস আমার চেয়েও কম এবং এই সঞ্জয় বোস সম্পর্কে তার মামা।' ইন্দ্রনীল হেসে যোগ করল, 'ভদ্রলোক বলেছেন সেই সূত্রে আমিও নাকি তাকে মামা বলেই ভাবতে পারি।'

নীলাঞ্জনা চোখের কোণ দিয়ে ইন্দ্রনীলকে আর একবার দেখে বলল, 'ভদ্রলোকের মাথা বেশ সুস্থ তো?'

ইন্দ্রনীল গম্ভীরভাবেই বলল, 'অসুস্থতার কোনো লক্ষণ তো দেখলাম না।' একটু থেমে যোগ করল, 'তুমি যখন খুবই ছোট তখন তোমার মা-বাবার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়, ভদ্রলোক এ-কথাও বলেছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গেই সে-কথা বলেছেন। তখন অবিশ্যি জানতাম না যে, মিস মিত্র মানে তুমি, নীলাঞ্জনা মিত্র।'

নীলাঞ্জনা সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, খুবই ছেলেবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। তখন ভালো করে আমার জ্ঞানও হয়নি। আমি আসলে এখানকার এক দেহাতী-আয়ার কাছে

মানুষ হয়েছি। তার নাম জান্‌কী। এখন অবিশ্যি সে একেবারে বাঙালির মতন। কলকাতায় সে-ই আমার সঙ্গে থাকে। আমাকে সে মায়ের মতোই স্নেহ করে, ভালোবাসে।'

কথাটা বলে নীলাঞ্জনা ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ইন্দ্রনীল সামান্য ইতস্ততঃ করে আবার বলল, 'ভদ্রলোক আরো যে-কথা বলেছেন, তা আমার বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হয়েছে। পুরোপুরি যে বিশ্বাস করেছি তা-ও না। ভদ্রলোক অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন, তবে আমি তোমাকে না বলে পারছি না!'

নীলাঞ্জনা সামনে দৃষ্টি রেখে স্বাভাবিক স্বরেই প্রশ্ন করল, 'কি কথা?'

ইন্দ্রনীল চুপ করে কি একটু ভাবল। তারপর বলল, 'এখানকার অনেকেরই নাকি ধারণা, তোমার বাবা এবং মা, এদের দুজনের কেউই আত্মহত্যা করেননি। এরা দুজনেই নাকি খুন হয়েছেন।'

নীলাঞ্জনা চমকে উঠল এমন সাংঘাতিকভাবে যে, তার হাতের স্টিয়ারিং হুইল সামান্য ঘুরে গেল! অবিশ্যি পর মুহূর্তেই সামলে নিল নিজেকে।

ইন্দ্রনীল আর কোনো কথা বলল না। নীলাঞ্জনার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে লাগল সে। নীলাঞ্জনার চোখ-মুখ তখন বর্ষার মেঘের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

নীলাঞ্জনা নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে চালাতে এক সময় বলে উঠল, 'তোমাকে বলতে বাধা নেই। ইন ফ্যাক্ট তোমাকে আমি সবই বলতে পারি। হয়তো একদিন বলতামও।'

নীলাঞ্জনা একটু থামল। তার মুখটা তখন থমথম করছে। সে মিহি গলায় বলল, 'কি জানো, কিছুদিন হল, আমারো কেমন মনে হচ্ছে, বাবাকে কেউ খুন করেছিল। কেন যে এ-রকম মনে হচ্ছে তা' বলতে পারব না। এই মনে হওয়ার পেছনে যে কোনো যুক্তি দেখাতে পারব তা-ও না। অথচ আজকাল, সব সময় এটা আমার মনে হয়, মনের সঙ্গে ছায়ার মতন লেগে থাকে। আর এই জন্যেই

তোমার হ্যামলেট অভিনয়টা আমাকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল।’

ইন্দ্রনীল নিঃশব্দে নীলাঞ্জনার চোখের দিকে একবার তাকাল, কিন্তু কোনো কথা বলল না।

রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে নীলাঞ্জনা বলল, ‘এই মনে হওয়া, এই ধারণা, আমাকে যেন রাত-দিন কুরে কুরে খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে আমি অসহায় বোধ করি। অথচ এমন ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা কাউকে বলতে পারি না। এমনকি জান্‌কী মাঈ-কেও না। হয়তো সেইজন্যেই ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছি। নিঃসঙ্গতার পাথর যেন আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। আই ফিল টায়ার্ড, হ্যামলেট।’

ইন্দ্রনীল কোনো কথা না বলে নিজের একটা হাত আলতো করে নীলাঞ্জনার কাঁধের ওপর রাখল।

ইন্দ্রনীলের হাতের স্পর্শে নীলাঞ্জনা অনুভব করল, সে যেন একটা শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

## ॥ চোদ্দ ॥

দিন তিনেক পর।

অফিসের একটা জরুরি কাজের প্রয়োজনে ইন্দ্রনীলের ডাক এল মিত্র-ভিলায়। ডাক এল ছোটসাহেবের কাছ থেকেই।

সময়টা তখন বিকেল। বলতে গেলে সন্ধ্যে আসন্ন। হাল্‌কা রোদ্দুর গাছের মাথায় মাথায় আটকে আছে। অন্যান্য দিনের মতই মিত্র-ভিলা শান্ত।

সেদিনের ওই ঘটনার পর ইন্দ্রনীল এই প্রথম সৌম্যেন্দুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। নীলাঞ্জনার সঙ্গে গাড়িতে ভ্রমণ করার ব্যাপারে সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এখনো তার জানা নেই। নীলাঞ্জনার কাছে অবিশ্যি শুনেছে যে, তার কাকা এ-ব্যাপারে কোনো কিছুই বলেনি। নীলাঞ্জনার মতে, তার কাকার কানে এই ব্যাপারটা

কেউ পৌঁছে দেয়নি। তবু ইন্দ্রনীলের মনের ভেতর কেমন একটা দুর্ভাবনা বাসা বেঁধে আছে।

ইন্দ্রনীল ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দেখল, ছোটসাহেব একাই বসে আছে। ইন্দ্রনীলকে দেখেই বেশ উচ্ছ্বসিতভাবে বলে উঠল, 'আসুন, ইন্দ্রনীলবাবু, আসুন। আপনার অপেক্ষাতেই বসে আছি।'

ইন্দ্রনীল স্মিত হেসে নমস্কার করল।

'বসুন, বসুন কথা আছে।' একই ভঙ্গিতে আবার বলল সৌম্যেন্দু।

ইন্দ্রনীল সোফায় বসতে বসতে ভাবল, সৌম্যেন্দুর এই অহেতুক উচ্ছ্বাসের পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কিনা।

কতকটা সেই উদ্দেশ্য বুঝবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি অফিসের কথায় চলে এল। অফিসের যে-কথার জন্যে আজ তাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। ইন্দ্রনীল বলল, 'স্যার মির্জাপুরের কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে যে গোলমাল দেখা দিয়েছিল সেটা এবার মিটে যাচ্ছে। তাছাড়া—'

সৌম্যেন্দু একটা হাত তুলে ইন্দ্রনীলকে থামবার ইঙ্গিত করে বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু, আজ কোনো কাজের কথা নয়। কাজের জন্য আরো অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজ আপনাকে ডেকে এনেছি অন্য কারণে। প্ল্যানচেট করব বলে। আপনি তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন, একদিন এখানে এসে প্ল্যানচেটে বসবেন।'

ইন্দ্রনীল ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি নিয়ে বলল, 'আপনি ডাকলে যে-কোনো দিন চলে আসতাম। আমি তো ছুটির পর বাড়িতেই থাকি।'

সৌম্যেন্দু সহাস্যে বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। বই পড়া ছাড়া আপনার আর অন্য কোনো নেশা-টেশা নেই। মিস মিত্রও আপনাকে বেশ পছন্দ করে শুনলাম। সম্ভবত এই কারণেই।'

মিস মিত্রের পছন্দের কথায় ইন্দ্রনীলের বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল।

সৌম্যেন্দু হাসিমুখে আবার যোগ করল, 'বই পড়ার নেশা আছে, প্ল্যানচেটের অভ্যেস আছে, তাছাড়া শর্মাজির কাছে শুনলাম, অফিসের কাজটাকেও আপনি ভালোবেসে ফেলেছেন, সে-ক্ষেত্রে আপনার তো এখানে থাকতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আপনি কি বলেন?'

সৌম্যেন্দুর কথায় ইন্দ্রনীল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভাবল, যাক নীলাঞ্জনার সঙ্গে গাড়িতে বেড়ানোর ব্যাপারটা সৌম্যেন্দুর কানে পৌঁছে থাকলেও ভদ্রলোক ব্যাপারটাকে খারাপ ভাবে নেয়নি। ইন্দ্রনীল স্মিত হেসে বলল, 'না, অসুবিধে আর কি? বেশ তো আছি।'

সৌম্যেন্দু এবার সোফা থেকে উঠতে উঠতে বলল, 'এই ড্রইংরুমে প্ল্যানচেট করা সম্ভব নয়। চলুন একটা নিরিবিলি ঘরে যাই।'

সৌম্যেন্দু এবং তার পেছনে ইন্দ্রনীল একতলার অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করল। ঘরটার গোটাকয়েক ঘুলঘুলি ছাড়া সব ক'টা দরজা-জানালা বন্ধ। ফলে ঘরটা অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার ঘরে চোখ সইয়ে নিতে সামান্য সময় লাগল ইন্দ্রনীলের।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে ইন্দ্রনীল লক্ষ্য করল, ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা টেবিল। টেবিলের দু'পাশে দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপর প্ল্যানচেটের সরঞ্জাম, পেন্সিল, সাদা কাগজ, বড় মোমবাতি, দেশলাই।

সৌম্যেন্দু একটা মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের ওপর বসিয়ে দিল। তারপর দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'আপনি তো নিশ্চয় জানেন, একেবারে নিরিবিলি না হলে আত্মা ঠিকঠাক আসতে চায় না?'

ইন্দ্রনীল কিছু না ভেবেই উত্তর দিল, 'আজ্ঞে সেই রকমই তো শুনেছি।'

ইন্দ্রনীলের উত্তরে সৌম্যেন্দুর ভুরু জোড়া সূক্ষ্ম হয়ে গেল। সামান্য সময় তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সেই রকম শুনেছেন মানে? আপনি নিজে প্ল্যানচেট করেননি কখনো?'

ইন্দ্রনীল সহজভাবেই বলল, 'আজ্ঞে আমি তো বলেইছি, এই

ব্যাপারে আমার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। দু'বার চেষ্টা করেছি, তবে সাকসেসফুল হইনি।'

সৌম্যেন্দুর সূক্ষ্ম ভুরু শিথিল হল। ইন্দ্রনীলের একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'সাকসেসফুল হননি ঠিক আছে। কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে আপনার পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে তো?'

ইন্দ্রনীল সৌম্যেন্দুর মন-রাখা কথা বলতে পারল না। সে বলল, 'পরিপূর্ণ বিশ্বাস বলতে যা' বোঝায় তা' নিশ্চয়ই নেই। আবার অবিশ্বাস করি যে, তা-ও ঠিক বলতে পারছি না।'

ইন্দ্রনীলের কথায় সৌম্যেন্দু স্মিত হেসে বলল, 'আমার অভিজ্ঞতা কি বলে জানেন? বলে, আত্মার অস্তিত্ব তো আছেই, এমনকি স্থূল মানুষের মতই তার সুখ-দুঃখ বোধ আছে, এবং সময়ে সময়ে প্রতিশোধ স্পৃহাও জেগে ওঠে।'

একটু কাল চুপ করে থেকে সৌম্যেন্দু বলল, 'ব্যাপারটা কি রকম জানেন? মর-জগতের কোনো মানুষের কাজে কোনো মৃত ব্যক্তির আত্মার সুখ-বোধ হতে পারে, আবার কোনো কাজে প্রচণ্ড দুঃখ-বোধ হতে পারে, আবার কোনো কাজে প্রতিহিংসাও জেগে উঠতে পারে।'

ইন্দ্রনীল কোথায় যেন সংস্কারাচ্ছন্ন আত্মার কথা পড়েছিল। এই মুহূর্তে সেই কথাটাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি বোধহয় সংস্কারাচ্ছন্ন আত্মার কথা বলছেন?'

ইন্দ্রনীলের এই কথায় সৌম্যেন্দু যেন একটু বিরক্তই হল। মৃদু ধমকের সুরে সে বলল, 'আরে সংস্কারাচ্ছন্ন আত্মাই তো সব। সংস্কারমুক্ত আত্মা আর ক'টি পাচ্ছেন?'

সৌম্যেন্দু এবার টেবিলের পাশে একটি চেয়ারে বসল এবং সামনের চেয়ারটায় ইন্দ্রনীলকে বসতে ইঙ্গিত করল।

ইন্দ্রনীল বসার পর সৌম্যেন্দু বলতে লাগল, 'আজ আমি যার আত্মা আনব বলে ঠিক করেছি তাকে আপনি চেনেন না।'

সৌম্যেন্দুর কথায় ইন্দ্রনীল সামান্য অবাক হয়ে বলল, 'আমি চিনি না? আমি তাকে না চিনলে তাকে নিয়ে ভাবব কি করে?

তার মুখ-চোখের ওপর আমি যদি আমার মনকে কনসেনট্রেট করতে না পারি, তাহলে তার আত্মার মধ্যে সাড়া জাগবে কি করে? আমি অন্তত এই রকমই জানি। এইভাবেই প্ল্যানচেট করা হয়।'

সৌম্যেন্দু মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ঠিকই জানেন। এইভাবেই লোকে প্ল্যানচেট করে। এবং আমরাও সেইভাবেই করব। সেই জন্যেই আগে একটা ছবি দেখাব। ছবিটায় খুব ভালো করে তার মুখ-চোখ লক্ষ্য করবেন। আপনি আপনার মনের মধ্যে তার মুখের ছাপ নিয়ে নেবেন। তারপর চুপ করে তার কথা ভাববেন। যেমন প্ল্যানচেট করার সময় সবাই করে।'

সৌম্যেন্দু একটু থেমে যোগ করল, 'সেই আত্মা এলে আমি তাকে প্রশ্ন করব, সে এখন কেমন আছে, শান্তিতে আছে কিনা। আমি জানি, নিশ্চিত ভাবেই জানি, তার আত্মা খুবই কষ্ট পাচ্ছে, খুবই অশান্তিতে আছে। তবু তাকে প্রশ্নটা করব। তার নিজের কাছে উত্তরটা শুনব।'

কথাটা বলে সৌম্যেন্দু অদ্ভুত ভাবে হাসল। মোমবাতির স্বল্প আলোয় সেই হাসিটা কেমন রহস্যময় মনে হল। আধা অন্ধকারে সৌম্যেন্দুর সেই রহস্যময় হাসিটাই যেন হঠাৎ একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলল। অন্তত এই মুহূর্তে ইন্দ্রনীলের তাই মনে হল।

ইন্দ্রনীল অবশ্য একটা কথা না বলে পারল না। সে প্রশ্ন করল, 'এর আগে আপনি কখনো এই আত্মাকে প্ল্যানচেটে এনেছেন?'

সৌম্যেন্দু উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'সে-সব অনেক কথা। সে-সব কথা আমি আপনাকে বলব না। তবে এইটুকু জানবেন, ভূত-প্রেত নিয়ে আমি অনেক একস্‌পেরিমেন্ট করেছি। তান্ত্রিক-টান্ত্রিক নিয়েও অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি।'

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সৌম্যেন্দু। মোমবাতিটা হাতে নিয়ে বলল, 'আসুন, আপনাকে ছবিটা দেখাই।'

সৌম্যেন্দুর পেছনে পেছনে ইন্দ্রনীল দেওয়ালে-টাঙানো একটা

ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ছবিটা ভালো করে দেখুন।' মোমবাতিটা উঁচু করে তুলে ধরল সৌম্যেন্দু।

মোমের আলোয় ফটোটা দেখে চমকে উঠল ইন্দ্রনীল। এ-যে নীলাঞ্জনা। সেই চোখ, সেই মুখ। কেবল তফাৎ মাথায় ঘোমটা, থুতনিতে তিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ইন্দ্রনীলের চোখে সেই পার্থক্যটুকুও ধরা পড়ল না। তার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে গেল, 'একি, এ-যে নীলাঞ্জনা।'

'নীলাঞ্জনা!' সৌম্যেন্দুর ভুরু জোড়া সঙ্কুচিত হল। ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে বলল, 'নীলার সঙ্গে কলকাতায় থাকতেই আপনার আলাপ ছিল নাকি?'

সৌম্যেন্দুর প্রশ্নে অপ্রতিভ হল ইন্দ্রনীল। নিজেকে সহজ করতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তার। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে ইন্দ্রনীল বেশ মোলায়েম করে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলুন তো?'

সৌম্যেন্দুর মুখের চেহারা সামান্য কঠিন হয়ে উঠল। সে একটু কর্কশ স্বরেই বলল, 'প্রশ্ন যে জন্যেই হোক, আলাপ ছিল কিনা বলুন।' তার চোখে কেমন এক সন্দেহের ছায়া দুলতে লাগল।

ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে অকম্পিত গলায় বলল, 'কস্মিনকালেও না। মিস মিত্র-কে সেদিন অফিসেই প্রথম দেখি।'

ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে সৌম্যেন্দুর চোখ থেকে সন্দেহের ছায়াটা মিলিয়ে গেল। তার ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখাও দেখা দিল। ইন্দ্রনীলের চোখে চোখ রেখে সে বলল, 'আপনি নামটা এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন যে, আমার মনে হল, আপনাদের দুজনের গভীর আলাপ আছে।' একটু থেমে যোগ করল, 'আজকাল কলকাতায় সদ্য-পরিচিত ছেলেমেয়েদের এইরকম নাম ধরে ডাকা-ডাকি হয় নাকি? আমার অবিশ্যি দীর্ঘদিন কলকাতার জীবনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। বর্তমান জেনারেশনের চাল-চলনের কোনো খবরই রাখি না।'

ইন্দ্রনীল পাকা অভিনেতার মত অনায়াস ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি কিন্তু ধরেছেন ঠিক। আজকাল কলকাতায় কলেজে-পড়া ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ-রকম একটা রীতি চালু আছে।'

সৌম্যেন্দু ইন্দ্রনীলের কথা অবিশ্বাস করল বলে মনে হল না। হয়তো তাই আগের কথায় ফিরে গেল। বলল, 'হ্যাঁ, নীলার মুখের সঙ্গে ওর মায়ের মুখের খুব মিল আছে। তবে ওই মিল থাকা পর্যন্তই। নীলা ওর মায়ের সৌন্দর্যের কণা অংশও পায়নি। ওর মায়ের সৌন্দর্য কেমন ছিল জানেন? পূর্ণিমার রাতে তাজমহলের ওপর চাঁদের আলো পড়লে যে-সৌন্দর্য ঠিকরে পড়ে কতকটা সেই রকম। এর সঙ্গে আবার অজন্তা-ইলোরার ক্লাসিকাল ভঙ্গি মিশিয়ে দিন। ব্যস। তাহলেই পেয়ে যাবেন সুমিত্রা দেবী, মানে নীলার মায়ের সৌন্দর্য। ব্যাপারটা ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আপনি কল্পনা করে নিন।'

সৌম্যেন্দুর বিবরণ দেওয়ার ভঙ্গিতে বেশ অবাক হল ইন্দ্রনীল। সৌম্যেন্দুর মধ্যে যে এ-রকম একজন কল্পনা-প্রবণ মানুষ থাকতে পারে ইন্দ্রনীলের তা চিন্তার অতীত ছিল। সে তাই মোমের আলোয় আলোকিত নীলাঞ্জনার মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবল, কি ছিল এই অ-দেখা নারীর সৌন্দর্যে, যা এই শুষ্ক রুক্ষ মানুষটার মধ্যে আজো রসের সঞ্চার করতে পারে।

ইন্দ্রনীলের ভাবনায় বাধা পড়ল। সৌম্যেন্দু বলল, 'আপনার মনের মধ্যে নীলার মায়ের ছাপ নিশ্চয় খুব ভালোভাবেই পড়ে গেছে। এবার চলুন, কাজে বসা যাক।'

ওরা আবার যে-যার চেয়ারে বসল। প্ল্যানচেটের যন্ত্রে দুজনে হাত ছুঁয়ে রাখল। সৌম্যেন্দু অনুচ্চ কণ্ঠে, কতকটা ফিস ফিস করে বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু, মনস্থির করে সুমিত্রার কথা ভাবুন। এক—দুই—তিন—।'

ঠিক এই মুহূর্তে বন্ধ-দরজায় কেউ টোকা দিল। খুব মৃদু ভাবে। সেই মৃদু শব্দ দুজনের কানেই গেল। ইন্দ্রনীলের মধ্যে সামান্য

প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও সৌম্যেন্দু অবিচল রইল।

মৃদু শব্দটা কিন্তু একটু একটু শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমশঃ তা ধাক্কায় পর্যবসিত হল। সৌম্যেন্দু এই শব্দটাকে আর অগ্রাহ্য করতে পারল না। অত্যন্ত বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে পড়ল সে।

দরজা খুলেই সৌম্যেন্দু কেমন থম মেরে গেল। যাকে দেখল, এই মুহূর্তে তাকে সে আশাই করেনি। সামনে দাঁড়িয়ে ভোলেবাবা। তার চোখে ঠোঁটের ফাঁকে কেমন এক রহস্যময় হাসি।

ভোলেবাবাকে দেখে সৌম্যেন্দুর ক্রোধ বা বিরক্তি কোনটাই রইল না। পরিবর্তে তার চোখে-মুখে কেমন এক অসহায় ভাব ফুটে উঠল। সে ভেবে পেল না, ভোলেবাবার মতো একজন শক্তিশালী তান্ত্রিকের সামনে প্ল্যানচেট করা ঠিক হবে কিনা। কিন্তু সৌম্যেন্দুকে কিছু বলতে হল না। সে নিজেই বলল, 'বেটা, এখন কোনো আত্মা আনিস না। ফল ভালো হবে না। ক্ষতি হবে।'

ভোলেবাবার কথায় সৌম্যেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি তো প্রয়াগে ছিলেন। আমি এখন আত্মা আনছি আপনি কি করে জানলেন?'

ভোলেবাবা সামান্য ধমকের সুরে বলল, 'কি করে আর জানব? মা জানিয়ে দিলেন তাই জানলাম।' তারপর ঠোঁটের হাসি দীর্ঘায়িত করে বলল, 'মা আরো কি বললেন জানিস? বললেন, কলকাতায় ছেলেটির সঙ্গে নীলার মন দেওয়া-নেওয়া চলছিল।'

'কি?' সৌম্যেন্দু এমন চমকে উঠল যে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ সজোরে ভূমিকম্প হলেও সে বোধহয় এতটা চমকে উঠত না।

নিজেকে সামলে নিতে কয়েকটা সেকেণ্ড সময় লাগল সৌম্যেন্দুর।

কয়েক সেকেণ্ড পর নিজেকে সামলে নিয়ে সৌম্যেন্দু ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করে নেবার জন্য বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?'

ভোলেবাবা এবার অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কার কথা আবার? তুমি যার সঙ্গে আত্মা আনতে বসেছ তার কথা।'

ভোলেবাবার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সৌম্যেন্দুর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। ভুরু জোড়া সূক্ষ্ম হল, কপালে ভাঁজ পড়ল। ঘুরে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল সে।

চেয়ারে বসে ইন্দ্রনীল শুনতে পাচ্ছিল সবই। চেয়ার থেকে দরজার দূরত্ব এমন কিছু নয়, যে তার শুনতে অসুবিধে হবে। ইন্দ্রনীলের কানে যাতে না পৌঁছয় এমন অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলাও হচ্ছিল না। ভোলেবাবার কথা শুনতে শুনতে তার মনে হচ্ছিল, লোকটা নিশ্চয়ই কোনো মতলববাজ, বিশেষ কোনো মতলবে ঘুরছে। মায়ের কথা-টথা মিথ্যে। আসলে সে ভেতরে ভেতরে সব খবরই রাখছে। কলকাতায় থাকতে যে নীলাঞ্জনার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল, লোকটির হাতে হয়তো এর নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণও আছে। কাজেই এই অবস্থায় ইন্দ্রনীল ভাবল, নীলাঞ্জনার সঙ্গে পূর্ব-পরিচয় অস্বীকার করার কোনো মানে হবে না।

সৌম্যেন্দু ইন্দ্রনীলের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

সৌম্যেন্দু দরজার কাছে দাঁড়িয়েই অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল, 'কথাটা কি ঠিক, কলকাতাতেই আপনার এবং নীলাঞ্জনার পরিচয় ছিল? ঘনিষ্ঠ পরিচয়?'

ইন্দ্রনীল সপ্রতিভভাবে বলল, 'আজ্ঞে ঘনিষ্ঠ পরিচয় বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন জানি না। তবে আমাদের পরিচয় ছিল। নীলাঞ্জনা মিত্র এবং এ্যাপোলো কোম্পানির মিস মিত্র যে একই ব্যক্তি তা কিন্তু জানতাম না। এই কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন।'

উত্তরে সৌম্যেন্দু কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভোলেবাবার কাছ থেকে বাধা পেল। ভোলেবাবা দরজায় দাঁড়িয়েই বলল, 'বেটা, সেদিন প্রয়াগে বলেছিলাম না, তোমাদের মধ্যে একটা লেড়কা এসে

পড়েছে, বীচমে একঠো লেড়কা হ্যায় ?  আর সেই লেড়কাই সব কিছু গড়বড় করে দিচ্ছে।  এ-কথা বলেছিলাম কি না ?'

সৌম্যেন্দু ইন্দ্রনীলের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'আজ্ঞে হাঁা, বলেছিলেন।'

ভোলেবাবা একই ভঙ্গিতে হাসি-হাসি মুখ করে বলল, 'তাহলে এবার সেই লেড়কাকে ভালো করে চিনে নে বেটা। তবে ও ঠিক কথাই বলেছে, ও জানতো না যে, মেয়েটি একটি বড় কোম্পানির মালিক। লেকন্ এ-বাত ঠিক, ওরা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। এমনকি লেড়কী ও-কে বিয়েও করতে চায়।' ভোলেবাবা মোক্ষম কথাটা ছুঁড়ে দিল।

সৌম্যেন্দু আর কথা বাড়াল না। ইন্দ্রনীলের চোখে চোখ রেখে কর্কশ গলায় বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু আপনি এখন যান

ইন্দ্রনীল আর অপেক্ষা না করে দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল। কিন্তু ইন্দ্রনীল দু'পা অগ্রসর হতেই সৌম্যেন্দু কি ভেবে ইন্দ্রনীলকে আবার ডাকল। এবার আর তেমন কর্কশ গলায় নয়। বরং গলাটা যেন একটু মোলায়েমই। সে বলল, 'ইন্দ্রনীলবাবু, আপনি আগামীকাল সন্ধ্যেবেলায় আবার আসুন। কথা আছে। জরুরি কথা। অফিস-সংক্রান্ত।'

ইন্দ্রনীল একটুও সময় না নিয়ে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আচ্ছা, আসব।'

ইন্দ্রনীল দরজা দিয়ে বেরোবার সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভোলেবাবার দিকে পলকের জন্য তাকাল। তাকিয়েই তার মনে হল, লোকটিকে কোথায় যেন সে দেখেছে। অন্য কোনো পোশাকে, অন্য কোনো পরিবেশে। কিন্তু কোথায় কি ভাবে তা সে কিছুতেই মনে করতে পারল না। টিলার পথ ধরে নামতে নামতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গেল তাই।

ইন্দ্রনীল বেরোতেই ভোলেবাবা কতকটা ফিস ফিস করে বলল, 'বেটা, কাল তোর শুভদিন। শুভদিনে পবিত্র ক্ষেত্রে সব কিছু করবি।

পবিত্র ক্ষেত্র হল ওহি ওয়াচ-টাওয়ার, সমঝে ?'

সৌম্যেন্দু টান-টান চোখে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন, আমি আমার সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওখানেই করি। তা-ই করব।'

এদিকে দোতলার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে বসে ছিল নীলাঞ্জনা। ইন্দ্রনীল যখন সৌম্যেন্দুর কাছে এসেছিল তার অনেক আগে থেকেই। ইন্দ্রনীল যে অফিসের কাজ নিয়ে তার কাকার কাছে আসবে তা সে জানত। কিন্তু কাজে কতটা দেরি হতে পারে তা' সে জানত না। কতকটা ইন্দ্রনীলকে দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই জানালায় বসে ছিল সে। ইন্দ্রনীল যখন আসে তখন সে তাকে লক্ষ্যও করেছিল। তবে ইন্দ্রনীল তাকে দেখতে পায়নি। দেখার কথাও না। জানালার অবস্থিতিটাই এমন যে রাস্তা থেকে ঠিক দেখা যায় না।

জানালায় বসে নীলাঞ্জনা খুবই অবাক হল, যখন দেখল তার কাকা ইন্দ্রনীলকে সঙ্গে নিয়ে একতলার অন্য একটা ঘরে প্রবেশ করল। যে-ঘরটা সম্বন্ধে নীলাঞ্জনার ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ভীতি আছে। যে-ঘরটায় বড় হয়ে সে কখনো প্রবেশ করেনি। যে-ঘরে বসে তার কাকা সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার করেছে। কেন তন্ত্র-মন্ত্রের ব্যাপার করেছে তার কোন খবর সে রাখে না। রাখার কোনো প্রয়োজনও বোধ করে না। তবে ঘরটার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, এটা সে মনে করে।

ওই ঘরে ইন্দ্রনীলকে প্রবেশ করতে দেখে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়েই জানালার পাশে বসেছিল নীলাঞ্জনা। কিছুক্ষণ পরেই এল ভোলেবাবা। সে-ও গিয়ে দাঁড়াল ওই ঘরের সামনেই। এবার ইন্দ্রনীল সম্বন্ধে ভয় হল নীলাঞ্জনার। কারণ, এই ভোলেবাবা লোকটিকে নীলাঞ্জনা আগে কখনো দেখেনি। এবার এসেই প্রথম দেখছে। লোকটিকে একেবারেই ভালো লাগেনি। তাছাড়া তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে তার বরাবরই কেমন একটা ভয় আছে। এক অজানা আতঙ্ক কাজ করে সব সময়।

নীলাঞ্জনা আর ওপরে চুপচাপ থাকতে পারল না। এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে নেমে এল নিচে। নিচে নেমে ঘরটার কাছাকাছি একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। আড়ালে দাঁড়িয়ে তিন জনের সব কথাবার্তাই শুনতে পেল সে। শুনে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে ভোলেবাবা যখন মুরুব্বি চালে বলল, তবে ওরা ঘনিষ্ঠভাবেই মেলামেশা করে। এটা পাক্কা। এবং পরক্ষণেই নীলাঞ্জনার কাকার কর্কশ আদেশ, ঠিক আছে, আপনি এখন যান। নীলাঞ্জনার মাথায় তখন যেন রক্ত চড়ে গেল।

নীলাঞ্জনা ওইটুকু শুনেই থামের আড়াল থেকে সরে গিয়েছিল। ইন্দ্রনীলের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষাও করেনি।

নীলাঞ্জনা ওখান থেকে সরে গিয়ে গ্যারেজ গেল। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

রাস্তায় কিছুটা এসেই ইন্দ্রনীলকে ধরে ফেলল নীলাঞ্জনা। ভাবনায় বিভোর ইন্দ্রনীলের পাশে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'হ্যামলেট, গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ো। কুইক।'

ইন্দ্রনীল নীলাঞ্জনার কথা উপেক্ষা করতে পারল না। সামান্য ইতস্ততঃ করেও গাড়িতে উঠে পড়ল সে। গাড়িতে উঠে নীলাঞ্জনার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করল, কি এক উত্তেজনায় তার মুখ থম-থম করছে। ইন্দ্রনীল তাই বলল, 'যাচ্ছ কোথায়? তোমাকে কিন্তু উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোনো গোলমাল হয়নি তো?'

নীলাঞ্জনা সে-কথার উত্তর না দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে প্রশ্ন করল, 'ড্রইংরুমে না বসে তোমরা ওই ঘরটায় বসেছিলে কেন? ওখানে অফিসের কাজ হয় না। আর তোমার তো অফিসের কাজেই এখানে আসার কথা ছিল।'

নীলাঞ্জনার মুখের ওপর সামান্য চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইন্দ্রনীল বলল, 'হ্যাঁ, কথা তা-ই ছিল। তবে তোমার কাকার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যানচেটে বসতে চেয়েছিলেন। প্ল্যানচেটে বসে কার আত্মা আনতে চেয়েছিলেন জানো?'

নীলাঞ্জনা উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

ইন্দ্রনীল নিজেই বলল, 'তোমার মার।'

নীলাঞ্জনা ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল যেন। কাকা যে তার মৃত মায়ের আত্মাকে প্ল্যানচেটে আনার কথা ভাবতে পারে এটা তার কখনো মনেই হয়নি। ব্যাপারটা অভিনব মনে হল। সেই সঙ্গে সে মনে মনে আঘাত পেল, আহত হল।

ইন্দ্রনীল অনুত্তেজিত গলায় বলতে লাগল, 'এই উদ্দেশ্যে সৌম্যেন্দুবাবু তোমার মার একখানা ফটো দেখালেন। মা এবং মেয়ের মুখের মধ্যে যে এতটা মিল থাকতে পারে, ভাবা যায় না। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। প্রথমটা ভেবেছিলাম, তোমারই ফটো বুঝি। আমার মুখ থেকে অসতর্কভাবে তোমার নামটা বেরিয়েও গিয়েছিল। এমনভাবে যে, তা শুনলে যে-কোন মানুষের সন্দেহ পারত, আমার-তোমার মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। সৌম্যেন্দুবাবুরও সেই সন্দেহই হয়েছিল। তিনি রীতিমতো সন্দিগ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। আমি মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যানেজ হল না। সব গোলমাল করে দিল ভোলেবাবা।'

নীলাঞ্জনা একটা অস্ফুট শব্দ করে বলল, 'হুঁ, তারপরের সব কথা আমি শুনেছি। ওপর থেকে ভোলেবাবাকে দেখেই আমি নিচে নেমে এসেছিলাম। তোমাদের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। তারপরই গাড়ি বের করে তোমার পেছনে পেছনে ছুটে এসেছি।'

নীলাঞ্জনা সামান্য সময় চুপ করে থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, 'তোমার জন্যে আমার কেমন ভয় হচ্ছে। কেন যে আমি তোমার জীবনে এলাম?'

নীলাঞ্জনার কথায় কি ছিল কে জানে। কথাটা ইন্দ্রনীলের মনে অন্য একরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তার মাথার মধ্যে হঠাৎ অন্যদিনের অন্য একটা ছবি ভেসে উঠল। সেই ছবি, রবীন্দ্রনাথ মার্কা লম্বা দাড়িওয়ালা লিণ্ডসে স্ট্রীটের সেই বৃদ্ধের ছবি। এবং এই ছবিটা তার মাথার মধ্যে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একটা

আবিষ্কারের আনন্দে ইন্দ্রনীলের চোখ-মুখ হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, 'ইউরেকা।'

নীলাঞ্জনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হল?'

ইন্দ্রনীল একই ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তোমাদের ভোলেবাবার পরিচয় পেয়ে গেছি।'

'কি পরিচয়?' নীলাঞ্জনার চোখ থেকে তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

ইন্দ্রনীল এবার বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'সে কথা পরে বলছি। তার আগে বলি, আমি একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছি। কোথাও কোনো ভাবে তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ভোলেবাবা তারই একটা খুঁটি। তোমার সঙ্গে আমাকেও এরা জড়িয়ে ফেলেছে।'

'তোমাকে? তোমাকে কেন?' নীলাঞ্জনার ভুরু সঙ্কুচিত হল।

ইন্দ্রনীল মৃদু হেসে সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার কথার মধ্যেই এর উত্তর লুকিয়ে আছে। ওই যে তুমি বললে, কেন তুমি আমার জীবনে এলে, অথবা ঘুরিয়ে বললে, কেন আমি তোমার জীবনে এলাম। আমাকে জড়ানোর উদ্দেশ্য এটাই।'

ইন্দ্রনীল তার হাসিটা দীর্ঘায়িত করে বলল, 'যাকগে সে-কথা। এবার বলো তো তোমার কোনো দাদু আছেন কিনা? নিকট অথবা দূর-সম্পর্কের?'

নীলাঞ্জনা ঠোঁটে ঢেউ তুলে বলল, 'না। নেই। আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনের কথাই আমি শুনিনি। কেবল শুনেছি, মার এক দূর-সম্পর্কের দাদা আছেন। তা' তিনিও বিলেতে। তিনি নাকি মেম বিয়ে করে ওখানেই রয়ে গেছেন। কাকার কাছে শুনেছি, তাঁর সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক খুবই খারাপ ছিল। এত খারাপ যে, কাছাকাছি থাকলে খুনোখুনি হতে পারত। এনি ওয়ে, তাঁকেও আমি কখনো দেখিনি।'

ইন্দ্রনীল গম্ভীর মুখ করে বলল, 'দেন উই আর ইন ডেঞ্জার। টু

স্পিক ইউ ফ্রাঙ্ক্‌লি উই আর এনট্র্যাপ্‌ড। আমাদের চারদিকে জাল ছড়ানো হয়েছে।'

ইন্দ্রনীল এবার রেষ্টুরেন্টের ঘটনা থেকে সব বলল। তারপর সামান্য হেসে যোগ করল, 'আমি অবিশ্যি লিণ্ডসে স্ট্রীটের সেই ভদ্রলোকের কথা সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি সত্যিই বিয়ে করবে না বলে পণ করে বসে আছ। সুর-তাল নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিতে চাও। ভেবেছিলাম ধনী লোকেদের যেমন নানা রকম খেয়াল থাকে, তোমারও এটা তেমনি একটা খেয়াল। পরে মনে হয়েছে তোমার নিঃসঙ্গতাই এর জন্য দায়ী।'

নীলাঞ্জনা গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার ওপর দৃষ্টি রেখে শান্তভাবে বলল, 'ধনীদের সম্বন্ধে তোমার কতগুলো ধারণা আছে, না? আই মিন, প্রি-কনসিভড্‌ আইডিয়া।'

ইন্দ্রনীল চোখের কোণ দিয়ে নীলাঞ্জনাকে একবার দেখল। উত্তর দিল না।

নীলাঞ্জনা ঠোঁটের ফাঁকে সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। সে ধীরে ধীরে বলল, 'আচ্ছা, তুমি যদি প্রথমেই জানতে যে, এ্যাপোলো কোম্পানীটা আমাদের, তাহলে কি এখানে চাকরি করতে আসতে?'

ইন্দ্রনীল সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'সম্ভবত না।'

'কেন?' সামনে দৃষ্টি রেখেই প্রশ্ন করল নীলাঞ্জনা।

ইন্দ্রনীল কাঁধে একটা দোলা দিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'স্পষ্ট কারণ কিছু নেই। তবে বলতে পারো, একটা কমপ্লেকস্‌। মিডল্‌-ক্লাস সুলভ।'

নীলাঞ্জনা হাসল না। চুপ করে কি একটু ভাবল। তারপর বলল, 'প্রফেসর নন্দী সত্যিই তোমাকে ভালোবাসেন। ভালো না বাসলে কেউ কাউকে এমন করে চিনতে পারে না।'

ইন্দ্রনীল কথাটার অর্থ ধরতে পারল না। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, 'এ-কথার অর্থ?'

নীলাঞ্জনা হরিসাধনের সঙ্গে সেদিন যে আলোচনা হয়েছিল তার হুবহু বিবরণ দিল।

সব শুনে ইন্দ্রনীল গাঢ় স্বরে বলল, 'হরিসাধনবাবু সত্যিই আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন।' একটু থেমে যোগ করল, 'হয়তো তিনি অনুভব করেছিলেন, আমরা প্রথম দর্শনেই পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছি। সেই জন্যেই তিনি গোড়াতেই এ্যালার্ট হয়েছিলেন, যাতে আমাদের মধ্যে কোন মিস-আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং না হয়।'

ইন্দ্রনীলের সঙ্গে হরিসাধনের যা-যা আলোচনা হয়েছিল, ইন্দ্রনীল তা-ও বলল।

নীলাঞ্জনা ইন্দ্রনীলের কথা শুনে অস্ফুট শব্দ করে বলল, 'সত্যি, হরিসাধনবাবু আমাদের মস্ত বড় শুভাকাঙ্ক্ষী।'

সামান্য সময় দুজনেই চুপচাপ রইল। কি একটু ভেবে নীলাঞ্জনাই আগের কথার জের টেনে বলল, 'ষড়যন্ত্রকারী যারাই হোক, তারা যে তোমাকে এবং আমাকে দুজনকেই অনুসরণ করছে, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' একটু থেমে যোগ করল, 'সত্যি তোমার জন্যে ভারি খারাপ লাগছে। আমার কথা বাদ দাও, আমি তো জন্মলগ্ন থেকেই দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছি। শিশু বয়েসে যে মেয়ে মা-বাবাকে হারায় তার কি কম দুর্ভাগ্য! কিন্তু তুমি কেন আমার জন্য সাফার করবে?'

নীলাঞ্জনার কথায় আহত হল ইন্দ্রনীল। তার চোখে-মুখে তা' প্রকাশও হয়ে পড়ল। সে সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কি তোমার দুঃখের ভাগ নিতে পারি না? আমার সেই অধিকার নেই?'

'নিশ্চয়ই অধিকার আছে, হ্যামলেট। তবু ভয় করে। কি জানি কেন।' নীলাঞ্জনার গলায় আবেগ প্রকাশ পেল।

ইন্দ্রনীল গাঢ় স্বরে বলল, 'সেই ভয়টাকেই আমি জয় করতে চাই। যেমন করে পারি। আমাকে কেবল সেই সুযোগ দাও।'

নীলাঞ্জনা এ-কথার কোনো উত্তর দিল না। উত্তর দিতে পারল না। ইন্দ্রনীলের চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল কেবল।

নীলাঞ্জনার সেই হাসির মধ্যেই ইন্দ্রনীল তার উত্তর খুঁজে পেল। ইন্দ্রনীলও নীলাঞ্জনার চোখে চোখ রেখে হাসল। তৃপ্তির হাসি।

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। নীলাঞ্জনাই এক সময় বলল, 'ভোলেবাবা সম্বন্ধে অন্য আর একটা সন্দেহও হচ্ছে। এমনও হতে পারে, লোকটা হয়তো আমার এবং কাকার দুজনেরই ক্ষতি করতে চাইছে। টাকার জন্যেই। হয়তো আমরা দুজনেই ওর টার্গেট।'

ইন্দ্রনীল বলল, 'তাহলে তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তোমার কাকাকে বুঝিয়ে বললেই তিনি সব এ্যাকসন নেবেন।'

নীলাঞ্জনা ম্লান হেসে বলল, 'না তিনি তা' নেবেন না। এইসব তান্ত্রিক-টান্ত্রিক সম্বন্ধে তিনি একেবারে অন্ধ। তিনি আমাদের কথা বিশ্বাসই করবেন না। তাছাড়া বিশ্বাস করাবার মতো আমাদের হাতে জোরালো কোনো প্রমাণও নেই। আমরা কেবল অনুমান করছি।'

নীলাঞ্জনা একটু থেমে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার তো প্রায়ই মনে হয়, বাবাকে কেউ খুন করেছে। কারণ, সে মানুষটা দু'দিন বাদে আত্মহত্যা করবে অর্থাৎ যে মানুষটা অমন বিষণ্ণতায় ভুগছে যে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে পারে, সে কখনোই তার ব্যবসাকে বাড়াবার জন্যে এমন উদ্যোগী হতে পারত না। তার কাজ-কর্মে কোনো না কোনো ভাবে হতাশার প্রকাশ হতই। কিন্তু তবু এটা আমার অনুমান। মিয়ার হাইপোথিসিস। জোর দিয়ে বলতে পারছি না। কাজেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ভোলেবাবা লোকটা সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো।'

ইন্দ্রনীল সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কাকা আগামীকালও মিত্র-ভিলায় যেতে বলেছেন। সন্ধ্যেবেলায়। কি নাকি জরুরি কথা আছে। অফিস-সংক্রান্ত। আমার কিন্তু কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি। তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হল,

অন্য কারণে যেতে বলেছেন। সম্ভবত তোমার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপার নিয়েই কথা বলবেন। তিনি এই ব্যাপারটায় এত উত্তেজিত হয়েছেন যে, এত অল্পে ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয় না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, উনি বলবেন, হয় মেলামেশা বন্ধ করুন, আর না হয় রেজিগনেশন সাবমিট করুন ’

এতক্ষণের আলোচনায় নীলাঞ্জনার উত্তেজনা অনেক প্রশমিত হয়েছিল। ইন্দ্রনীলের এই কথায় সে আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এত উত্তেজিত যে, মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল, সে গাড়ি চালাচ্ছে, তার হাতে ষ্টিয়ারিং-হুইল, সামান্য অসাবধানতায় তাকে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। উত্তেজিত ভাবে ইন্দ্রনীলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে একটা হাত প্রসারিত করে বলল, ‘রেজিগনেশন? বললেই হল? আমি তাহলে লড়াই করব।’

ইন্দ্রনীল কোনো উত্তর দেবার সুযোগ পেল না। সামনে তাকিয়ে আঁতকে উঠল সে। সভয়ে দেখল, ওদের গাড়িটা একটা লরির প্রায় মুখোমুখি এসে পড়েছে। মুহূর্তে সমস্ত ভাবনা তার মাথা থেকে উড়ে গেল। সে নীলাঞ্জনার এক হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে সবেগে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিল। গাড়ির মুখ ঘুরে যেতেই নীলাঞ্জনা ব্রেক চেপে গাড়ি থামিয়ে দিল।

গাড়িটা থামতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নীলাঞ্জনা বলল, ‘তুমি দেখতে না পেলে কি-যে হত ভাবতে পারছি না।’

উত্তরে ইন্দ্রনীল মৃদু স্বরে বলল, ‘তোমার এত উত্তেজিত হওয়া উচিত হয়নি।’

ইন্দ্রনীলের এই কথা তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। তার মাথায় তখনো আগের কথাগুলোই ঘুরছে। সে হঠাৎ বলল, ‘ইটস্ আ চ্যালেঞ্জ, হ্যামলেট। কাকা আমাদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এবং আমরা সেই চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করব।’

ইন্দ্রনীল নীলাঞ্জনার কথার অর্থটা ঠিক ধরতে পারল না। কিন্তু

নীলাঞ্জনার আবেগ তাকে স্পর্শ করল। সে স্পষ্ট করে কিছু না বুঝেও বলল, 'আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো। যে-কোন অবস্থায় আমি তোমার পাশে আছি, থাকব। এ্যাট এনি কস্ট।'

নীলাঞ্জনা টান-টান চোখে ইন্দ্রনীলের চোখের দিকে তাকাল। সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'আমরা আর দেরি করব না, হ্যামলেট। আর দেরি করলে হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

ইন্দ্রনীল এ-কথার অর্থ বুঝল না। সে নীলাঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে তার কথার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করল।

নীলাঞ্জনা একই ভঙ্গিতে দৃঢ় স্বরে আবার বলল, 'পরশু ম্যারেজ-রেজিস্টারের কাছে গিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলতে হবে। অবিশ্যি তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

ইন্দ্রনীলের চোখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় খেলা করে গেল। সে নীলাঞ্জনার একটা হাত নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে বাঁচালে নীলা।'

ইন্দ্রনীলের মুখে এর চেয়ে বেশি কথা জোগাল না।

এদিকে ভোলে বাবা মিত্র-ভিলা থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটা দিল বড় রাস্তার দিকে। বড় রাস্তায় এসে একটা টেম্পো ধরে চলে গেল সঞ্জয় বোসের প্রতাপগড়ের ডেরায়। সঞ্জয় তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ভোলেবাবাকে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কি খবর? সব ঠিক-ঠাক চলছে তো?'

ভোলেবাবা গম্ভীর মুখে বলল, 'এখনো তা' বলা যাচ্ছে না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ডিউটি অব ভোলেবাবা ইজ ওভার। কাল থেকে সত্যসিন্ধুর কাজ শুরু হবে। এই জন্যেই গত কাল এলাহাবাদ থেকে এ্যাটাচি কেসটা এনে রেখেছি।'

সত্যসিন্ধু ভোলেবাবার ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজের পোশাক পরল। তারপর সঞ্জয়কে বলল, 'সুমিত্রা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের যে

পারিবারিক গ্রুপ ফটোটা দেখিয়েছিলেন সেটা নিশ্চয় আপনার সঙ্গেই আছে?'

সঞ্জয় স্মিত হেসে বলল, 'থাকবে না কেন? আপনি তো সঙ্গেই রাখতে বলেছিলেন।'

'আর আপনাকে লেখা সুমিত্রা দেবীর কোনো পুরোনো চিঠি?' সঞ্জয়ের কথার পিঠে পিঠে প্রশ্ন করল সত্যসিন্ধু।

সঞ্জয় কাঁধে একটা দোলা দিয়ে বলল, 'আপনাকে বলেইছি, একটা মাত্র চিঠি আছে। বিয়ের সময়ে লেখা। ওদের বিয়েতে আমি আসতে পারিনি। ডিউ টু রিপেনট্যান্স চিঠিটা আমি নষ্ট করতে পারিনি। এই চিঠির কথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি।'

সত্যসিন্ধু আর কোনো কথা বলল না। একটা সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে তার পরিকল্পনাটা আর একবার ঝালিয়ে এটাচি কেস থেকে একটা চিঠি বের করল। চিঠিটা নীলাঞ্জনাকে লেখা অধ্যাপক হরিসাধন নন্দীর। আসলে এটা গবেষকের পরিচয় পত্র। ইনট্রো-ডাকসন-লেটার। চিঠিটায় তারিখের জায়গাটা ফাঁক ছিল। সত্যসিন্ধু সেখানে তিন দিন আগের তারিখটা বসিয়ে দিল। বলা বাহুল্য একই কলম এবং কালিতে।

পরদিন সকাল সাতটার পর তাকে মিত্র-ভিলায় গিয়ে নীলাঞ্জনার সঙ্গে দেখা করতে হবে। এই সময় হরিসাধনের চিঠিটা খুবই কাজে দেবে। এই কথা ভেবেই হরিসাধনের কাছ থেকে সত্যসিন্ধু চিঠিটা আগেই লিখিয়ে রেখেছিল।

সত্যসিন্ধু নীলাঞ্জনার সঙ্গে দেখা করার সময় বেছে নিয়েছে সকাল সাতটার পর। কারণ, সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত সৌম্যেন্দু বাইরে বেড়াতে বেরোয়। কখনো গাড়ি নিয়ে, কখনো পায়ে হেঁটে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনো ঋতুতেই বাদ যায় না। বেড়ানোর সময়ই কাজের স্পটগুলো দেখে নেয়। এবং দেখতে দেখতে সারা দিনের কাজের একটা ছকও মনে মনে তৈরী করে ফেলে। এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস। সত্যসিন্ধুর এই তথ্যটুকু জানা ছিল।

সত্যসিন্ধু কোনো ভাবেই সৌম্যেন্দুর মুখোমুখি হতে চায়নি। অবিশ্যি যদি নেহাতই মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে কি করবে, মনে মনে তারও একটা ছক কেটে রেখেছিল সত্যসিন্ধু। সেক্ষেত্রে নিজেকে একজন গবেষক হিসেবে পরিচয় দিয়ে মামুলি কথা বার্তা সেরে চলে আসবে। পৃথক ভাবে নীলাঞ্জনার সঙ্গে কথা বলবে অন্য কোনো সময়।

কিন্তু সত্যসিন্ধুর কপাল ভালো। অন্যান্য দিনের মতই সৌম্যেন্দু বেড়াতে বেরিয়েছিল। তাছাড়া বাইরে বাগানের ধারে দেখা পেয়ে গেল জানকীর। সে দূর থেকে সত্যসিন্ধুকে দেখেই সামনে এগিয়ে এল।

সত্যসিন্ধু কাছে এসে দু'হাত তুলে নমস্কার করে সহাস্যে বলল, 'চিনতে পারছেন?'

জানকী বিস্ময়ের সঙ্গেই বলল, 'চিনব না কেন? কিন্তু আপনি হঠাৎ? জায়গাটা চিনলেন কি করে?'

সত্যসিন্ধু স্মিত হেসে বলল, 'চেনার অসুবিধে কিছু নেই। প্রতাপ গড়ে এ্যাপোলো কোম্পানি এবং মিত্র-ভিলা সবাই চেনে। এলাহাবাদ বেড়াতে এসেছি। ভাবলাম, নীলাঞ্জনার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। সেদিন কলকাতায় চা খাওয়া হয়নি, আজ কিন্তু চা খাব।'

জানকী সহজ ভাবে হেসে বলল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, চা খাবেন বৈকি। চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন। আমি ওপর থেকে নীলাকে ডেকে দিচ্ছি।'

সত্যসিন্ধু ড্রইংরুমে প্রবেশ করতে করতে বলল, 'আমার নামটা মনে আছে তো? গবেষক সত্যসিন্ধু মুন্সী।'

জানকী ঘাড় হেলিয়ে হাসল কেবল। হাসি মুখে ভেতরে চলে গেল।

খবর পেয়ে নীলাঞ্জনা এক রকম ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল। কিন্তু সত্যসিন্ধুকে দেখেই কেমন থমকে গেল। মানুষটিকে তার খুবই চেনা মনে হল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারল না, কোথায় তাকে দেখেছে?

সত্যসিন্ধু নীলাঞ্জনার চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের অবস্থা অনুভব করল, কিন্তু তা পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, 'এসো নীলাঞ্জনা। অধ্যাপক হরিসাধন তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করতে করতে সে যোগ করল, 'এখানে এসেছি একটা জরুরি কাজে। বাই দি বাই তোমাকে 'তুমি' বললাম বলে কিছু মনে করলে না-তো ?'

নীলাঞ্জনা এবার হেসে ফেলল। হাসি মুখেই বলল, 'ওমা, সেকি কথা। আপনি 'তুমি' বলবেন না তো কি।' তারপর মাথায় একটা দোলা দিয়ে বলল, 'স্যারের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। অনেক প্রশংসা। শুনে শুনে আপনার ভক্ত হয়ে গিয়েছি। রিয়্যালি !'

সত্যসিন্ধু স্মিত হেসে চিঠিটা নীলাঞ্জনার হাতে দিতে দিতে বলল, 'আমিও তোমার নাচের ভক্ত তা নিশ্চয় জানো। তবে সে-সব আলোচনা পরে হবে। তুমি আগে চিঠিটা পড়ে নাও।'

নীলাঞ্জনা খামটা খুলে চিঠিটা পড়তে লাগল।

'স্নেহের নীলাঞ্জনা,

আশা করি, ভালো আছ এবং তোমাদের কোম্পানীতে জয়েন করার পর ইন্দ্রনীল-ও ভালো আছে। হয়তো অনুভব করতে পারো, আমি তোমাদের দুজনের জন্যেই খুব দুর্ভাবনায় থাকি। দুর্ভাবনার ডাইরেক্ট কারণ হয়তো কিছু নেই। তবু দুর্ভাবনা হয়। অতিরিক্ত স্নেহই হয়তো এর জন্যে দায়ী।

'যাক সে-কথা। গবেষক সত্যসিন্ধুকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। বর্তমানে সে একটা বড় গবেষণার কাজে যুক্ত আছে। কাজটা তোমাদের কাছাকাছি কোনো জায়গায়। এই ব্যাপারে তোমার সাহায্যের খুব প্রয়োজন। নির্ভাবনায়, নির্দ্বিধায়, তুমি ওকে সাহায্য করতে পারো। জেনে রেখো, ওকে সাহায্য করা মানে প্রকারান্তরে আমাকেই সাহায্য করা। পর গবেষণার ফলে যদি কোনো জিনিষ

অন্ধকার থেকে আলোয় আসে, তাহলে তুমি আমি সকলেই লাভবান হব। সমাজ লাভবান হবে।

'গবেষক হয়তো তার গবেষণার জন্যে এমন ছু'একটা কাজের অনুরোধ করতে পারে যা সাময়িক ভাবে অর্থহীন বলে মনে হবে। কিন্তু জেনে রেখো, ওর কোনো কাজই অর্থশূন্য নয়। ওর সমস্ত কাজের পেছনেই একটা অর্থ আছে।

'শেকস্‌পীয়র একটা জায়গায় বলেছেন, এই পৃথিবীটা, এই সংসারটা একটা নাট্য-মঞ্চ এবং এখানে আমরা বিভিন্ন রকম চরিত্রে অভিনয় করছি। বর্তমানে গবেষকের গবেষণাও ওই অভিনয়কে ঘিরেই। কাজেই ওর গবেষনার সাহায্যের জন্যে তোমাকেও হয়তো কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে হতে পারে। তুমি সঠিক ভাবে সেই চরিত্রের অভিনয় করবে এটাই আমার অনুরোধ। বাকি কথা গবেষকের কাছে শুনে নিও। চিঠি শেষ করার আগে শেকস্‌পীয়রের সেই কোটেশানটা তুলে ধরছি।

All the world's a stage,
And all the men and women merely players
They have their exists and entrancs,
And one man in his time plays many parts.
His acts being seven ages.

শুভেচ্ছান্তে—

হরিসাধন নন্দী।

চিঠি পড়া শেষ করে নীলাঞ্জনা তার অবাক তুটো চোখ তুলে ধরল সত্যসিন্ধুর দিকে। সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে মৃত্নু স্বরে বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। স্যার অভিনয়-টভিনয়ের কথা কিসব লিখেছেন। আপনার গবেষণার ব্যাপারে অভিনয়ের প্রয়োজন আছে নাকি।

সত্যসিন্ধু স্মিত হেসে বলল, 'সে-কথা পরে শুনবে।'
আগে বলো, হরিসাধনের কথার ওপর তোমার আস্থা আছে তো?'

নীলাঞ্জনা মাথায় একটা ঝটকা দিয়ে ভূরু সঙ্কুচিত করে বলল, 'একি বলছেন? নন্দী স্যারের ওপর আমার আস্থা নেই? বলুন না আমাকে কি করতে হবে।'

সত্যসিন্ধু সহাস্যে বলল, 'তোমাকে আমার সঙ্গে একটু বেরোতে হবে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। তাকে তুমি আগেও দেখেছ। তার একটা পরিচয়ও তোমার জানা। তবে অন্য আর একটা পরিচয় তোমার জানা নেই। আজ সেটাই জানতে পারবে। তবে এখন এসব কথা কাউকে বোলো না। জানকী মাসি-কেও না। তাকে কেবল বলো, আমার সঙ্গে একটা কাজে বেরোচ্ছ।'

নীলাঞ্জনার চোখে মুখে সামান্য চিন্তার রেখা দেখা দিল। তবে সে গবেষকের সঙ্গে বেরোতে অস্বীকার করল না। ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। সত্যসিন্ধু চা খেয়ে নীলাঞ্জনাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

## ॥ পনেরো ॥

অফিসে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে নীলাঞ্জনার দেখা হয়েছিল। কিন্তু অফিসের কাজ ভিন্ন বাড়তি কোনো কথা হয়নি। অফিসে অত্যন্ত গম্ভীর ছিল। নীলাঞ্জনাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, কোন কারণে ভেতরে ভেতরে সে অত্যন্ত অশান্ত হয়ে আছে। ইন্দ্রনীলের এটা দৃষ্টি এড়ায় নি। মনে মনে সে অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু খুঁজে পায় নি। কৌতূহল দমন করতে না পেরে দু'একবার সে নীলাঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু নীলাঞ্জনাই তাকে কোনো প্রশ্ন করতে দেয়নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে।

অফিস ছুটির পর বাইরে বেরোবার মুখে নীলাঞ্জনাই ইন্দ্রনীলের কাছে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল, 'কাকার কাছে আজ যাচ্ছ তো?'

ইন্দ্রনীল অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে বলো তো? সারাদিন এত গম্ভীর কেন?'

নীলাঞ্জনা সে-কথার উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখেই বলল, 'আমরা কিন্তু দু'এক দিনের মধ্যেই ম্যারেজ-রেজিস্টারের কাছে যাব। কাকাকে এই কথাটি জানিয়ে দিও।'

নীলাঞ্জনা সামান্য সময় চুপ করে থেকে যোগ করল, 'আজ রাত্রে আমি বাড়িতে থাকছি না। তুমি জানো না, প্রফেসর নন্দীর বন্ধু গবেষক সত্যসিন্ধু মুন্সী প্রতাপগড়ে এসেছেন। প্রফেসর নন্দীর একটা চিঠি নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা করেছিলেন। নন্দী স্যার চিঠিতে অনুরোধ করেছেন, গবেষকের গবেষণার সুবিধের জন্য আমাকে একটা অভিনয় করতে। সেই অভিনয়ের জন্যেই আজ যেতে হবে। কোথায় কিসের অভিনয় সে-সব এখনো জানি না। তবে ভয়-টয় কিছু থাকলে নন্দী স্যার এই অনুরোধ আমাকে করতেন না। এই বিশ্বাস আমার আছে। কাকা এসব জানেন না। তাঁকে এসব বোলো না। তিনি জানেন, এলাহাবাদে আমার একটা নাচের শো আছে। এখানে এলে এ-রকম তো প্রায়ই থাকে।'

ইন্দ্রনীল সামান্য চিন্তিত হয়ে বলল, 'সত্যসিন্ধু মুন্সী হঠাৎ এখানে কেন?'

নীলাঞ্জনা সামান্য বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'ডিটেলস্ আমিও জানি না। তবে একটা গবেষণার কাজে এসেছেন এটা ঠিক।' তারপর মৃদু হেসে যোগ করল, 'তুমি আমার জন্যে ভেবো না। নিশ্চিন্ত মনে কাকার কাছে যাও। গবেষক সত্যসিন্ধুরও এটাই অভিমত।'

নীলাঞ্জনার অন্যমনস্কতা, তার স্বভাব-বিরুদ্ধ কথা বলার ভঙ্গি, সর্বোপরি সত্যসিন্ধুর গবেষনার ব্যাপারে অজানা অভিনয়ে নীলাঞ্জনার সম্মতি দান ইন্দ্রনীলকে ভাবিত করে তুলল। তার কাছে সব কিছুই কেমন গোলমেলে ঠেকল। কিন্তু খোলাখুলি ভাবে নীলাঞ্জনাকে এসব বলতে অস্বস্তি বোধ করল।

ইন্দ্রনীল অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম-টিশ্রাম করে সাড়ে

সাতটায় মিত্র-ভিলায় গেল। মনের মধ্যে কাঁটায় খোঁচা লাগার মত একটা অশান্তি রয়েই গেল।

ইন্দ্রনীল ড্রইংরুমে প্রবেশ করে দেখল, সৌম্যেন্দু অত্যন্ত গম্ভীর মুখ করে একটা সোফায় বসে আছে। ইন্দ্রনীলকে দেখেই কিন্তু তার চোখ-মুখের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল। সামান্য উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বলল, 'তুমি এসেছ তাহলে। বোসো বোসো।' কি একটু ভেবে সহাস্যে যোগ করল, 'ও হ্যাঁ, আমি কিন্তু তোমাকে তুমিই বলছি। এখন থেকে তোমাকে তুমি বলব। তোমার আপত্তি নেই তো?'

ইন্দ্রনীল সামনের সোফাটায় বসতে বসতে বলল, 'না-না, আপত্তি থাকবে কেন?'

সৌম্যেন্দু অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম, আজ তুমি আসবে না। মানে তোমার আসা হবে না।'

ইন্দ্রনীলের গলায় সামান্য উষ্মা প্রকাশ পেল। বলল, 'কথা দিয়ে আসব না, তা কি হয়?'

সৌমেন্দু ইন্দ্রনীলের চোখের দিকে তাকিয়ে অমায়িক ভাবে হাসল।

ইন্দ্রনীল এই ক'দিনের মধ্যে সৌম্যেন্দুর মুখে এ-রকম হাসি দেখেনি। তার মুখে সব সময়ই কেমন এক রুক্ষ বিষণ্ণতা লক্ষ্য করেছে।

সৌম্যেন্দু হাসি মুখেই বলল, 'জানো বোধ হয়, এলাহাবাদে আজ নীলার একটা নাচের প্রোগ্রাম আছে? এ-রকম প্রোগ্রাম নীলাঞ্জনার মাঝে-মাঝেই থাকে তা-ও নিশ্চয় জানো?'

ইন্দ্রনীল চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে বুঝিয়ে দিল, ব্যাপারটা তার অজানা নয়।

সৌম্যেন্দু একই ভঙ্গিতে আবার বলল, 'কেনই-বা জানবে না, তোমরা তো অনেক দিন থেকেই মেলামেশা করছো।' সৌম্যেন্দু সামান্য সময় চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে বলল, 'নীলার মা সুমিত্রাও বিয়ের আগে নাচের অনেক প্রোগ্রাম করতো। সেই সব প্রোগ্রামের

জন্য নীলার বাবা অরুণাভেরও খুব গর্ব ছিল। কিন্তু বিয়ের পর ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। সে তার স্ত্রীকে পাবলিক স্টেজে নাচতে দিতে রাজি হল না। তা থেকে নানা রকম অশান্তি। অশান্তি এত চরমে উঠল যে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড। ও-হ্যাঁ, তুমি জানো নিশ্চয়, নীলার বাবা এবং মা দুজনেই সুইসাইড করেছে?'

ইন্দ্রনীল অস্ফুট স্বরে বলল, 'জানি।'

ইন্দ্রনীলের কথা সৌম্যেন্দুর কানে গেল বোলে মনে হল না। সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বলল, 'ছেলেরা স্বামী হলে অন্য রকম হয়ে যায়। স্ত্রী তাদের সম্পত্তি, এ-রকম একটা ভাবনা বোধ হয় তাদের মাথায় আসে।'

ইন্দ্রনীল অবাক হল। সৌম্যেন্দুর মুখে এ-রকম তাত্ত্বিক কথা-বার্তা শুনবে বলে সে আশাই করেনি। বিশেষ করে আজকের সন্ধ্যায়। আজ সে মনে মনে অন্যভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। কতকটা লড়াই-এর মনোভাব নিয়ে।

সৌম্যেন্দু এবার সামান্য ঝুঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'তোমরা দুজনে মেলামেশা করছো কি মন নিয়ে? দুজন দুজনকে কি-ভাবে পেতে চাইছো? কোনো হেঁয়ালি না করে স্পষ্ট করে বলো। আমি স্পষ্ট কথা ভালোবাসি।'

ইন্দ্রনীল অনুভব করল, তারা এবার লড়ায়ের ময়দানে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়েছে। এতক্ষণের কথা-বার্তা ছিল এই লড়ায়ের ভূমিকা মাত্র।

ইন্দ্রনীল প্রথমেই আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিল না। সে সামান্য সতর্ক হয়ে উত্তর দিল, 'আমরা মেলামেশি করি বন্ধুর মতো। দুজন দুজনের বন্ধুত্ব চাই।'

ইন্দ্রনীলের কথায় সৌম্যেন্দুর মুখের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। কেমন একটা রুক্ষতা প্রকাশ পেল। চাপা ধমকের সুরে বলল, 'বন্ধুত্ব? অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মধ্যে বন্ধুত্ব হয় কখনো? পরিস্কার করে বলো, তোমরা বিয়ে করতে প্রস্তুত কিনা। তোমরা এ বিষয়ে

আলোচনা করেছো কিনা।'

ইন্দ্রনীল তখন মনে মনে লড়ায়ের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। সে সৌম্যেন্দুর মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে অকম্পিত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের আলোচনা হয়েছে। আমরা স্থির করেছি, দু' এক দিনের মধ্যেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে বিয়েটা পাকা করে ফেলব। নীলাঞ্জনা দেরি করতে চাইছে না।'

সৌম্যেন্দুর মুখে আবার সেই অমায়িক হাসি দেখা দিল। কিন্তু হাসিটা কিছুক্ষণ মুখে লেগে থেকেই মিলিয়ে গেল। পরিবর্তে মুখটা থমথমে হয়ে উঠল। সেই থমথমে ভাবটা রাগ, দুঃখ বা অভিমান কোনটার প্রকাশ ইন্দ্রনীল তা' বুঝতে পারল না।

ইন্দ্রনীল সৌম্যেন্দুর মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল।

সৌম্যেন্দু হঠাৎ মুখ-চোখে অদ্ভুত ভাব প্রকাশ করে বলল, 'তুমি জানো কি কিছুক্ষণ আগে একটা গাড়ি এ্যাকসিডেন্টে নীলা মারা গেছে?'

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। ইন্দ্রনীল আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'না, এ হতে পারে না। অসম্ভব।' মুহূর্তে তার মুখটা যেন রক্ত-শূন্য হয়ে গেল।

ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সৌম্যেন্দুর মুখে অমায়িক হাসি দেখা দিল। সে সেই হাসিটা মুখে ঝুলিয়ে রেখেই বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। ঈশ্বর করুন, এ-রকম ঘটনা যেন না ঘটে।'

ইন্দ্রনীল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল।

সৌম্যেন্দু একই ভঙ্গিতে যোগ করল, 'আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। দেখছিলাম, ব্যাপারটা তোমাকে কত খানি আঘাত করে। তা' ধরো, এ-রকম ঘটনা যদি ঘটেই তাহলে কি করবে? অন্য আর একটি মেয়েকে বিয়ে করবে তো?'

ইন্দ্রনীল ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'এ-কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না করছে। আমি জানি, আমাদের বিয়েতে আপনার আপত্তি আছে।

কিন্তু তাই বলে আমাকে এ-ভাবে কথা বলার আপনার কোনো রাইট নেই।'

সৌম্যেন্দু মুখে এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করল না। শান্ত ভাবে বলল, 'তুমি নিশ্চয় জানো, নীলাকে এতটুকু থেকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছি? নীলা আমার বুকের পাঁজরের মতন। ওর কষ্ট আমি সহ্য করতে পারব না। ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমি ওর বাবা-মার ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখেছি। তাই ওর ব্যাপারে আমি আগে থেকেই সাবধান হতে চাই।'

সৌম্যেন্দুর এই উক্তি ইন্দ্রনীলের ভালো লাগল। যে-মেয়েকে মানুষটি এতটুকু থেকে মানুষ করেছে তার সম্বন্ধে এই ভয় হওয়া যে খুবই স্বাভাবিক সে তা' অনুভব করল। ইন্দ্রনীল ভালো না মন্দ এই মানুষটি তো তা জানে না। ইন্দ্রনীল তাই নরম স্বরে বলল, 'কি রকম প্রমাণ পেলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন?'

সৌম্যেন্দু কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারী করল বার কয়েক। তারপর ইন্দ্রনীলের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার সামনে যদি এমন পরিস্থিতি কখনো উপস্থিত হয় যখন স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজনের মৃত্যুকে বেছে নিতে হবে, তখন নীলার স্বামী হিসেবে তুমি কি করবে? তুমি কার মৃত্যু বেছে নেবে?'

সৌম্যেন্দুর প্রশ্নে ইন্দ্রনীল মনে মনে হাসল। ভাবল, মানুষটি মেয়ের ভালোবাসায় একেবারে অন্ধ হয়ে আছে। নইলে এমন অসম্ভব প্রশ্ন কেউ করতে পারে না। সেই সঙ্গে মনে মনে সে ভাবল, প্রত্যেক প্রেমিকের সামনে এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এটাও ঠিক।

ইন্দ্রনীল আবেগ শূন্য গলায় বলল, 'এ কথা সবাই জানে যে, মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এটাই সংসারের নিয়ম। কিন্তু প্রেম তো সংসারের নিয়ম মানে না। প্রেমিকের কাছে প্রেমের মূল্য অনেক বেশি। নিজের জীবনের চেয়েও।'

ইন্দ্রনীলের কথায় সৌম্যেন্দু যেন আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

উত্তেজিত ভাবেই বলল, 'ওসব হেঁয়ালি ছাড়। তুমি নিজে এর প্রমাণ দিতে পার? লিখে দিতে পার যে, নীলার মৃত্যুর চেয়ে তোমার মৃত্যুই শ্রেয়?'

ইন্দ্রনীল বিস্মিত ভাবে বলল, 'আপনি একি কথা বলছেন?'

ইন্দ্রনীলের মুখ হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কতকটা ক্লান্ত স্বরে বলল, 'জানি তুমি পারবে না। এত ভালোবাসা তোমার নেই।'

ইন্দ্রনীল কি একটু ভেবে কতকটা বিরক্তির সঙ্গেই পকেট থেকে পেনটা বের করল। টেবিল থেকে রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে একটা সাদা কাগজে দ্রুত হাতে লিখল, 'নীলাঞ্জনার মৃত্যুর চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।'

লিখে সৌম্যেন্দুর দিকে কাগজটা ঠেলে দিয়ে বলল 'এই নিন লিখে দিয়েছি। আপনি আমাকে এত ছোট ভাবছেন?'

সৌম্যেন্দুর মুখে কিন্তু হতাশার ছায়া রয়েই গেল। সে বলল, 'আরো লেখো ইন্দ্রনীল। বার বার লেখো। বার বার লিখে যদি ক্লান্ত বোধ না করো তাহলে বুঝব, সত্যিই তুমি ওকে ভালোবাসো।'

সৌম্যেন্দুর কথা শুনে ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে ভাবল, মানুষটা কি পাগল? এই ভাবনা তার মাথায় এলেও সৌম্যেন্দুর কথাটা সে অমান্য করতে পারল না। সে কাগজটা টেনে নিয়ে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে একই কথা আরো অনেক বার লিখল।

সৌম্যেন্দু এক সময় নিজেই ইন্দ্রনীলের কাগজটা হাতে নিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখে ফুটে উঠল সেই অমায়িক হাসি। কাগজের দিকে চোখ রেখে হাসি মুখেই বলল, 'রেজেষ্ট্রী বিয়ে নয়, ইন্দ্রনীল। আমি তোমাদের ধুমধাম করে বিয়ে দেব। নীলার মা-বাবা বেঁচে থাকলে যেমন করে বিয়ে দিত তেমনি করে। কিন্তু তার আগে আমার ব্যক্তিগত একটা কাজ আছে।' একটু থেমে যোগ করল, 'আমি—কোম্পানির আমার অংশের সবটুকু তোমার নামে লিখে দেব। নীলার অংশ তো আছেই। কোনো ব্যাপারে দেরি করা আমার ধাতে সয়না। কাজেই

লেখালেখির কাজ আজই সেরে নেব। অবশ্য একটা শর্ত আছে। তোমাদের কিছু কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হবে। তুমি রাজি তো?'

ইন্দ্রনীল অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমাকে এসব লিখে দেবেন কেন? দিতে হয় নীলাঞ্জনাকেই দেবেন। তাছাড়া আমাদের এখনো বিয়েই হয়নি। আগে বিয়ে হোক তারপর এসব নিয়ে ভাবলেই চলবে।'

সৌম্যেন্দুর ভুরু জোড়া সঙ্কুচিত হল। ইন্দ্রনীলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত চাপা স্বরে বলল, 'তোমার নিজের ওপর কনফিডেন্স নেই, ইন্দ্রনীল? আমি তোমাকে সম্পত্তি দান করলেই তুমি কি তা' নিয়ে পালিয়ে যাবে? মনে রেখো এখন থেকে আমি কেবল তোমার বস নয়, গুরুজনও।'

কি উত্তর দেওয়া উচিত ইন্দ্রনীল তা' ভেবে পেল না। কাজেই সে চুপ করে রইল।

সৌম্যেন্দু নিজেই আবার বলল, 'তুমি এখানেই কিছু খেয়ে-টেয়ে নাও। আমি কাউকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি পুজোয় বসব। যতক্ষণ আমি পুজো করব, ততক্ষণ বিশ্রাম করো। বই-টইও পড়তে পারো। যদি চাও ভূতের বই-ও দিতে পারি। আমার অনেক ভূতের বই আছে। যারা প্ল্যানচেট করে তাদের তো ভূতের বই ভালো লাগার কথা। আমি অনেক ভূতের বই পড়েছি। বলতে গেলে রোজই পড়ি।'

একটু থেমে, সামান্য কি ভেবে, বলল, 'রাত দশটা নাগাদ আমরা ওয়াচ-টাওয়ারে যাব। তুমি আর আমি।'

'ওয়াচ-টাওয়ার? এত রাতে?' ইন্দ্রনীল অবাক না হয়ে পারল না।

সৌম্যেন্দু অমায়িক হেসে বলল, 'আসলে বেশি রাতে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। চারদিক নিঝুম হয়ে গেলে আমি কাজে উৎসাহ পাই। বেশি রাতে কাজ করি বলে কেউ কেউ আমাকে

নিশাচর বলে।' একটু থেমে যোগ করল, 'ওয়াচ-টাওয়ারে কিসের কাজ সে-কথা পরে বলব। ওখানে গিয়েই। তুমি তো এখন নিজের লোক, তোমাকে সব কথা বলা যায়, যে-কথা অন্য কাউকে বলা যায় না সেই কথাও।'

তারপর সামান্য বিদ্রুপের হাসি মুখে নিয়ে বলল, 'অত রাতে ওয়াচ-টাওয়ারে যেতে তোমার আবার ভূতের ভয় করবে নাকি?'

ইন্দ্রনীল লজ্জা পেল। উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসল কেবল।

রাত দশটা নাগাদ ইন্দ্রনীল এবং সৌম্যেন্দু ওয়াচ-টাওয়ারের দরজায় এসে দাঁড়াল। দরজায় তখন তালা ঝুলছে, যেমন প্রত্যেক-দিন ঝোলে। সামনের ঘরটায় মৃদু আলো জ্বলছে। সেই আলোর ক্ষীণ রেখা বাইরে এসে পড়েছে।

সৌম্যেন্দু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জানো বোধহয়, রোজ সকালে ওয়াচ-টাওয়ারের ঘর-দোর ঝাড়-পোছ করা হয় এবং সন্ধ্যের সময় আলো জ্বালা হয়, সারারাত সেই আলো জ্বলে। আসলে জায়গাটা আমার কাছে খুবই পবিত্র। আমি প্রত্যেক দিন বিকেলে এখানে একবার আসি। আমাকে আসতেই হয়, কোনো কাজ না থাকলেও। আজো এসেছিলাম।'

কথা বলতে বলতে পকেট থেকে চাবি বের করে ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে সৌম্যেন্দু বলল, 'এটা নাও, তালাটা এবার খোলো।'

ইন্দ্রনীল চাবিটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে আদেশ পালন করল। দরজা খুলতেই সৌম্যেন্দু মৃদু স্বরে বলল, 'চাবিটা তোমার পকেটেই রেখে দাও। এখন থেকে ওটা তোমার কাছেই থাকবে।'

ইন্দ্রনীল কিছু না ভেবেই চাবিটা পকেটে রেখে দিল।

দুজনে সামনের ঘরটায় পা রাখল। প্রথমে সৌম্যেন্দু, পেছনে ইন্দ্রনীল।

দুটো ঘরের মাঝে যে দরজা আছে, তাতে একটা সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে। পর্দার পেছনে ও-ঘরের মধ্যে কি আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রথমত, পর্দা, দ্বিতীয়ত, ঘরটা অন্ধকার।

সামনের ঘরে একটা বড়-সড় সুদৃশ্য টেবিলের ওপর সুন্দর শেড-দেওয়া একটা টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলের পাশে সুদৃশ্য তিন-খানা চেয়ার। টেবিলের ওপর কিছু বই-খাতা-কাগজ, পেন-স্ট্যাণ্ড, পেপার-ওয়েট। ল্যাম্পটা টেবিলের ওপর এমন ভাবে রাখা যেন এই মাত্র কেউ লেখা-পড়া করছিল। অদূরে একটি ফ্লাওয়ার-ভাস। তাতে তাজা ফুল।

ল্যাম্পের মৃদু আলোয় ইন্দ্রনীল ঘরের চারদিক ভালো করে দেখল। ঘরের এক দিককার দেওয়ালে একটা বড় আকারের ফটো টাঙানো। তাতে সুমিত্রা দেবী, অরুণাভ এবং সৌম্যেন্দুর ছবি। অরুণাভর ছবি এর আগেও ইন্দ্রনীল ওদের অফিসে টাঙানো দেখেছে।

এই ঘরের সব ক'টি জানালাই বন্ধ। পাশের ঘরের জানালা খোলা কি বন্ধ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

সৌম্যেন্দু ঘরে ঢুকে একটা জানালার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এই জানালাটা খুলে দাও।'

জানালাটা খুলতেই ইন্দ্রনীলের চোখের সামনে মিত্র-ভিলা ভেসে উঠল। আকাশে তখন শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ। তার আবছা আলোয় মিত্র-ভিলাকে মনে হল, কল্প-জগতের কোনো রহস্যময় পুরী। সেই মুহূর্তে অন্ততঃ ইন্দ্রনীলের তা-ই মনে হল। জানালা খুলে সে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল মিত্র-ভিলার দিকে।

মিত্র-ভিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইন্দ্রনীলের মাথার মধ্যে কয়েকটা ভাবনার স্রোত প্রায় বইতে লাগল। সেই সঙ্গে পর-পর কতগুলো ছবিও ভেসে উঠতে লাগল। বেকারত্বের যন্ত্রণা, তারপর হঠাৎ অধ্যাপক নন্দীর আগমন এবং হ্যামলেট নাটকের প্রস্তাব। নাটকের পর নীলাঞ্জনার সঙ্গে পরিচয় এবং বন্ধুত্ব। চায়ের দোকানের সেই বিচিত্র মানুষটির চাকরির প্রস্তাব, যার পরিণতিতে নীলাঞ্জনার কোম্পানিতেই তার নিয়োগ। সর্বোপরি এক মধুর পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রগতি। পর পর এতগুলো ঘটনা এই মুহূর্তে

তার কাছে কেমন অস্বাভাবিক ও অবাস্তব বলে মনে হতে লাগল।
যেন তার সামনে কোনো ইচ্ছা পূরণের নাটক অভিনীত হচ্ছে।
যেন কোনো নাট্যকারের সাজানো, মন-গড়া ঘটনা সব। বাস্তবের মাটিতে যার কোনো শিকড় নেই।

তাছাড়া সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের মতো বিদঘুটে স্বভাবের মানুষের হঠাৎ এমন উদার হওয়ার ব্যাপারটাও তার কাছে খুবই অবাস্তব এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হতে লাগল। এই মানুষটার এই মধুর সহৃদয় আচরণ তার কাছে খুবই বিসদৃশ মনে হল। যেন সে কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছিল না।

ইন্দ্রনীলের কেবলই মনে হতে লাগল, তার জীবন যেন অর্দ্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা পাওয়ার কাহিনীতে রূপ পেতে চলেছে। রাজকন্যা এবং অর্দ্ধেক রাজত্ব পাওয়াই বা কেন, যেন তার চেয়েও বেশি। যেন পুরো রাজত্ব এবং রাজকন্যা পাওয়ার কাহিনী।

জানালায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনীল যেন কল্প-জগতে বিরাজ করতে লাগল।

সৌম্যেন্দুও মিত্র-ভিলার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় কেমন গাঢ় এবং রহস্যময় স্বরে বলল, 'মিত্র ভিলার ছাদের ওপরে কিছু দেখতে পাচ্ছ, ইন্দ্রনীল?'

সৌম্যেন্দুর কথায় ইন্দ্রনীলের স্বপ্ন ভাঙল যেন। স্বপ্ন ভাঙার পর মানুষ যেমন করে তাকায় ইন্দ্রনীল ঠিক তেমনি করে তাকাল সৌম্যেন্দুর দিকে। যেন আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মিত্র-ভিলার দিকে তাকিয়ে সৌম্যেন্দু একই রকম রহস্যময় গলায় বলতে থাকল, 'ভালো করে লক্ষ্য করে ছাখো ইন্দ্রনীল। ছাখো কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা।'

ইন্দ্রনীল ততক্ষণে সহজ হয়ে গেছে। সে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আজ্ঞে না, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

সৌম্যেন্দু এবার কতকটা ফিস ফিস করে বলল, 'ভালো করে লক্ষ্য করো। দেখতে পাচ্ছ না, দুটো ছায়া-মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওই ছ্যাখো।'

ইন্দ্রনীলের ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হাসি দেখা দিল। সে হাসি মুখেই বলল, 'এটা ইলিউসন। চাঁদের আলোয় এ-রকম ভুল হয়।'

সৌম্যেন্দু চাপা ধমক দিল, 'ইলিউসন! ভুল! চুপ করো তো হে।'

সৌম্যেন্দুর ধমকে ইন্দ্রনীল কেমন অস্বস্তি বোধ করল।

সৌম্যেন্দু বলতে লাগল, 'প্রত্যেক রাত্রে ওই দুটো ছায়া-মূর্তি এমনি করে ঘুরে বেড়ায় তা' জানো? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। ওরা একবার ওয়াচ-টাওয়ারে আসে আবার মিত্র ভিলায় যায়। প্রত্যেক রাতে। অন্ধকার রাতেও, চাঁদনী রাতেও। ওরা আমাকে ছ্যাখে, আমিও ওদের দেখি। এর মধ্যে ভুলের কোনো অবকাশ নেই। তুমি যতখানি সত্য, ওরাও ততখানি।'

ইন্দ্রনীল মনে মনে বলল, লোকটা দেখছি, সত্যি সত্যি উন্মাদ।

ইন্দ্রনীল এবার ঘুরে দাঁড়াল সৌম্যেন্দুর দিকে। সে লক্ষ্য করল সৌম্যেন্দুর মুখে সেই অমায়িক হাসিটা আবার ফুটে উঠেছে। সে মৃদু স্বরে বলল, 'ওরা কারা জানো? ওরা স্নমিত্রা এবং অরুণাভর প্রেতাত্মা। নিদারুণ যন্ত্রণায় ওরা কেবলই ছটফট করে বেড়াচ্ছে। আমি অনুভব করতে পারি ওদের কষ্ট, ওদের দুর্বিসহ যন্ত্রণা।'

'কষ্ট', 'যন্ত্রণা' শব্দ দুটো এমনভাবে উচ্চারণ করল, যেন এই শব্দ দুটোর মাধ্যমে সে এক রকমের সুখ অনুভব করছে। এক ধরনের অমানবিক তৃপ্তি পাচ্ছে। সেই সুখ সেই তৃপ্তির জন্য তার চোখ-মুখ কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এমন ভাবে যে, মনে হল, স্নমিত্রা-অরুণাভর যন্ত্রণা নিঙড়ে নিজের তৃপ্তির নির্যাস বের করে নিল।

সৌম্যেন্দুর ভাব-ভঙ্গি দেখে ইন্দ্রনীল মনে মনে বলল, হয় লোকটা চিরকালই পাগল, আর না হয় নীলাঞ্জনার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েই সাময়িকভাবে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে মানুষটা পুরোপুরি সুস্থ হতেই পারে না। মনে মনে ভাবল সে।

সৌম্যেন্দু এবার একটা চেয়ারে বসল। টেবল্-ল্যাম্পের আলো

এবার তার মুখের ওপর সোজাসুজি পড়ল। সেই আলোয় তার চোখ-মুখের অবস্থা কেমন অস্বাভাবিক মনে হল।

সৌম্যেন্দু টেবিলের দিকে সামান্য ঝুঁকে বলল, 'সেই রাতেও একটি আত্মা এসেছিল। কোনো অতৃপ্ত আত্মা। তাকে আমি চিনি না। বুঝলে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগে কখনো-কখনো এ রকম আত্মা আসে। দুর্ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে আনে। সেই রাতেও হয়তো সেই ইঙ্গিত বহন করেই সে এসেছিল।'

ইন্দ্রনীলও একটা চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে বলল, 'সেই রাতে মানে?'

'সেই রাত!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সৌম্যেন্দু। তার মুখটা হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক করুণ হয়ে উঠল। যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তাকে ভেতর থেকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সৌম্যেন্দু নিঃশব্দে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তারপর বলল, 'সেই রাতের কথা বলবার জন্যেই তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। তোমাকে সব বলব। চেয়ারটায় বোসো। যা' বলছি মন দিয়ে শোনো।'

ইন্দ্রনীল চেয়ারে বসল।

সৌম্যেন্দু জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। হয়তো ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুছিয়ে নিল। তারপর টেবিল-ল্যাম্পটার আলো আরো কিছুটা স্তিমিত করে দিল। ঘরটা এক-রকম অন্ধকারেই ডুবে গেল।

সৌম্যেন্দু শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ইন্দ্রনীল, এবার তোমাকে যে-কথা বলতে যাচ্ছি তা' এতদিন কাউকে বলিনি। কারণ, তোমাকে ছাড়া আজ অব্দি কাউকে বলার প্রয়োজন হয়নি।'

ইন্দ্রনীল চুপ করে রইল।

সৌম্যেন্দু ধীরে ধীরে বলে গেল, সে এবং অরুণাভ কেমন করে প্রতাপগড়ে এই পাথরের ব্যবসা গড়ে তুলেছে। শুরু থেকে যা' যা' ঘটেছিল তার কোনো কিছুই গোপন করল না। প্রয়াগে সুমিত্রা

এবং সুপ্রিয় বাবুর সঙ্গে পরিচয় থেকে শুরু করে অরুণাভ এবং সুমিত্রার বিয়ে পর্যন্ত কোনো কিছুই বাদ দিল না। সুমিত্রাকে সে যে প্রথম থেকেই মনে মনে চাইত তা-ও অকপটে স্বীকার করল। শিলং-এ সেই ফলস্-এর কাছে কেমন করে তার মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলে উঠেছিল ইন্দ্রনীলের কাছে সে-ব্যাখ্যাও দিল সৌম্যেন্দু।

কথা বলতে বলতে এক সময় অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে সে বলে উঠল, 'আসলে চিরকাল সবাই আমাকে ঠকিয়েছে। সেই ছেলেবেলা থেকেই। কেউ আমাকে আমার পাওনা ঠিক ঠিক মিটিয়ে দেয়নি। ভেবেছিলাম, মিতু শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থাটা বুঝবে। কিন্তু দেখলাম, মিতু, মানে সুমিত্রাও আমাকে ঠকাতেই চায়। সে আমাকে ভালোবাসার লোভ দেখায় কিন্তু ধরা দেয় না। তাই আমি স্থির করলাম, সে যদি সহজভাবে আমাকে ধরা না দেয় তাহলে বাঁকা পথ নিতে হবে। মনে মনে একটা ছক তৈরি করে ফেললাম। সেই ছক অনুসারে আমি দুটো উইল তৈরি করলাম। একটা অরুণাভর জন্য, আর একটা আমার। আমার উইলে লেখা হল আমার অবর্তমানে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে নীলাঞ্জনা। কিন্তু নীলাঞ্জনা যতদিন সাবালিকা না হবে ততদিন তার পিতা অরুণাভ মিত্র সেই সম্পত্তির ট্রাস্টি হয়ে থাকবে।

'আর অরুণাভর উইলে লেখা হল, অরুণাভর মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা বর্তাবে কন্যা নীলাঞ্জনার ওপর। এবং সে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ট্রাস্টি থাকবে সৌম্যেন্দু বিশ্বাস।

'উইল দুটো তৈরি করে আমি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। যাতে সহজেই উইলে দুজনের সই হয়ে যায়।

'একদিন সুযোগ মিলে গেল। সেদিন ফাইল-কাগজপত্র নিয়ে এই ঘরে এই টেবিলে বসে কোম্পানির বিরাট ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা চলছিল। আলোচনা চলছিল কেবল আমাদের দুজনের মধ্যে। কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে করতে স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল অরুণাভ। এই রকম একটা সুযোগই আমি

খুঁজছিলাম। আমার ফাইলে রেডি করাই ছিল উইল দু'খানা। আমি কতকটা যেন অন্যমনস্কের মতোই উইল দু'খানা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলাম। আমি ক্যাজুয়ালি উইল দু'খানার বক্তব্য বলতে বলতে আমার খানায়।আমি সই করলাম। তারপর অন্যটা এগিয়ে দিলাম অরুণাভর দিকে।

'অরুণাভর ছিল আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস। সে এতটুকু সন্দেহ করল না, কোনো রকম প্রশ্নও তুলল না। এর পেছনে যে কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে এতটুকু তলিয়ে দেখল না সে। নির্দ্বিধায় দলিলটায় সই করে দিল।

'এর পর আমার লক্ষ্য রইল, অরুণাভকে কত বেশি কাজের মধ্যে আটকে রাখা যায়। উদ্দেশ্য, অরুণাভর সঙ্গে সুমিত্রার দূরত্ব তৈরি করা, এবং ওদের দুজনের মধ্যে অশান্তির ঝড তোলা। অরুণাভকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমিও খাটতে লাগলাম খুব। ধীরে ধীরে কোম্পানির কাজ অরুণাভর কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গেল। কাজের ব্যাপারে তার কাছে দিন-রাতের ফারাক রইল না। একটু একটু করে সুমিত্রা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিল, সেই সঙ্গে একটা দুরন্ত ক্রোধ জমা হচ্ছিল তার বুকের মধ্যে। এক রাতে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। একেবারে ফেটে পড়ল। স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া একেবারে চরমে উঠল। অরুণাভ রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দূরে নিরালায় একটা পাথরের ওপর বসে রইল। আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম ওর ওপর। সান্ত্বনা দেবার ছল করে নিয়ে এলাম এই ঘরে। সুমিত্রা অথবা বাড়ির অন্য কেউ টের পেল না যে, আমরা এখানে এসেছি। আসলে কেউ জানলই না যে, আমরা একই সঙ্গে ছিলাম।

'বুঝতেই পারছ, অরুণাভ সেদিন খুবই উত্তেজিত ছিল, ফলে অন্যমনস্কও খুব। এদিকে ভেতরে ভেতরে আমিও যথেষ্ট উত্তেজিত। কারণ, তখন শিকার আমার হাতের মুঠোয়। উত্তেজনা এবং অন্য-মনস্কতার জন্য অরুণাভর কিন্তু অন্য কোনো দিকে লক্ষ্যই ছিল না।

'আমি একটা ছোট কাঠের মুগুর সংগ্রহ করলাম। আসলে প্রয়োজন হতে পারে ভেবে ওটা আমি সংগ্রহ করেই রেখেছিলাম। ওই কাঠের মুগুরটার ওপর আমি একটা ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে নিলাম। আসবাবপত্র পোছার জন্য যে ছেঁড়া কাপড় থাকে তাই আর কি। অরুণাভ কিন্তু কোনো কিছুই লক্ষ্য করল না। সে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। আমি সুযোগ মতো পেছন থেকে ওই মুগুর দিয়ে সজোরে অরুণাভর মাথার পেছনে আঘাত করলাম। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। মাথায় এতটুকু রক্ত বেরোল না। মাথার কোথায় আঘাত করলে মানুষ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে এটা আমার অজানা নয়।

'অরুণাভর জ্ঞানশূন্য দেহটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম নিচে। পাথরের ওপর মাথাটা পড়ে থেঁৎলে গেল।'

ইন্দ্রনীল শিউরে উঠল। মুহূর্তে সঞ্জয় বোসের প্রথম রাতের কথাগুলো তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। সৌম্যেন্দুর এই সহজ স্বীকারোক্তিতে সে এতই অবাক হল যে, তার মুখে কিছুক্ষণ কোনো কথাই সরল না।

সৌম্যেন্দু বলতে লাগল, 'আমাকে অবিশ্যি সতর্ক হয়েই কাজ করতে হয়েছিল। যেমন, অরুণাভর চটি খুলে আমি পায়ে পরেছিলাম। সেই চটি পায়ে দিয়েই ওকে কাঁধে নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যেন অরুণাভ জানালা দিয়ে ঝাঁপ দেবার আগে ওই জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'ওকে ফেলে দেবার পর চটি জোড়াও ফেলে দিয়েছিলাম নিচে। আর কাপড়টা খুলে নিয়ে মুগুরটা ফেলে দিয়েছিলাম একটা জঙ্গলের মধ্যে।

'দেখতেই পাচ্ছ এই অঞ্চলটা কেমন নিরালা! কুড়ি বছর আগে এদিকটা আরো নিরালা ছিল। লোকজন ছিল না বললেই হয়। তাছাড়া অত রাতে চারদিক একেবারে নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কেউ কিছুই টের পেল না।

'পুলিশ ভালো করে তদন্ত করলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য দিকে মোড় নিত। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তা তারা করেনি।

'যাক সে-কথা। নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে অস্থির ছিলাম খুবই। তখন রাত প্রায় তিনটে। আমার দরজায় টোকা পড়ল। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল কিনা ভেবে চমকে উঠলাম। কিন্তু না, দরজায় সুমিত্রা এবং একটি কাজের লোক। অরুণাভ ফিরে না আসায় চিন্তিত। আমিও চিন্তার ভান করলাম। বাড়ির বাইরে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজির ভানও করলাম। পরে বললাম, কোথাও হয়তো রাগ করে বসে আছে, রাগ পড়ে গেলেই ফিরে আসবে।

'পরদিন সকালে পাওয়া গেল অরুণাভর থেৎলে-যাওয়া দেহটা। সবার সঙ্গে আমিও কাঁদলাম। আমি সত্যি সত্যিই কেঁদেছিলাম। কারণ, ওকে আমি মারতে চাইনি। সুমিত্রাকে বিয়ে করার জন্যেই ওকে মরতে হয়েছিল। অরুণাভ আমাকে অসম্ভব ভালোবাসত। একেবারে ভাই-এর মতো। ওর লেখা-ডায়েরিতেই তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। ওর ডায়েরিটাই আমাকে সন্দেহ করতে দেয়নি। তবু-তবু আমি ওকে মেরেছি। খুন করেছি। একি কম যন্ত্রণা!'

সৌম্যেন্দুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে হয়ে উঠল।

সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনীলের মনে হল, একটা বদ্ধ উন্মাদের একজোড়া চোখ। সে মনে মনে ভাবল, এই উন্মাদ লোকটা অবলীলায় একটা খুন করেছে, দ্বিতীয় খুন করাও তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব না। ইন্দ্রনীল মনে মনে একটু যেন ভয়ই পেল। সেই সঙ্গে ভাবল, এ-রকম একজন বিপজ্জনক লোককে জেলের বাইরে রাখা একেবারেই উচিত না। কিন্তু কি ভাবে তাকে পুলিশে দেওয়া যেতে পারে? তার সামনে কনফেসন করাটাই তো সব না। প্রমাণ? সে প্রমাণ পাবে কোথায়? বিশেষ করে এতদিন পর?

ইন্দ্রনীলের ভাবনায় বাধা পড়ল। সৌম্যেন্দু আবার বলতে লাগল, 'অরুণাভর মৃত্যুর পরেও কিন্তু সুমিত্রা আমার বশে এলো না। সে

আত্মহত্যা করল। ফলে আমার এত সব পরিকল্পনা বিফলে গেল। আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। সুমিত্রার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে মরীয়া। কিন্তু তাকে তো তার শরীরী অস্তিত্বে আর পাব না। কাজেই তখন সুমিত্রার ওপর প্রতিশোধ নেবার একটা পথই খোলা রইল। তা' হল নীলাঞ্জনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া। না, চমকে উঠো না। ছোট নীলাঞ্জনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবিনি। প্রতিশোধ নিতে চেয়েছি যুবতী নীলাঞ্জনার বিরুদ্ধে। কি ভাবে জানো ?

ইন্দ্রনীলের কথার উত্তরের প্রয়োজন বোধ করল না সৌম্যেন্দু। সে নিজেই আবার বলল, 'ভেবেছিলাম, ওর কোনো দিন বিয়ে দেব না। ওর মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলবে, কিন্তু তাকে প্রশমিত করার কোনো সুযোগ পাবে না। যেমন সুমিত্রাকে দেখে আমার মনের মধ্যে কামনার আগুন জ্বলেছিল, অথচ তাকে পাইনি বলে চিরদিন জ্বলে পুড়ে মরেছি। আমি নীলাঞ্জনার চারপাশে পাহারা বসিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে কোনো ছেলের সঙ্গে গভীরভাবে সে মিশতে না পারে। কেবল তুমিই ব্যতিক্রম। তুমি কেমন করে যেন আমার পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়েছো। যাকগে সে-কথা।'

একটু থেমে সৌম্যেন্দু বলতে লাগল, 'আমি জানি, এর ফলে নীলাঞ্জনা মনে মনে কষ্ট পেয়েছে, আর ওর কষ্টের জন্য সুমিত্রার আত্মাও কষ্ট পেয়েছে। বুঝলে, আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি, সুমিত্রার আত্মা আমাকে বার বার অনুরোধ করে বলছে, 'আমার মেয়েকে মুক্তি দাও, তাকে ভালোভাবে বাঁচতে দাও। বড় করুণ সেই অনুরোধ ! সুমিত্রার কষ্টে আমি আরাম পাই, আনন্দ পাই। তবে কি জানো, সুমিত্রা যদি রূপ ধরে আসত তাহলে আরো আনন্দ পেতাম। কিন্তু সে কেবল ছায়া-মূর্তি ধরে আসে। আমার গভীর বিশ্বাস, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাকে একদিন মূর্তি ধরে আসতেই হবে। আমি সেই দিনের প্রতীক্ষাতেই আছি !'

সৌম্যেন্দু উত্তেজনায় নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।

আর ঠিক তখনই ছুটে। ঘরের মাঝখানের দরজায় টুক করে একটা শব্দ হল। শব্দটাকে অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সৌম্যেন্দু। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেল। বহু আকাঙ্ক্ষিত কোনো জিনিষ অপ্রত্যাশিতভাবে কারো হাতের মুঠোয় ধরা পড়লে তার মুখ চোখের-চেহারা যেমন হয় তেমনি। ইন্দ্রনীল সৌম্যেন্দুর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল সেই দিকে। তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের রক্ত চলাচল দ্রুত হল। শরীরের মধ্যে একটা শিহরণ দেখা দিল।

ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে দেখল, পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শুভ্র মসৃণ শাড়ি-পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী এক নারী। অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার মুখের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে। এমনিতেই ঘরে মৃদু আলো, তার ওপর অবগুণ্ঠনের আড়াল। কাজেই ঠিক অনুমান করা গেল না, সেই নারীর বয়েস কত। ইন্দ্রনীল কিন্তু সেই নারীর বয়েস নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। সে ভেবেই পেল না, হঠাৎ এই নারী এখানে এল কি করে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে দ্রুত যুক্তির সূত্রগুলো সাজাতেও পারল না। এই ব্যাপারটা তার কাছে কতকটা অলৌকিক বলেই মনে হল।

ততক্ষণে সৌম্যেন্দু উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে সেই অবগুণ্ঠনবতীর দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রনীলকে উদ্দেশ্য করে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, 'দেখেছো ইন্দ্রনীল সে এসেছে। আমি জানতাম, মানুষের রূপ ধরে তাকে একদিন আসতেই হবে। সেই দিনটা যে আজই তা ও আমার মনে হয়েছিল। কারণ, আজ তোমাকে কেন এখানে এনেছি তুমি না জানলেও সে জানে। ওরা মানুষের মনের খবর টের পায় যে।'

অবগুণ্ঠনবতী মৃদু অনুনাসিক স্বরে বলল, 'একটু আগে যে-মিথ্যে কথাটা বললে আমি তারই প্রতিবাদ করতে এসেছি। আমি আত্মহত্যা করিনি, তুমিই আমাকে হত্যা করেছো সন্ন্যাসী-ঠাকুরপো।'

অবগুণ্ঠনবতীর কথায় কতকটা আচ্ছন্নের মতো চেয়ারে বসে পড়ল

সৌম্যেন্দু। কয়েক সেকেণ্ড তার মুখে কোনো কথাই সরল না।

পরিবেশটা হঠাৎ এমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল যে, ইন্দ্রনীল কিছুই ভাবতে পারছিল না। সে হতবাক হয়ে দুজনকে লক্ষ্য করছিল কেবল।

সৌম্যেন্দু কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে কতকটা ঘোরলাগা মানুষের মতো বলতে লাগল, 'না, মিতু-বৌঠান, আমি তোমাকে মারতে চাইনি। সেই রাতে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম, তোমাকে প্রাণ ভরে আদর করব বলে। কিন্তু তুমি আমাকে প্রাণপণে বাধা দিলে। ফলে আমাকে জবরদস্তি করতে হল। ধস্তাধস্তির সময় কোন অসতর্ক মুহূর্তে আমার কনুই-এর চাপ পড়ে গেল তোমার কণ্ঠ-নালীতে। আর তার ফলেই আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে তোমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। এর পর তোমার প্রাণহীন দেহটাকে সিলিং-এ ঝুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আমি কি করতে পারতাম? বলো কি করতে পারতাম?'

উত্তেজনায় হাঁফাতে লাগল সৌম্যেন্দু। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ বুজে রইল। যেন ভয়ে-লজ্জায় নিজেকে নিজের কাছ থেকে আড়াল করতে চাইল।

কিছুক্ষণ পর সৌম্যেন্দু চোখ বুজেই বলল, 'তোমাকে আমি মারতে চাইনি মিতু; তোমাকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি নিজেও বাঁচলে না, আমাকেও বাঁচতে দিলে না।' উত্তেজনায় সৌম্যেন্দুর সারা শরীর দিয়ে দর দর করে ঘাম পড়তে লাগল।

এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ইন্দ্রনীলের হঠাৎ মনে হল, যে-লোকটি দু-দুটো মানুষকে খুন করার পরও এতদিন এমনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে, সে কখনোই তাকে এত রাতে এই নির্জন জায়গায় বিষয়-সম্পত্তি দান করার জন্যে টেনে আনেনি। তার উদ্দেশ্য কখনোই সৎ হতে পারে না। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি কাজ করছে।

ইন্দ্রনীল প্রায় নিঃসন্দেহ হল যে, তাকে এখানে ডেকে আনা

হয়েছে খুন করার উদ্দেশ্যেই। যাতে ভবিষ্যতে নীলাঞ্জনা আর বিয়ের প্রশ্ন না তুলতে পারে। এমন অভিজ্ঞ খুনী তৃতায় খুনটি করার পরও নিশ্চয় আগের মতোই সাক্ষী-প্রমাণ লোপাট করবে। ইন্দ্রনীলের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এই আধা-পাগল এবং অভিজ্ঞ খুনীর পকেটে নিঃসন্দেহে একটি গুলি-ভর্তি পিস্তল আছে। কাজেই সৌম্যেন্দুর বিরুদ্ধাচরণ করা মানেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা।.

ইন্দ্রনীল ভাবতে লাগল, দীর্ঘদিন কোনো গোপন জিনিসের ভার বহন করতে করতে মানুষ অনেক সময় হাঁপিয়ে ওঠে। তখন সে চায়, সেই গোপন জিনিষ প্রকাশ করে হাল্কা হতে। সৌম্যেন্দুও নিশ্চয় হাল্কা হবার জন্যেই তার কাছে সবকিছু প্রকাশ করেছে। কিন্তু এত গোপন কথা জানার পর, সৌম্যেন্দুর হিসেবে, ইন্দ্রনীলের বাঁচার অধিকার নিশ্চয়ই থাকবে না। অর্থাৎ মৃত্যু, অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েই ইন্দ্রনীলের কাছে সবকিছু প্রকাশ করেছে সৌম্যেন্দু।

ইন্দ্রনীল হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠল। ভুলে গেল, সেই অবগুণ্ঠিতা নারীর অস্তিত্ব। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে ভাবা যায় না। বন্ধু, বন্ধুপত্নীকে খুন করে ভালো মানুষটি সেজে বসে আছেন?'

সৌম্যেন্দু স্থির চোখে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তার চোয়াল দুটো একটু শক্ত হল। পরক্ষণেই মুখে সেই অমায়িক হাসি প্রকাশ পেল। সে শান্তকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমি অরুনাভ এবং সুমিত্রাকে নিজের হাতে খুন করেছি। এবং এখানেই সব শেষ হয়নি।'

ইন্দ্রনীল চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ইউ স্মাইলিং ভিলেন!'

ইন্দ্রনীলের কথা শেষ হতে না হতেই অবগুণ্ঠিতা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'ওয়ান মে স্মাইল, এ্যাণ্ড স্মাইল, বি এ ভিলেন!'

ইন্দ্রনীল চমকে উঠল। এ-যে হ্যামলেট নাটকের সেই উক্তি! সে মনে মনে বলল, তার মানে এই অবগুণ্ঠিতা নারী। সুমিত্রার আত্মার

ক্ষণিক রূপ নয়। কোনো অলৌকিতার অবকাশ এখানে নেই। এটা একেবারে নিছক বাস্তব। নিঃসন্দেহে অবগুণ্ঠনের আড়ালে নীলাঞ্জনা। অনুনাসিক স্বর তার অভিনয়ের অঙ্গ। এই অভিনয়ের কথাই সে তাহলে আজ বিকেলে বলেছিল। হয়তো সৌম্যেন্দুর অভিপ্রায়টা আগেই সে অনুমান করেছিল। আর সেই জন্যেই এতক্ষণ লুকিয়েছিল পাশের ঘরে।

ইন্দ্রনীল এবার নীলাঞ্জনার নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সত্যিই সে জীবনকে বাজী রেখেই এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে পেরেছে। কারণ, সৌম্যেন্দু কেবল খুনিই না, এক ধরনের উন্মাদও।

এদিকে সুমিত্রার ছায়া-মূর্তির কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শুনেই দাঁড়িয়ে পড়ল সৌম্যেন্দু। পকেটেও হাত ঢুকিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে। নিঃসন্দেহে লোডেড রিভলবারের উদ্দেশ্যেই। এবং অবগুণ্ঠিতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে তুমি ;'

ইন্দ্রনীল মনে মনে বলল, নীলাঞ্জনাকে বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে সৌম্যেন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সে যখন মনে মনে এই রকম একটা সঙ্কল্প নিয়েছে তখনই অবাক হয়ে দেখল, দুজন সুবেশ সুদর্শন ভদ্রলোক পর্দা ঠেলে দ্রুত পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের একজনকে ইন্দ্রনীল ভালো করেই চেনে। সে কণ্ট্রাক্টর সঞ্জয় বোস। অপরজনকে সে অবিশ্যি চিনতে পারল না। সেই অচেনা লোকটির হাতে উদ্যত রিভলবার।

ইন্দ্রনীল বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল. অচেনা লোকটির চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে একবার তাকালেই যে-কোনো লোক সামান্য সময়ের জন্য সম্মোহিত হয়ে যেতে পারে। ইন্দ্রনীলও যেন সম্মোহিত হল। সৌম্যেন্দুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ভুলে গেল। হয়তো সম্মোহিত হয়েছিল সৌম্যেন্দুও। হয়তো তাই কিছুক্ষণের জন্যে পকেট থেকে রিভলবার বের করে আনতে ভুলে গিয়েছিল।

অচেনা লোকটি চাপা গলায় বলল, 'আপনার পকেটে লোডেড রিভলবার আছে আমি জানি। কিন্তু ওটা বের করতে চেষ্টা করবেন না। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।'

সৌম্যেন্দু সত্যিই ভয় পেল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু অচেনা লোকটির আদেশ অমান্যও করতে পারল না সে। নিঃশব্দে পকেট থেকে হাত বের করে আনল। কতকটা সম্মোহিতের মতই।

অতি দ্রুত ঘটনার পট পরিবর্তন হওয়ায় ইন্দ্রনীল ভেবে পেল না, এখন তার কি করা উচিত। সেও কতকটা সম্মোহিত ভাবেই অচেনা লোকটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। সৌম্যেন্দুও যেন এই পট-পরিবর্তনকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মেনে নিতে পারছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই অলৌকিক, অবাস্তব এবং স্বপ্নময়। সে সেই অচেনা লোকটির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'অরু, তুই প্রতিশোধ নিতে চাইছিস? কিন্তু আমি তোকে প্রতিশোধ নিতে দেব না।'

কেউ কিছু বুঝবার আগেই সৌম্যেন্দু সবেগে জানালার দিকে এগিয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে বলতে লাগল, 'সুমি আমার! আমি সুমির কাছে যাব।'

সৌম্যেন্দু তখন সত্যি সত্যি উন্মাদ। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।

ইন্দ্রনীল সৌম্যেন্দুকে ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু সক্ষম হল না। জলে ড্রাইভ দেবার মতন জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে নিচে ভারি কিছু পতনের শব্দ ভেসে এল।

অচেনা লোকটি রিভলবারটি পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'এ-রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আই শুড হ্যাভ বিন এ্যালার্ট।'

কথা কটা অবিশ্যি সে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না। বরং কতকটা স্বগতোক্তির মতোই শোনাল।

ততক্ষণে অবগুণ্ঠিতার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত। এতক্ষণ যা ছিল কেবল আভাসিত, এখন তা-ই ব্যক্ত হল। নীলাঞ্জনা সশরীরে

প্রকাশিত হয়ে পড়ল। সে ইন্দ্রনীলের কাছে সরে এসে বলল, 'তুমি হয়তো এতক্ষণে অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছো। এরপর পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারবে। কিন্তু সে-সব বোঝাবুঝির আগে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।'

সেই অচেনা মানুষটি, যাকে পট-পরিবর্তনের নায়ক বলেই ইন্দ্রনীলের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, নীলাঞ্জনা তার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'এঁর নাম প্রফেসর নন্দীর মুখে আগেই শুনেছো। ইনিই গবেষক সত্যসিন্ধু মুন্সী।'

নীলাঞ্জনা পরক্ষণেই সঞ্জয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এর পরিচয়ও তুমি আগেই পেয়েছো। তবে সেই পরিচয়টা আংশিক। ওঁর আর একটা পরিচয় হল উনি আমার মামা। যিনি এতদিন বিলেতে ছিলেন।'

ইন্দ্রনীল বিস্ময়ের চোখ নিয়ে সঞ্জয়ের দিকে তাকাল। সঞ্জয় মৃদু হাসল কেবল। কোনো কথা বলল না।

ততক্ষণে সত্যসিন্ধু দ্রুত হাতে ঘরের ভেতর থেকে কয়েকটা জিনিষ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। যেমন কিছুটা জড়ানো তার, দুটো মাউথ-পিস এবং দুটো টেপ-রেকর্ডার। সবকিছুই চোখের আড়ালে ছিল এতক্ষণ। পর্দার পেছনে, টেবিলের নিচে, ফ্লাওয়ার ভাসের আড়ালে এবং একটা ছোট বুক কেসের পাশে।

সত্যসিন্ধু একটা ব্যাগে জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের কনফেসনটুকুই আমার প্রয়োজন ছিল। সেই জন্যেই এই স্কিম। কিন্তু মানুষটা যে একসেনট্রিক, বলতে গেলে ছেলেবেলা থেকেই একটু পাগলাটে, সেই ব্যাপারটাকে আরো একটু গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। হিয়ারস দ্য ল্যাপ্‌স অব দ্য হোল স্কিম।' একটু থেমে যোগ করল, 'পুলিশকে খবর দেওয়া আছে, তারা হয়তো নিচে অপেক্ষা করছে। এবার আমাদের নিচে যাওয়া প্রয়োজন।'

ওরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গল্পটা হয়তো এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু হল না। কারণ, ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা কেবল বাজীকরের পুতুল হয়েই থাকতে চাইল না। তারা চাইল, রক্ত-মাংসের দেহের পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে। গল্পটা তাই শেষ হয়েও হল না।

## ॥ ষোল ॥

দুদিন পর।

প্রতাপগড়ের চারদিকে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। মিত্র-ভিলার দোতলার ঘরে অনেকেই উপস্থিত। একটা বড় টেবিলের চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে সবাই। সবাই বলতে গবেষক সত্যসিন্ধু মুন্সী, সঞ্জয় বোস, এলাহাবাদের ডাঃ ঠাকুর, স্থানীয় পুলিশ অফিসার, যিনি ডি এস পি র‍্যাঙ্কের এবং নীলাঞ্জনা ও ইন্দ্রনীল।

ঘরটা সুমিত্রা-অরুণাভর সময় থেকে খুব একটা বদলায়নি। জিনিসপত্র প্রায় একই রকম আছে, প্রায় একই রকম জায়গায় সাজানো। পরিবর্তনের মধ্যে একটাই। দেওয়ালের গায়ে দুটো বিশাল আকারের ফটো পাশাপাশি টাঙানো হয়েছে। একটা সুমিত্রার এবং আর একটা অরুণাভর। বড় জীবন্ত ফটো দুটো। স্বয়ং সৌম্যেন্দু এই ফটো দুটো টাঙাবার ব্যবস্থা করেছিল। অরুণাভ এবং সুমিত্রার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যেই।

টেবিলের চার পাশে উপবিষ্ট প্রায় সকলের দৃষ্টিই নিবদ্ধ এই ফটো দুটোর ওপর। সকলের কান অবিশ্যি টেবিলের ওপর রাখা টেপ-রেকর্ডারের দিকে। সবাই উন্মুখ হয়ে শুনছে টেপ-রেকর্ডারে ধরা কথাগুলো।

টেপে একসময় ইন্দ্রনীলের অশান্ত কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, 'মানুষ যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে, ভাবা যায় না। আপনি বন্ধু, বন্ধু-পত্নীকে খুন করে ভালো মানুষটি সেজে বসে আছেন!'

ইন্দ্রনীলের নিজের কথাটা নিজের কানেই কেমন অদ্ভুত শোনাল। তার মনে হল, এটা যেন তার নিজের কথা না। যেন কারো শেখানো বুলি সে বলেছে। একটা বড় শিকার ধরার জন্য শিকারী তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে তার মুখে এই কথা কটা বসিয়ে দিয়েছিল। নিজেকে 'টোপ' হিসেবে ভাবতে গিয়ে অস্বস্তিতে একটা ঢোক গিলল ইন্দ্রনীল।

পরক্ষণেই টেপে সৌম্যেন্দুর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, 'হ্যাঁ, আমি খুন করেছি। অরুণাভ এবং সুমিত্রাকে নিজের হাতে খুন করেছি। এবং এখানেই সব শেষ হয়নি।'

সত্যসিন্ধু টেপটা বন্ধ করে দিল। টেপ বন্ধ করার পরও কারো মুখে কোনো কথা সরল না। ঘরের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। টেপটা থামার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও যেন রুদ্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

সত্যসিন্ধুই ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। টেপের কথার জের টেনে সে বলল, 'উই রিকোয়ারড্ ক্লিয়ার কনফেসন অব সৌম্যেন্দু বিশ্বাস। তার কনফেসন ভিন্ন অন্য কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে ছিল না।' একটু থেমে যোগ করল, 'তবে খুবই দুঃখের বিষয়, তিনি এখন ধরা-ছোঁয়ার ঊর্দ্ধে। তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।'

সত্যসিন্ধু এক এক করে সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর সামান্য সময় চুপ করে বলল, 'আপনাদের সকলের প্রশ্ন, অরুণাভ মিত্র আত্মহত্যা করেননি, তাকে হত্যাই করা হয়েছিল, এই সন্দেহটা আমার মনে কি করে এল। দিস ইনডিড ইজ ভেরি পারটিনাণ্ট কোশ্চেন।'

সত্যসিন্ধু বলে চলল, 'প্রত্যেক হত্যার ক্ষেত্রে যে মোটিভের প্রশ্ন থাকে, এখানে সেই অর্থে সোজাসুজি কোনো মোটিভ দেখতে পাইনি। কারণ, এত বছর পরেও সৌম্যেন্দুর মধ্যে চারিত্রিক কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। তিনি মদ্যপ ছিলেন না। কোনো মেয়ের সংসর্গও করেননি। বরং সব সময় নিজেকে মেয়েদের কাছ থেকে নিজেকে দূরেই সরিয়ে

রাখতেন। ভোগের কোনো ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। কাজেই টাকার ব্যাপারে তাঁর লোভ ছিল, এটা বলা যায় না।

'কেবল তা-ই না। বন্ধুকে যে তিনি ভালোবাসতেন তার প্রমাণও তিনি রেখেছেন। বন্ধুর মেয়েকে তিনি ভালোভাবে মানুষ করেছেন, একেবারে মেয়ের মতো করেই। যেহেতু সুমিত্রাদেবী নিত্যশিল্পকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন, সেইজন্যে তিনি তার মেয়েকেও নৃত্যশিল্পী হিসেবেই গড়ে তুলেছিলেন। এ্যাপারেণ্টলি এগুলো তার চরিত্রের মহৎ দিক।

'অতএব অরুণাভ মিত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পেছনে সৌম্যেন্দু বিশ্বাসের কোনো মোটিভ ছিল, এটা বলা যায় না। পুলিশের রিপোর্টের কপি আমি দেখেছি ডাঃ ঠাকুরের মাধ্যমে। প্রথমে অবিশ্যি সঞ্জয়বাবুর কাছে পুলিশের রিপোর্টের বয়ান শুনেছিলাম। এই রিপোর্টে অরুণাভ মিত্রের শ্বাসনালীতে চাপ পড়ার একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া মিঃ মিত্রের মাথার পেছন দিকে একটা আঘাত লাগার কথাও বলা হয়েছে। যে-আঘাতটা অত উঁচু থেকে পাথরের ওপর পড়ে না লাগারই কথা। তবে দুটো ক্ষেত্রেই জোর দিয়ে কিছু বলা হয়নি। এবং পোষ্ট-মর্টেম রিপোর্টে স্পষ্টই বলা ছিল, অরুণাভ মিত্রের মৃত্যু হয়েছিল পতন-জনিত আঘাতে।

'অরুণাভ মিত্রের মৃত্যুকে হত্যা বলে কেউ সন্দেহ করেনি। পুলিশ না, কোনো সাক্ষী না। এমন কি সুমিত্রাদেবী নিজেও না।

'অন্যদিকে সুমিত্রাদেবীর মৃত্যু? আত্মহত্যা করাই সুমিত্রাদেবীর পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ওই রকম অস্বাভাবিক অবস্থায় যে-কোনো স্ত্রী-ই আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত হতে পারে। যদিও সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, ছোট্ট মেয়ের কচি দুটো হাত তাকে কি বাধা দিতে পারেনি? ওই কচি মেয়েটির আকর্ষণ কি কিছুই ছিল না?'

থামল সত্যসিন্ধু।

নীলাঞ্জনার চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। সে ধীরে ধীরে

চোখের জল মুছে নিল। মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রনীলের চোখ দুটোও কেমন জ্বালা করে উঠল।

সত্যসিন্ধু আবার বলতে লাগল, 'আমার প্রথম সন্দেহ হল, অরুণাভবাবুর ডায়েরির কপি পড়ে। ডায়েরির কপি পেয়েছিলাম সঞ্জয়বাবুর কাছেই। ডায়েরিটা সৌম্যেন্দুবাবু নিজেই পুলিশকে জমা দিয়েছিলেন। তদন্তের সময় ডায়েরিটাকে সঠিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে আমার মনে হয়নি। বরং ডায়েরিটা তদন্তকে ভুল পথেই চালিত করতে সাহায্য করেছিল। সঠিক গুরুত্ব দিলে তদন্ত অন্য দিকে মোড় নিত। ডায়েরি পড়ে পুলিশ নিশ্চিত হয়েছিল যে, সৌম্যেন্দুবাবুর ওপর অরুণাভবাবুর ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং ওঁরা দুজন দুজনকে ভাই-এর মতোই ভালোবাসতেন। ফলে পুলিশের চোখে সৌম্যেন্দুবাবু সন্দেহের অতীত হয়ে গিয়েছিলেন।

'আমার কিন্তু আত্মহত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে ওই ডায়েরি পড়েই। আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক অত্যন্ত সুস্থ চিন্তার মানুষ ছিলেন। যথেষ্ট বাস্তববাদী। আভিজাত্য সম্বন্ধে তাঁর একটা আকর্ষণ ছিল ঠিকই, তবে কোনো মোহান্ধতা ছিল না। বন্ধুর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা থেকেও বোঝা যায়, তিনি কতখানি মহৎ ছিলেন। স্ত্রীর ভালোবাসার ব্যাপারেও তাঁর মনে নিশ্চয় কোনো রকম সন্দেহ ছিল না। থাকলে তা নিশ্চয়ই ডায়েরিতে লিখতেন। এটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে পড়ে।

'স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, এ-রকম একজন সুস্থ চিন্তার মানুষ হঠাৎ আত্মহত্যা করতে যাবেন কেন? বিশেষ করে শিশু-কন্যাটির মায়া উপেক্ষা করে। আমার ধারণা হয়েছিল, এই রকম একজন মানুষ আত্মহত্যা করতেই পারে না। কেউ নিশ্চয়ই তাকে ওপর থেকে ফেলে দিয়েছিল! কিন্তু একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষকে বিনা বাধায় ওপর থেকে কি ফেলে দেওয়া সম্ভব? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে নাড়া দিয়েছিল।

'উত্তর পেয়ে গেলাম পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টের মধ্যেই। মাথার

পেছনে হাল্কা আঘাত এবং শ্বাসনালীতে চাপ লাগার কথা ওখানেই আছে। কাজেই আমার স্থির বিশ্বাস জন্মাল, অতর্কিতে অরুণাভ মিত্রের মাথার পেছনে আঘাত করে অজ্ঞান করা হয়েছিল এবং তারপর সম্ভবত গলাও টিপে ধরা হয়েছিল, কিম্বা অসাবধানে গলায় চাপ লাগে। অজ্ঞান হবার পর টিলার ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল সেই অচেতন মানুষটিকে।

'কিন্তু মোটিভ? না, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তর পাইনি। একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল কেবল। সন্দেহটা সৌম্যেন্দু বিশ্বাসকে ঘিরেই। কারণ, প্রথমত অরুণাভবাবুর উইলের মাধ্যমে সেই লোকটিই সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে। দ্বিতীয়ত উইলে অরুণাভবাবুর তরফ থেকে সুমিত্রাদেবীকে বঞ্চিত করার কোনো কারণই ছিল না। আগেই বলেছি, ডায়েরিটা তাঁর সুস্থ চিন্তার পরিচয়ই বহন করে। সৌম্যেন্দু ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, তবু তাঁর জন্যে স্ত্রীকে পুরোপুরি বঞ্চনা করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র সম্ভাবনা, সৌম্যেন্দুবাবুর তরফ থেকে কোনো রকম প্ররোচনা। এই প্ররোচনা দেবার সুযোগ তাঁর ছিল। তাঁর ওপর অরুণাভবাবুর অগাধ বিশ্বাসই সেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

'কিন্তু সৌম্যেন্দুবাবু এ-রকম উইল করার প্ররোচনা দিয়েছিলেন কেন? সুমিত্রাদেবীর ওপর সৌম্যেন্দুবাবু কি কর্তৃত্ব করতে চেয়েছিলেন? কিম্বা কোনো রকম প্রতিশোধ? এরও উত্তর পেয়েছিলাম। উত্তর পেয়েছিলাম কথাটা হয়তো ঠিক না। বলা উচিত, উত্তরের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম।

'সঞ্জয়বাবুর কাছে যতটুকু শুনেছিলাম, তা থেকে মনে হয়েছিল, সুমিত্রাদেবীর ওপর সৌম্যেন্দুবাবুর যথেষ্ট অভিমান থাকার কথা। অভিমান বললে হয়তো ঠিক বলা হয় না। বলা যেতে পারে ক্রোধ। এবং পাশাপাশি অরুণাভবাবুর সম্বন্ধে ঈর্ষা। ক্রোধ অথবা ঈর্ষা কোনোটাই জমে থাকত না, যদি তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করে সংসারী হতেন। অথবা সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হতেন, যা তিনি হতে

চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকেই যাননি। মাঝ পথে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অবস্থাটা বিশ্লেষণ করে আমার মনে হয়েছিল, সৌম্যেন্দুবাবু সুমিত্রাদেবীকে মানসিক শান্তি দেবার জন্যেই হয়তো এ-রকম একটা উইল তৈরী করেছিলেন। এবং একই উদ্দেশ্যে বন্ধুকে হয়তো হত্যাও করেছেন। সে-ক্ষেত্রে এই লোকটি এক ধরনের মানসিক রুগী।

'সৌম্যেন্দুবাবুর যে মানসিক ভারসাম্যের অভাব ছিল তা অরুণাভ-বাবুর ডায়েরি পড়েই বোঝা যায়। তাছাড়া সঞ্জয়বাবু এবং জানকী-দেবীর আলোচনা থেকেও তা টের পেয়েছি।

'আমার সামনে আর একটা প্রশ্ন এসে হাজির হয়েছিল। তা হল, সৌম্যেন্দুবাবুর কলকাতায় না আসার ব্যাপারটা। নীলাঞ্জনাকে কলকাতায় রেখে পড়ান, নাচ শেখার ব্যবস্থা করেন, নৃত্যাঙ্গনের মতন প্রতিষ্ঠান তৈরীতে সাহায্য করেন, অথচ নিজে কেন আসেন না? যদিও তাঁর ছেলেবেলাটা কলকাতাতেই কেটেছে।

'জানকী মাঈ-এর কাছ থেকে যে-চিঠিটা পেলাম তা থেকে সৌম্যেন্দুবাবুর উদ্দেশ্যটা বুঝতে আমার সুবিধে হল। অর্থাৎ নীলাঞ্জনাকে তিনি হুবহু সুমিত্রাদেবীর মতো তৈরী করতে চান। কিন্তু তাকে বিয়ে দিতে চান না।

'এইবার আমার চোখের সামনে থেকে ধোঁয়াসার জাল যেন সরে যেতে লাগল।'

সত্যসিন্ধু সামান্য চুপ করল।

ইন্দ্রনীল অনেকক্ষণ থেকেই একটা প্রশ্ন করার জন্য উসখুস করছিল। সত্যসিন্ধু চুপ করতেই সে বলল, 'আমাকে কেন টোপ হিসেবে ব্যবহার করলেন সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।' একটু থেমে গলায় বেশ ঝাঁজ এবং তিক্ততা মিশিয়ে বলল, 'আমি তো শিকার ধরবার জন্যে একটা টোপ হিসেবেই ব্যবহার হয়েছি। তার বেশি কিছু নয় নিশ্চয়ই?'

ইন্দ্রনীলের গলার ঝাঁজ এবং তিক্ততা উপস্থিত সবাইকেই স্পর্শ

করল। সকলেই একসঙ্গে তাকাল ইন্দ্রনীলের দিকে।

সত্যসিন্ধু শান্ত চোখে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তারপর স্মিত হেসে বলল, 'তুমি একজন প্রোগ্রেসিভ ইয়ং ম্যান। থিয়েটার-টিয়েটার করো। তোমার ভাবতে ভালো লাগছে না যে, একটা পুরোনো রোগ নিরাময়ে তুমি সহায়ক হলে? তাছাড়া এটাকে একটা এ্যাডভেঞ্চার হিসেবেও তো মনে করতে পারো। নিজেকে টোপ হিসেবে ভাবছো কেন? মোর ওভার, তোমার সঙ্গে কত নতুন লোকের পরিচয় হল। জীবনে এটাও কম বড় লাভ নয়।'

সত্যসিন্ধুর কথা শেষ হতেই ইন্দ্রনীল তাকাল নীলাঞ্জনার দিকে। নীলাঞ্জনাও তখন তার দিকেই তাকিয়েছিল। ইন্দ্রনীলের মনে হল, নীলাঞ্জনা যেন দৃষ্টির মাধ্যমে তাকে কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু কি বলতে চাইছে ইন্দ্রনীল তা ঠিকঠাক বুঝল না। কিছু বুঝতে না পেরে কতকটা অসহায় ভাবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল আবার।

সত্যসিন্ধু এক এক করে সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আবার বলতে লাগল, 'নীলাঞ্জনার মানসিক প্রস্তুতির জন্য হ্যামলেটের ওই সিন সিলেক্ট করেছিলাম। সেই জন্যেই প্রথমে প্রয়োজন হয়েছিল ইন্দ্রনীলের মতো একজন যুবকের, একজন জবরদস্ত অভিনেতার। তাছাড়া সত্য উদ্ঘাটনের জন্য ওদের বন্ধুত্বও প্রয়োজনীয় ছিল।

'তবু কাজের ছকটা তৈরি করার ব্যাপারে একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। সামান্য খটকা ছিল। কিন্তু ডাঃ ঠাকুরের চিঠিতে সৌম্যেন্দুবাবুর প্ল্যানচেটের প্রতি দুর্বলতার কথা জানার পর সেই খটকাও আর রইল না। কারণ প্ল্যানচেটে বিশ্বাস মানেই মানুষের অশরীরী অস্তিত্বে বিশ্বাস। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও অরুণাভবাবু এবং সুমিত্রাদেবীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাহলে এ-ও নিশ্চয় বিশ্বাস করতেন যে, ইচ্ছে করলেই তিনি ওদের আত্মাকে পার্থিব ঘটনার মাধ্যমে সুখী বা দুঃখী করতে পারেন। বিশেষ করে সুমিত্রাদেবীর আত্মার কথাই তিনি বেশি করে ভাববেন, তাঁর ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক। জীবিত সুমিত্রাদেবীর কাছে তাঁর অনেক চাহিদা ছিল,

কিন্তু তিনি কিছুই পাননি। সুতরাং মৃত সুমিত্রাদেবীকে আনন্দ দেবার কথা নিশ্চয়ই তিনি ভাববেন না। তার মতো লোকের পক্ষে দুঃখ ও কষ্ট দেওয়ার কথাটা ভাবাই স্বাভাবিক।

'কিন্তু মৃত সুমিত্রাদেবীর ক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে আনন্দ-বেদনার যোগসূত্র কি কিছু থাকতে পারে? সৌম্যেন্দুবাবুর হিসেবে নিশ্চয়ই নীলাঞ্জনা সেই যোগসূত্র। তাহলে সৌম্যেন্দুবাবুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায় নীলাঞ্জনার মানসিক যন্ত্রণা মানেই সুমিত্রাদেবীর আত্মার যন্ত্রণা।

'নীলাঞ্জনাকে তিনি সেই রকম মানসিক যন্ত্রণাই দিতে চেয়েছিলেন, যে যন্ত্রণায় তিনি নিজে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন সারা জীবন। তাই ভোগ এবং ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন তাকে। নীলাঞ্জনাকে লেখা সৌম্যেন্দুবাবুর চিঠি এবং তার প্ল্যানচেটে বিশ্বাস, এই দুটো জিনিষ থেকেই আমার কাছে এই ছবিটা ধরা পড়ে।

'বলা বাহুল্য সৌম্যেন্দুবাবুর সমস্ত ব্যাপারটাই এক ধরনের পাগলামী।

'সৌম্যেন্দুবাবু ছিলেন অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর। ছেলেবেলা থেকেই ভালোবাসার কাঙাল। অথচ তিনি ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন ছেলেবেলা থেকেই। প্রথমত, তারা অনেক ভাই-বোন। দ্বিতীয়ত, অল্প বয়েসেই মা-বাবাকে হারিয়ে দাদাদের গলগ্রহ। ফলে তার মন থেকে একটু একটু করে মানুষের প্রতি ভালোবাসার অনুভূতি নষ্ট হতে থাকে। গোটা সমাজকেই তিনি বিরূপ চোখে দেখতে থাকেন। সমাজের প্রতীক হিসেবে তিনি অরুনাভ মিত্রকেই নিজের মনের ভেতরে খাড়া করে রেখেছিলেন। তাই সমাজের ওপর যা কিছু ঘৃণা-বিদ্বেষ তার মনে জমা হয়েছিল তা বর্ষিত হয়েছিল এই প্রতীক চরিত্রের ওপর। অথচ এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে সৌম্যেন্দুবাবু নিজেও পুরোপুরি অবহিত ছিলেন না। অরুণাভবাবুর এসব জানার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, নীলাঞ্জনা এবং ইন্দ্রনীলের যোগাযোগের কথা। নীলাঞ্জনাকে সাংসারিক সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত রাখার প্রশ্নটা যখনই আমার মাথায় এলো তখনই আমি আমার কাজের চূড়ান্ত ছক তৈরী করে ফেললাম।'

সত্যসিন্ধু একটু হেসে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। তারপর বলল, 'এরপর যে-সব কাজ করেছি তা আপনারা শুনেছেন এবং কিছু কিছু দেখেছেন। সে-সবের ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। ঘটনার স্রোতের মধ্যেই তার ব্যাখ্যা রয়েছে।'

'আগামী ঘটনা সম্বন্ধে ইন্দ্রনীলের মনকে প্রস্তুত রাখার জন্য টুকিটাকি দু' একটা কাজ করতে হয়েছে। তার মধ্যে কলকাতায় বৃদ্ধ দাদুর ভূমিকা এবং ট্রেনের সহযাত্রী এক দেহাতী লোকের কথা-বার্তা পড়ে। দেহাতী লোকটির ভূমিকায় যে-ব্যক্তি অভিনয় করে-ছিল সে আমার গবেষণার প্রয়োজনে এই ধরনের কাজ-কর্ম মাঝে-মধ্যে করে থাকে। তাছাড়া নীলাঞ্জনা এবং ইন্দ্রনীল যাতে কোনো কিছুই বুঝতে না পারে, তারা যাতে মনে করতে পারে সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবে ঘটছে, তার জন্যে আমাকে ছোটখাট দু'একটা মিথ্যের আশ্রয়ও নিতে হয়েছিল। আমি সেজন্যে দুঃখিত। আন্তরিক ভাবেই আমি ওদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।'

ইন্দ্রনীল কোনো কথা বলল না। আনত মুখে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে গেল কেবল।

সত্যসিন্ধু সঞ্জয়ের চোখে চোখ রেখে সামান্য হেসে বলল, 'আপনি কিন্তু আমাকে সামান্য দ্বিধায় ফেলেছিলেন। আপনি বলেন নি যে, আপনার সঙ্গে আপনার ফার্স্ট ওয়াইফের সেপারেশন হয়ে গেছে। সেপারেশনের পর আপনি আবার এক ভারতীয় শিক্ষিকাকে বিয়ে করেছেন, অবশ্যই লণ্ডনে, এবং সেই বিয়ের ফলে আপনাদের কোনো সন্তানও হয়নি, আপনি আমাকে এসব কিছুই বলেন নি। ফলে এত দিন পর আপনি কেন হঠাৎ এই ব্যাপারটায় এতখানি ইনটারেসটেড হলেন সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।'

সত্যসিন্ধু তার বাঁ হাতের তর্জনীটা আলতো করে বাঁ গালের ওপর বুলোতে লাগল। এমনভাবে যেন একটা বৃত্ত আঁকছে। এটা তার একটা মুদ্রাদোষ। যখন সে কোনো সমস্যা সমাধান করে ফেলে তখন আনন্দে এ-রকম বৃত্ত আঁকে। আবার যখন গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করে তখনো গালের ওপর এই রকম বৃত্ত আঁকে।

সঞ্জয় সামান্য সময় চুপ করে বলল, 'সাপ্রেস করার কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি মনেই করিনি যে, এসব বলার কোনো প্রয়োজন আছে।'

সত্যসিন্ধুর তর্জনীটা তখনো তার গালের ওপর। সে আবার বলল, 'আপনার মেয়ে তো আপনার কাছে থাকে না। হয়তো আপনার কাছে দেখা-টেখাও করে না। অথচ আপনি তাকে খুবই ভালোবাসেন, তাই না?'

সঞ্জয় বোসের ব্যক্তিত্ব যেন চুর-চুর করে ভেঙে পড়ল। তার চোখ দুটো সজল হয়ে এলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে তাড়াতাড়ি চোখে চাপা দিল সে।

ঘরের সকলে অস্বস্তি এবং কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রইল সঞ্জয়ের দিকে।

সঞ্জয়ের সামান্য সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আমার মেয়ের নাম নিনা। নীলার চেয়ে কিছু বড়। নিনার জন্যেই আমাকে সেবার ইণ্ডিয়াতে ছুটে আসতে হয়েছিল।'

একটু থেমে যোগ করল, 'নীলার জন্মের পরই সুমি আমাকে চিঠিতে সবাইকে নিয়ে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, তোমার ভগ্নীপতি আদর করে মেয়ের নাম রেখেছে নীলাঞ্জনা, আমার খুব ভালো লেগেছে, নিনার সঙ্গে মিলিয়ে নীলা।

'কিন্তু আমি আসতে পারিনি নানা কাজের চাপে। নিনা কিন্তু ছোট বোনকে দেখার জন্যে প্রায়ই ভারতে আসতে চাইত। নিনার

মা কিন্তু এ-দেশে আসার কথা ভাবতেই পারত না। ভদ্রমহিলার অনেক গুণ থাকলেও এই ব্যাপারটায় অদ্ভুত জেদ।'

'এ্যাজ ইউ নো সময় কারো জন্যে বসে থাকে না। নিনার মাকে রিকোয়েস্ট করে রাজী করাতে করাতেই তিনটে বছর কেটে গেল। নিনার মা এখানে আসতে রাজীও হয়েছিল। কিন্তু কি মনে করে শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসল। নিনা ওর মাকে ছেড়ে আসতে চাইল না। আমি তখন কতকটা বিরক্ত হয়েই চলে এলাম এখানে। একাই। ভেবেছিলাম, কিছু দিনের জন্য স্থমি এবং ওর মেয়েকে লণ্ডনে আমার কাছে রাখব। অরুনাভ যাবে না যে আমি তা ধরেই নিয়েছিলাম। তবে আশা করেছিলাম, স্ত্রী এবং মেয়েকে যেতে দেবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওদের তো যেতে দিলই না, বরং আমার সঙ্গে খুবই দুর্ব্যবহার করল। এমন একটা ভাব করল, যেন আমার সঙ্গে সম্পর্কই রাখতে চায় না। স্থমি অবিশ্যি স্বামীর ব্যবহারে খুবই কষ্ট পেয়েছিল, কিন্তু বেচারী স্বামীর মতের বিরুদ্ধে কি করতে পারত? সো শি কুডন্ট এ্যাকমপ্যানি মি।'

'এর পরই আমি লণ্ডনে ফ্লাই করেছিলাম। আর আমি যেদিন ফ্লাই করি সেদিনই অরুণাভ খুন হয়। স্ট্রেঞ্জ কোয়েন্সিডেন্স।'

সত্যসিন্ধু সঞ্জয়ের কথার পিঠে পিঠে বলল, 'এমনও হতে পারে যে আপনার সঙ্গে লণ্ডনে যাওয়ার ব্যাপার নিয়েই সেই রাতে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়েছিল, আর তারই স্থযোগ নিয়েছিল সৌমেন্দু বিশ্বাস।'

সঞ্জয় কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকিয়ে বলল, 'মাইট বি।' একটু থেমে যোগ করল, 'যাক সে-কথা। অল্প কিছু দিন আগে নিনার বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়েতে আমাকে কোনো খবর দেওয়া হয়নি। এর পরই আমি ঠিক করেছিলাম, ও-দেশে আর নয়। এখন থেকে ভারতেই থাকব। আমি যখন মনে মনে এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন একদিন হঠাৎ আমার নজরে এল, একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন। বুঝতেই পারছেন, আমি গবেষক সত্যসিন্ধুর বিজ্ঞাপনের কথা বলছি।

'বিজ্ঞাপনটা দেখার পর আমি কি-কি করেছি তা-তো আপনারা সবাই জানেন। এনি ওয়ে, ভারতের মাটিতে পা দিয়ে আমার আশা হয়েছিল, নিনাকে হারিয়ে হয়তো নীলাকে পাব। এক মেয়েকে হারিয়ে আর এক মেয়েকে।'

একটু থেমে সামান্য ভারি গলায় যোগ করল, 'অবিশ্যি আমি দূর থেকে সুমির মেয়েকে ভালোবাসব, কেবল এইটুকুই চেয়েছি। এর বেশি কিছু না। মাঝে-মাঝে ওকে দেখতে পাব এটাই আমার কাছে অনেক।'

সঞ্জয়ের আবেগ স্পর্শ করল সবাইকে কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। এমন কি নীলাঞ্জনাও না। সে আনত চোখে নিজের বিড়ম্বিত জীবনের কথা ভাবতে লাগল।

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, সমস্যা-সঙ্কুল এই পৃথিবীতে তার এখন একমাত্র জীবিত আত্মীয় এই সঞ্জয় বোসই। কিন্তু তার পরিচয় পেয়েও নীলাঞ্জনার মনে কোনো সাড়া জাগল না। বরং তার মন ভিন্ন খাতে বইতে লাগল। সে ভাবতে লাগল ইন্দ্রনীলের কথা। এরপর ইন্দ্রনীল কি তার পাশে এসে দাঁড়াবে? এত কিছু জেনেও?

সত্যসিন্ধু সকলের মুখের ওপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর শান্তভাবে বলল, 'কৈশোরে কেউ যদি অযত্নে লালিত হয় এবং ভালোবাসার পরিবর্তে পায় অবহেলা, তাহলে কখনো কখনো তার মন কতখানি বিকৃত হয়ে উঠতে পারে, সমাজের পক্ষে সে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, সৌম্যেন্দু বিশ্বাস তারই একটা উদাহরণ।

'কিশোর-কিশোরীদের মন স্বভাবতই বড় স্পর্শ-কাতর। এক-একজনের আবার সাধারণের চেয়েও বেশি। সকলের কাছ থেকেই তারা স্নেহ-ভালোবাসা পেতে চায়। সমাজ বা তার নিজের পরিবার তা দিতে অস্বীকার করলেই নানা রকম গোল বাধে। সৌম্যেন্দু-বাবুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁর মন স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারেনি।'

একটু থেমে সত্যসিন্ধু যোগ করল, 'এনি ওয়ে, আপনাদের

সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতার জন্য প্রত্যেককে ধন্যবাদ। অনেক-অনেক ধন্যবাদ।'

এরপর সকলে উঠে পড়ল। উঠে পড়ল ইন্দ্রনীলও। কেবল নিঃশব্দে বসে রইল নীলাঞ্জনা। একা।

## ॥ সতেরো ॥

আরো সাতটা দিন কেটে গেছে।

গোধূলির আকাশে তখন লাল আবির ছড়ানো। সেই আবিরের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে মিত্র-ভিলার বাগানের চারদিকে, গাছের মাথায়, বাড়ির কার্নিশে। রক্তিম আভার সামান্য অংশ লাজুক পায়ে মিত্র-ভিলার দোতলার ঘরেও প্রবেশ করেছে। দোতলার ঘরে পাশা-পাশি দুটো চেয়ারে বসে ছিল ইন্দ্রনীল এবং নীলাঞ্জনা। দুজনের কারো মুখেই কিছুক্ষণ কোনো কথা ছিল না। যেন নৈঃশব্দের গান কান পেতে শুনছিল তারা।

দেওয়ালে টাঙানো অরুনাভ এবং সুমিত্রার ফটোর দিকেই ওদের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। ইন্দ্রনীল ফটোর দিকে দৃষ্টি রেখেই একসময় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, 'আমাদের খেলা বোধহয় এবার শেষ হল, শকুন্তলা। এরপর থেকে তুমিও আর শকুন্তলা নও, আমিও হ্যামলেট না। নাটক শেষ হলে চরিত্ররা আর থাকে কি করে?'

নীলাঞ্জনা স্থির চোখে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকাল। কোনো উত্তর করল না। তবে নিরুত্তর থেকেও সে যেন অনেক কথা বলল। ইন্দ্রনীল কিন্তু তার সেই অনুচ্চারিত কথা বুঝল না।

ইন্দ্রনীল তাই আবার বলল, 'এতদিন আমরা গবেষক সত্যসিন্ধুর হাতে খেলার পুতুল ছিলাম। সে তার গবেষণার প্রয়োজনে যেমন করে আমাদের খেলিয়েছে, আমরা কিছু না জেনে তেমন করেই খেলেছি। আমাদের কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। যদিও আমরা নিজেরা তা জানতাম না। কিন্তু আজ তো গবেষক নেই। তাঁর

কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমাদের খেলাও তাই শেষ হয়ে গেছে। তাই না ?'

সামান্য সময়ের জন্য নীলাঞ্জনার চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। সে ইন্দ্রনীলের চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমার যদি তাই মনে হয়, আমরা এতদিন কেবল খেলেইছি দম-দেওয়া পুতুলের মতন, আমাদের কোনো স্বাধীন ইচ্ছে ছিল না, তাহলে এবার তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছে নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পারো। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছে উপেক্ষা করেই।'

ইন্দ্রনীল আহত হল। সে নীলাঞ্জনার হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে বলল, 'না, নীলা, আমার কখনো মনে হয়নি যে, কারো হাতে খেলার পুতুল হয়ে আমরা কেবলই খেলেছি। এ-কথা কখনো মনে হয়নি বলেই সব জানার পর আমার মাথার মধ্যে এই প্রশ্নটা দানা বেঁধে উঠেছে, সত্যিই কি আমরা খেলেছি ? আমরা দম-দেওয়া পুতুল ছিলাম না, অথচ এই অদ্ভুত ঘটনা, এই অদ্ভুত পরিবেশ তা-ই প্রমাণ করছে।'

নীলাঞ্জনা নিবিড় চোখে ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে রইল সামান্য সময়। তারপর গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক, একটা অদ্ভুত ঘটনা, একটা অদ্ভুত পরিবেশ আমাদের দুজনকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। কিন্তু অন্য কোনো ভাবেও তো আমরা কাছাকাছি আসতে পারতাম। বলো পারতাম না ?'

ইন্দ্রনীল নিরুত্তর থেকে অনুভবে নীলাঞ্জনাকে বুঝতে চাইল।

নীলাঞ্জনা একই ভঙ্গিতে আবার বলল, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যেমন করেই হোক, আমরা পরস্পরের কাছাকাছি আসতাম। আসতামই। সত্যসিন্ধু মুন্সীর গবেষণা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।'

নীলাঞ্জনার গলার স্বরে আত্মবিশ্বাস, চোখে আত্মপ্রত্যয়।

নীলাঞ্জনার গভীর স্বর, চোখের দীপ্তি ইন্দ্রনীলের আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনল যেন। তার চোখও দীপ্তিময় হয়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে বলল, 'বড় কষ্ট পাচ্ছিলাম, নীলা। ক'দিন কেবলই মনে হচ্ছিল,

আমার ভালোবাসার বুঝি কোনো মূল্য নেই, কেউ কোনো মূল্য দেবে না। আমার কেবলই মনে হয়েছে, গবেষক ঘুঁটি সাজিয়ে বলেছে, তুমি ভালোবাসো আমি ভালোবেসেছি। আমি ভালোবাসলাম, অথচ তা সত্য নয়, মঞ্চে অভিনয়ের মতন, সত্যের মতো কিন্তু সত্য নয়। এই ভাবনা বড় কষ্টের, বড় যন্ত্রণার।'

নীলাঞ্জনা নিরুত্তর থেকে ইন্দ্রনীলের হাতের ওপর নিজের একটা হাত রাখল। তারপর জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে গোধূলির আকাশটাকে দেখল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আবৃত্তি করল,

> "Winged clouds soar here and there,
> Dark with the rain new buds are
> dreaming of :
> 'T is love, all love."

ইন্দ্রনীলের দৃষ্টিও তখন আকাশের দিকে ছড়ানো। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল, তাদের ভালোবাসার রঙেই যেন গোধূলির পৃথিবীটা এমন রক্তিম হয়ে উঠেছে।

ইন্দ্রনীল পরম তৃপ্তিতে নীলাঞ্জনার হাতটা নিজের দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, " 'T is love, all love।"

দুজন দুজনের দিকে তাকাল। এমনভাবে যেন এরপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। যেন তারা এইমাত্র পৃথিবীর শেষ কথাটা উচ্চারণ করে ফেলেছে। এরপর কেবলই তাকিয়ে থাকা। দুজন দুজনের দিকে, অপলক দৃষ্টিতে, অনন্তকাল ধরে।

বাংলা রহস্য-উপন্যাসের গোয়েন্দাদের টিপিকাল চরিত্রের ছকের বাইরে 'বাজীকরের পুতুলে'র রহস্যভেদী-গবেষক সত্যসিন্ধু বক্সী। তাঁর কাছে এলো প্রায় কুড়ি বছর আগে সংগঠিত এক দম্পতির আত্মহত্যার রহস্য-উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব। সত্যসিন্ধু মনে করেন, অপরাধেররহস্য উন্মোচনে দরকার সমাজ-বিজ্ঞানের সাহায্য।

আর এই আত্মহত্যা না হত্যা এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রেক্ষিতেই স্বাদু গোয়েন্দা কাহিনীর আঙ্গিকে লেখা নীলাঞ্জনা-ইন্দ্রনীলের চিরকালীন প্রেমের কাহিনী।

নতুন আঙ্গিকে, নতুন দৃষ্টিকোণে লেখা সমাজ-সচেতন তরুণ লেখকের এই উপন্যাস বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনীতে নতুন এবং অভিনব সংযোজন।